কাঠগড়া

ডা. শামসুল আরেফীন

সমর্পণ

মক্কায় ইসলামের ঘোর শত্রু আবূ জাহ্ল যেদিন 'সূরা কাওসার' পয়লা শুনল, নিজেই টাসকি খেয়ে গেল। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল- 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য'। ক্যাবাবোদ্ধা আরবদের নেতা, প্রথম শ্রবণেই বুঝে গেছে 'কাহিনি'। এরপরও কেন সে ইসলাম কবুল করেনি, সেই আলাপটা একটু পড়ে পাড়ছি। এখন যে আলাপটা করছি, সেটা হলো: কা'বার দরজায় টাঙানো ছিল বহুদিন ধরে শ্রেষ্ঠ ৭টি আরবি কবিতা, বলা হতো 'সাবআ মুআল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত সপ্তক'। যখন সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়, তখন এই ৭ জনের কেবল একজন বেঁচে আছে। আবূ জাহ্ল তার কাছে নিয়ে গেল 'সূরা কাওসার'। সূরা দেখে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল: 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য, এটি মানুষের কথা হতে পারে না।' সে নিজে সেটা হাতে নিয়ে তখন কা'বায় গেল, নিজের কবিতাখানা সেখান থেকে নামিয়ে দিল, সূরা কাওসার লেখা কাগজটা সেখানে টাঙিয়ে দিল, আর নিচে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটি লাইন লিখে দিল:

مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ

'এটা কোনো মানুষের কথা নয়।'

কষ্টিপাথর-৩

কা ঠ গ ড়া

ডা. শামসুল আরেফীন

সূচিপত্র

পর্ব ১

ধর্ম ও বিজ্ঞান ২৭

ফলে কী হল? ৪৩

জ্ঞানের হাতবদল ৬০

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আস-সলাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের তাওফীকে আপনাদের হাতে কষ্টিপাথর সিরিজের ৩য় বই 'কাঠগড়া'। সিরিজে কোনো ধারাবাহিক আলোচনা নেই যে, একের আগে তিন পড়া যাবে না। বা দুই পড়ে নিয়ে তিন পড়তে হবে—এমন না। ১,২,৩ সংখ্যাগুলো এজন্য দেওয়া, যাতে এই পুরো সিরিজটা পড়লে (ধারাবাহিকই হোক কিংবা এলোমেলো) পাঠকের সামনে সামগ্রিক একটা চিত্র ভাসবে। আরেকটা ইচ্ছে আছে, মৃত্যুর পর যেন পাঠকের সুবিধার্থে 'কষ্টিপাথর-সমগ্র' বের করা যায়, এজন্য একই জাতীয় আলোচনাগুলো এভাবে মার্ক দিয়ে রাখা।

গেল বছর 'বিজ্ঞানের দর্শন' (philosophy of science) নিয়ে বিদেশি ইউনিভার্সিটির দুয়েকটা অনলাইন কোর্স করার সুযোগ হলো। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, পুরোটা ছাত্রজীবন ঘাড় গুঁজে বিজ্ঞান পড়েও আমি আসলে জানিই না বিজ্ঞান কী, এর উদ্দেশ্য কী, কীভাবে বিজ্ঞান কাজ করে। এর চেয়ে আফসোসের আর কী হতে পারে যে, এ-প্লাস পাওয়া লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে জানেই না বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান কী বলতে চায়? আমরা জানিই না 'বিজ্ঞানের ইতিহাস'। ফলে বিজ্ঞানপড়ুয়াদের মাঝে বিজ্ঞান নিয়ে একটা ফ্যান্টাসির জন্ম হয়। মজার ব্যাপার হলো, এই ফ্যান্টাসি আরও জোরালো তাদের মাঝে যারা বিজ্ঞানপড়ুয়া নন। যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় সে কথাগুলোই লেখার চেষ্টা করেছি।

আরও দেখলাম, আমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিজ্ঞানলেখক আর সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞানবাজ গ্রুপগুলো বিজ্ঞানের নামে যা গেলাচ্ছে, তা যতটা না পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞান, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞান-বহির্ভূত দর্শন। এদের বিজ্ঞান বোঝা আর পশ্চিমা একাডেমিক বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের বিজ্ঞান বোঝার মাঝে আসমান-জমিন ফারাক। 'বিজ্ঞান' ইস্যুতে এঁরা চূড়ান্ত অসততার পরিচয় দিয়েছেন।

কিছু জিনিস পীড়া দেয় সব মুসলিমকেই। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে আমরা ছিলাম। আজ সেই সম্পদ ইউরোপ-আমেরিকার হাতে। যদি ধর্মের সাথে বিজ্ঞান সাংঘর্ষিকই হবে তাহলে ইসলামের শুদ্ধতার যুগেই কেন এলো বিজ্ঞান? আর সে মানিক গেলোই বা কীভাবে পরের হাতে? এই হাতবদলের গল্পটা নিয়ে বেশ কৌতূহল ছিল, আলহামদুলিল্লাহ মিটেছে।

যদি ধর্মে যুক্তি-পর্যবেক্ষণের কোনো স্থান না-ই থাকে, তবে কেন কুরআনে বার বার দেখার

তাগিদ, দিমাগ খাটানোর তাগিদ? তার মানে ইসলাম আর ধর্মের মাঝে কোনো বিরাট পার্থক্য আছে, যা বার বার মিস হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ছিল 'বিজ্ঞানের কারণ'; কীভাবে—সেই আলাপ উঠে এসেছে। মধ্যযুগে মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞানের লেভেল কেমন ছিল, সেটা আমার মতো করে সাজিয়েছি, যতটুকু আমি বুঝি। এই অবদানগুলোর কথা সব ধরনের পাঠকদের জন্য নানান বইয়ে রয়েছে, যেমন শাইখ মুসা আল হাফিজ সাহেবের 'সহস্রাব্দের ঋণ' বইটির প্রতি আমি ব্যাপকভাবে ঋণী। কিন্তু বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র হিসেবে আমার দরকার ছিল আরেকটু বেশি—আধুনিক বিজ্ঞানের নজরে তাদের অবদানগুলো দেখা। চিকিৎসাবিদ্যা আর গণিত-ই আলোচনায় রেখেছি, কেননা এই দুই ফিল্ডে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান যে কত বড়, তা বুঝেছি। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন টার্মগুলো বুঝি না বলে আনিনি। তবে মনে রাখার বিষয়, এই-ই সবটুকু নয়, স্রেফ ইসলাম যে জ্ঞানের সূচনা করেছিল, তার লেভেল বোঝানোর জন্য।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ডা. রাফান আহমেদের প্রতি। এক, নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও এই বইটি সম্পাদনা করে আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য। আর দুই, সময়ের দাবি পূরণে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। তাঁর রচিত 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা', 'অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়', 'হোমো স্যাপিয়েন্স: রিটেলিং আওয়ার স্টোরি', 'ইউভাল হারারি: পাঠ ও মূল্যায়ন (পশ্চিমা একাডেমিকদের চোখে)' এবং 'ভাবনার মোহনায়' নিঃসন্দেহে সময়ের দাবি। একটি বিশেষ মহল থেকে বিজ্ঞানের একচেটিয়া ডিলারশীপের দাবির বিপরীতে রাফান আহমেদ বিজ্ঞানের প্রকৃত অনুধাবনের ডাক দিয়ে চলেছেন। আল্লাহ তাঁকে আরও তাওফীক দিন। আমীন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আরমান ফিরমান ভাইয়ের গবেষণামূলক লেখাগুলো থেকেও আমি যারপরনাই উপকৃত হয়েছি। সুখের কথা, অচিরেই ভাইয়ের লেখাগুলো বই আকারে আসছে ইন শা আল্লাহ। বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে ভাইয়ের গভীর পর্যালোচনাগুলো বাংলাভাষীদের সামনে খুলে ধরবে নতুন দিগন্ত। তবে রাফান আহমেদ ও আরমান ভাইয়ের লেখা থেকে যতটুকু গ্রহণ করেছি, তা মূল রেফারেন্সে গিয়ে চেক করে নিয়েছি এবং মূল রেফারেন্সই উল্লেখ করেছি।

বিজ্ঞানের পুরো ইতিহাস ও দর্শন আলোচনা শেষে স্বাভাবিকভাবেই 'এখন করণীয়' নিয়ে কিছু চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। সেগুলো পাঠকের খিদমতে পেশ করেছি নিদারুণ অযোগ্যতায়। হয়তো যোগ্য কেউ কোনোদিন পড়বেন, শুরু হয়ে যাবে কাজ। আবার বিজ্ঞান হবে আমাদের ইন শা আল্লাহ। পথে নামলেই না পথ ফুরোয়, তার আগে পথ চিনতে তো হবে, নাকি?

ডা. শামসুল আরেফীন
১৬ মার্চ, ২০২১ খ্রি:

সম্পাদকের দু'টি কথা

সম্পাদনা কাজটি আমি খুব সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। নিজে লেখার চেয়ে সম্পাদনা আমার বেশি কঠিন মনে হয়। কিন্তু কিছু মানুষের আবদার এড়ানো যায় না। প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় লেখক শামসুল আরেফীন এমন একজন। তবে তার "কাঠগড়া" বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে মতামত দেওয়ার জন্য খুব অল্প সময় আমি পেয়েছি। তাই যথাযথভাবে আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

বইটিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে নিয়ে, এর দর্শন, এর ওপর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চাপ ও কিছু নমুনা, বিজ্ঞানকে আবার মুসলিম সমাজে ফিরিয়ে আনার আকুলতা সবই ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে বইয়ের ২য় পর্বের প্রথমাংশের তুলনায় ১ম পর্ব ও ২য় পর্বের শেষ অংশ আমার বেশি ভালো লেগেছে। কেন কুরআন ওহি, কেন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নবি—এসব আমার কাছে সন্দেহের উর্ধ্বের বিষয়। নবির লাইফস্টাইল আমরা মানি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আর কোনো কারণ নেই, আবারও বলছি 'আর কোনো কারণ নেই'। আল্লাহকে পাওয়ার যাত্রায় নববি লাইফস্টাইল অনুসরণে আমরা দুনিয়াবি কল্যাণ বোনাস হিসেবে পাই। মাঝেমধ্যে আপাত ক্ষতিও আসতে পারে—আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমাদের ভয়, ক্ষুধা, দুঃখ-শোক, ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তবে সেটাও সামগ্রিক কল্যাণের ছকে গাঁথা। শারীআর উদ্দেশ্য মানবসহ সমগ্র সৃষ্টির প্রভূত কল্যাণ।

বইয়ের ২য় পর্বে কিছু নববি দিক-নির্দেশনার দুনিয়াবি উপকারের কথা এসেছে। কয়েকটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অপ্রতুল থাকায় লেখককে মেডিকেলবিদ্যার বুনিয়াদি জ্ঞানের আলোকে কথাবার্তা বলতে হয়েছে। সবক্ষেত্রে ব্যাখ্যার সাথে যে আমি সম্মত তা বলব না, কিছু ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে আলোচনা করা যেত বলে মনে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে আলোচনার সংহতি দুর্বল লেগেছে। তবে মোটের ওপর অনুপ্রেরণাদায়ী হিসেবে বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে আশা রাখি। আল্লাহ তাআলা লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তার ভুলত্রুটি মাফ করে আন্তরিকতা, নিয়ত ও চেষ্টা কবুল করুন। আমার সীমাবদ্ধতাও আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন। আপনাদের নেক দুআয় এই অধমকে স্মরণ রাখবেন।

রাফান আহমেদ

২২ মার্চ ২০২১

পর্ব ১

চ্যালেঞ্জ

কীমাশ্চর্যম

ঘটনা কী?

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে

বিপদটা কোথায়?

সমস্যা ১: নগদে পল্টি

ধর্ম ও বিজ্ঞান

ফলে কী হলো? বিজ্ঞানের জন্ম

জ্ঞানের হাতবদল

সমস্যা ২: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ

সমস্যা ৩: বিজ্ঞানবাদ

সমস্যা ৪: পুতুলনাচ

বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে কী হবে?

চ্যালেঞ্জ

সব নবিকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য 'মু'জিযা' দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা। কোনো ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা সত্যায়িত করে দেন যে, এটা অরিজিনালটারই ফটোকপি, আমি স্বাক্ষরকারী অরিজিনালটা দেখেছি। তেমনি নবিদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, পাবলিকের সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য দেওয়া হতো মু'জিযা, যে ইনিই আল্লাহর সত্যায়িত বার্তাবাহক। সত্যসন্ধানীরা আল্লাহর তাওফীকে চট করে বুঝে যেত, যে ইনিই নবি। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর আজদাহা সাপটা যখন জাদুকরদের ভাঁওতাবাজিগুলোকে গিলে নিল, জাদুকররা সাথে সাথে বুঝে নিল ঘটনা কী। আর হতভাগারা তা বুঝেও হঠকারিতা করত। মু'জিযা দেখার পরও সেই মু'জিযার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতো; নবিকে বলত কবি-জাদুকর-পাগল-জিনে পাওয়া। নবিরা বলতেন, এই দেখো, এই আমার মু'জিযা, এই অলৌকিক ক্ষমতা আমার নিজের না; আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবি। আর মানুষের কথা ছিল, আপনি নবি ছাড়া আর সবকিছু, প্লিজ বইলেন না আপনি নবি। আপনি নবি– কেবল এইটুকু আমরা শুনতে চাই না, জানতেও চাই না। নবি মেনে নিলেই আপনার আল্লাহকে মেনে নিতে হবে, আইন-কানুন মানতে হবে, আপনার বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে[১], জুলুম-অত্যাচারের যে ব্যবস্থাপনা আমরা সাজিয়েছি, সেটা ত্যাগ করে আয়েশ-খ্যাতি-ভোগের জীবন বিসর্জন দিতে হবে। সুতরাং 'আপনি নবি', এইটুকু ছাড়া আর যা বলবেন মেনে নেবো। আর যে মু'জিযা দেখালেন এটার ঐ ব্যাখ্যা আমরা করব না, যা আপনাকে নবি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে, বরং ঐ ব্যাখ্যাই করব যা আমাদের মগজে ধরে, অভিজ্ঞতায় আসে। একদল মুশরিক হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখেছে নবিজি আঙুল ইশারা করলেন, আর চাঁদ ভেঙে এক খণ্ড এদিকে আরেক খণ্ড ওদিকে সরে যাচ্ছে। তারপরও বলেছে,

[১]আবূ জাহল নবিজি চলে গেলে মুগীরা ইবনু শু'বা-এর দিকে চেয়ে বলল: 'খোদার কসম আমি জানি, তিনি যা বলছেন তা সত্য কথা। কিন্তু তাঁর কথা আমি এজন্য মানতে পারছি না কারণ তিনি কুসাই গোত্রের। কুসাইরা কাবার মুতাওয়াল্লি হয়েছে, হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান পেয়েছে, পরামর্শ মজলিসের ব্যবস্থাপনার গৌরবও তাদের, যুদ্ধে ঝাণ্ডা বহনের ইযযতও তারা নিয়েছে। এখন মেহমানদারিতে আমরা কোনোমতে তাদের সমকক্ষ হয়েছি; আর এদিকে তারা আবার দাবি করছে তাদের ভেতর একজন নবি হয়েছে। খোদার কসম, আমি এটা জীবনেও মানব না।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সূত্রে হায়াতুস সাহাবা, ১/১১১।]

বাহ মুহাম্মাদ বাহ, অস্থির জাদু দেখালে। জাদুতে মোহাচ্ছন্ন করে ভোজবাজি দেখানো যায় আমরা জানি। যেহেতু আপনাকে নবি হিসেবে মেনে নিলে বেশ সমস্যা, অতএব আপনি জাদুকর। আসলে যার হয় না ৯-তে, তার হয় না ৯০-তে।

তো মু'জিযার[২] কথা বলছিলাম। যেমন ধরেন-

- মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল লাঠিটা ছেড়ে দিলে বিকট অজগর সাপ হতো, আবার ধরে নিলে হয়ে যেত লাঠি। আরেকটা ছিল, বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলে হাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো, আবার ঢুকিয়ে নিলে নাই হয়ে যেত।
- ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল হাত বুলিয়ে দিলে অন্ধ-কুষ্ঠ ভালো হয়ে যেত, মাটির পাখি বানিয়ে হাত বুলিয়ে দিলে জীবিত হয়ে উড়ে যেত।
- দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল, আমরা যেমন কাদামাটি দিয়ে পাতিল বানাই, উনি লোহা ধরলে ওরকম নরম হয়ে যেত।

আমাদের নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিযা কী ছিল? আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> "প্রত্যেক নবিকে 'তাঁর যুগের প্রয়োজন মোতাবেক' কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁদের প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মু'জিযা দেওয়া হয়েছে তা হলো—আমার ওপর নাযিলকৃত ওহি।"[৩]

কুরআন আমাদের নবির মু'জিযা? কুরআন আবার কেমন মু'জিযা হলো? অন্য মু'জিযাগুলোর সাথে মিলল না তো। আচ্ছা।

মু'জিযা শব্দটি এসেছে আরবি عَجِزَ থেকে। এর অর্থ হলো cripple (পঙ্গু করা); defeat (পরাস্ত করা); disable (অক্ষম করা); frustrate (হতাশ করা); incapacitate (ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া); make it impossible (অসম্ভব করে দেওয়া)। তাহলে মু'জিযা হচ্ছে যা হয়রান করে দেয়, হতভম্ব করে দেয় এতটাই যেন অবশ হয়ে যায় দেহ-মন[৪], বোধবুদ্ধিকে কেড়ে নেয়, চিন্তাকে পঙ্গু করে দেয়, যুক্তিকে পরাস্ত করে দেয়, মানুষ হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, কুরআন হতভম্ব করে দেবে সংশয়ীকে বা অবিশ্বাসীকে, যে সত্য খোঁজে এমন কাউকে।

---

[২] মিরাকল/মু'জিযা ontologically possible (অস্তিত্বগতভাবে সম্ভব) এবং epistemically justifiable (জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে যুক্তিগ্রাহ্য)। অনেকে ভাবেন, এটা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা ভুল ধারণা। [সম্পাদক]

[৩] বুখারি, ৪৯৮১।

[৪] https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/ عجز/

এখন আসেন, হতবাক মানুষ কখন হয়? বিস্ময়ে। সাধারণ সচরাচর কোনো জিনিস আমাদের বিস্মিত করে না। যা আমি জানি, যা আমি নিজেই পারি, তা আমার কাছে 'এ আর এমন কী'। 'মামুলি কিছু' বিস্ময় জাগায় না। বিস্ময় তখনই আসে যখন কোনোকিছু আমার সাধ্য, আমার অভিজ্ঞতা বা কল্পনার সীমাকে ছাপিয়ে যায়। আমার সামর্থ্যকে যা চ্যালেঞ্জ করে, তার প্রতি আমি বিস্মিত হই- আরিব্বাস রে! কী দারুণ। কুরআনের মুখোমুখি যারা প্রথম হয়েছিল, তারা ছিল জাতিতে আরব। কাব্য ছিল তাদের রক্তে। কাব্য ছিল তাদের বিনোদন, তাদের গণমাধ্যম, তাদের ইতিহাস আর্কাইভ, তাদের মোটিভেশনাল স্পীচ। কাব্যই ছিল তাদের বংশগৌরবের বিষয়- 'অমুক কবি আমাদের বংশের'। যুদ্ধের কবিতা, প্রেমের কবিতা, আটপৌরে জীবনের কবিতা, পূর্বপুরুষের স্তুতিমূলক জাতীয়তাবাদী গোত্রবাদী কবিতা। তাদের উৎকর্ষ, অহমিকা, সাধনা এই কবিতা; যেমন আজকে আমাদের বিজ্ঞান। কুরআন এসেই তাদের উৎকর্ষ যে কবিমানস, সেটা ধরে নাড়া দিল, ছুড়ে দিল চ্যালেঞ্জ-

- ➡ সামর্থ্য থাকে তো নিয়ে এসো এর কাছাকাছি কিছু; একটা কিতাব নিয়ে আসো এমন,[৫]
- ➡ আচ্ছা কমিয়ে দিলাম, ১০টা সূরা বানিয়ে আনো এমন [৬],
- ➡ না পারো তো একটা সূরা-ই নিয়ে এসো এমন,[৭]
- ➡ তাও না পারো এমন একটা আয়াতই বানিয়ে আনো দেখি।[৮]

একটা মাত্র আয়াত?! ৪০ বছর পর্যন্ত যে ইয়াতীম ছেলেটা আমাদের মাঝেই ঘুরে বেড়িয়েছে, আমাদেরই চোখের সামনে। কারও কাছে কবিতা শিখতে দেখলাম না, কখনও কবিতা চর্চা করতে দেখলাম না, শিক্ষাদীক্ষা নেই, লিখতে পড়তেও পারে না। বলা নেই কওয়া নেই, সেই ছেলেটা চ্যালেঞ্জ করছে আমাদের? আমাদের! আমরা খাই কবিতা, ঘুমাই কবিতা, গায়ে দিই কবিতা, মুখ দিয়ে যা-ই বলি তাই হয়ে যায় কবিতা। আমাদের মাঝে আছে বড় বড় সব কবি, যারা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। সেই আমাদেরকেই এই আনপড় ছেলেটা কিনা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে একটা আয়াত বানিয়ে আনার? সে যুগে কাব্যাভিমানী আরব জাতি কুরআনের এই চ্যালেঞ্জকে কীভাবে নিয়েছিল, জানতে মন চাচ্ছে, তাই না? চলুন বেড়িয়ে আসি ১৪০০ বছর আগের মক্কায়।

---

[৫] "বলো, যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮৮।)

[৬] "নাকি তারা বলে, সে এটি রটনা করেছে? বলো, 'তাহলে তোমরা নিদেনপক্ষে দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডেকে নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হূদ, ১১ : ১৩।)

[৭] "বলো, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্য হয়ে থাকো।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৭-৩৮।)

[৮] "তারা কি বলে, সে এটা বানিয়ে বলছে? বরং তারা ঈমান আনে না। অতএব তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ একটি বাণী নিয়ে আসুক।" (সূরা তূর, ৫২ : ৩৩-৩৪।)

কীমাশ্চর্যম!!

২.১ এ কী করলেন শ্রেষ্ঠ কবি

মক্কায় ইসলামের ঘোর শত্রু আবূ জাহ্ল যেদিন 'সূরা কাওসার' পয়লা শুনল, নিজেই টাসকি খেয়ে গেল। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল- 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য'। কাব্যবোদ্ধা আরবদের নেতা, প্রথম শ্রবণেই বুঝে গেছে 'কাহিনি'। এরপরও কেন সে ইসলাম কবুল করেনি, সেই আলাপটা একটু পড়ে পাড়ছি। এখন যে আলাপটা করছি, সেটা হলো: কা'বার দরজায় টাঙানো ছিল বহুদিন ধরে শ্রেষ্ঠ ৭টি আরবি কবিতা, বলা হতো 'সাবআ মুআল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত সপ্তক'। যখন সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়, তখন এই ৭ জনের কেবল একজন বেঁচে আছে। আবূ জাহ্ল তার কাছে নিয়ে গেল 'সূরা কাওসার'। সূরা দেখে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল: 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য, এটি মানুষের কথা হতে পারে না'। সে নিজে সেটা হাতে নিয়ে তখন কা'বায় গেল, নিজের কবিতাখানা সেখান থেকে নামিয়ে দিল, সূরা কাওসার লেখা কাগজটা সেখানে টাঙিয়ে দিল, আর নিচে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটি লাইন লিখে দিল: 'مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ' - এটা কোনো মানুষের কথা নয়'। [১]

কাব্যে excellence অর্জনকারী ডাকসাইটে কবি হয়রান হয়ে গেল নিজের সামর্থ্যের অতীত, কল্পনার অতীত ভাষার কারুকাজ দেখে। তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল, যুক্তি লোপ পেল। কুরআন যে মু'জিযা আমাদের নবির। কুরআন কবিতার বই না, তারপরও কাব্যবোদ্ধারা অনুভব করেছে এর মু'জিযা, হয়েছে হয়রান-কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

২.২ ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা

বীর সিপাহসালার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। মক্কার অন্যতম ধনী, বার্ষিক আয় ১ কোটি গিনি। কা'বার গিলাফ এক বছর পুরো মক্কা মিলে দেয়, আরেক বছর ওয়ালীদ একা দেয়। বুইঝেন। তার মানে সে মক্কার মুরব্বিদের মধ্যে গণ্যমান্য, তার উপাধি 'রাইহানা কুরাইশ', নিজেকে সে বলত—'ওয়াহীদ ইবনুল ওয়াহীদ', এক পিসের বেটা এক পিস। একবার কুরাইশরা

---

[১] 160 Miracles and Mysteries of the Quran, ডা. মাজহার কাজী, পৃষ্ঠা ২০১

গেল তার বাসায়:

— আবদু শামস! আবূ তালিবের ভাতিজার জ্বালায় তো পাগল হয়ে গেলাম। সে এগুলা কী পড়ে? এগুলা কি কাব্য, না জাদু, না বাকচাতুর্য? কিছুই তো বুঝতেসিনা।
— আচ্ছা, চলো তো দেখি। আমি নিজে শুনে দেখি।
— চলেন।

কুরাইশ গং এল নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে। ওয়ালীদ বলল:

— মুহাম্মদ! তোমার কিছু কবিতা আমাকে শোনাও তো।
— এগুলো কবিতা নয়। এগুলো আল্লাহর কালাম, যা দ্বারা তিনি ফেরেশতা আর নবিদের সম্মানিত করেছেন।
— শোনাও দেখি আমাকে।

নবিজি তিলওয়াত করলেন সূরা সাজদাহ্-র শুরু থেকে।

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে—

১. আলিফ-লাম-মীম

২. এ হলো অবতরণ, এমন কিতাবের যাতে কোনো সন্দেহ নেই; জগৎসমূহের কর্তৃত্বশীল প্রতিপালকের তরফ থেকে।

৩. তারা কি বলে: এটা সে (মুহাম্মাদ) রচনা করেছে?

৪. কক্ষনো না, বরং এটা আপনার রব থেকে আগত সেই পরমসত্য। যাতে আপনি এমন কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা (এর দ্বারা) পাবে সঠিক পথের দিশা।

৫. তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, ছয় দিনে। এরপর আরশে কর্তৃত্বগ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবর্তে তোমাদের আর কেউ নেই রক্ষা করার কিংবা সুপারিশ করবার। এরপরও করবে না উপদেশ গ্রহণ?

৬. তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন আসমান থেকে জমিন অব্দি সকল বিষয়। পরিশেষে সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। এমন একটি দিনে, যার সময়কাল তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান।

৭. এমনই তিনি। যিনি জানেন সকল গোপন ও প্রকাশ্য। আযীয, রহীম।"

নবিজি থামলেন। কেঁপে উঠল ওয়ালীদ। কুরাইশদের কোনো জবাব না শুনিয়ে হতভম্ব ওয়ালীদ ফিরে গেল নিজের বাসায়। কুরাইশরা বসে থেকে থেকে যখন কোনো খবরই পেল না, সবক'টা গেল আবূ জাহলের বাসায়—'ও আবুল হাকাম, আবদু শামস মনে হয় মুহাম্মাদের দ্বীনের দিকে ঝুঁকে গেছে। আর যে এল না কোনো খবর নিয়ে'। আবূ জাহলের মাথা নষ্ট, দৌড়ে গেল ওয়ালীদের বাড়িতে—

– চাচা! আপনে তো আমাদের ইজ্জত একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আমাদের মাথা এক্কেরে হেঁট করে দিলেন। আমাদের দুশমনদের খুশি করে দিলেন মুহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করে। কেমনে করলেন কামডা?

– আমি তার দ্বীন গ্রহণ করিনি। তবে আমি তার মুখ থেকে এমন ওজনদার কথা শুনে এসেছি, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

– এটা কী কোনো ভাষণ-টাষণ?

– না, কোনো ভাষণ ছিল না এটা। ভাষণ তো লাগাতার কথা হয়। কিন্তু এটা এমন গদ্য, যার এক অংশ আরেক অংশের মতো না।

– এটা কী কোনো কবিতা ছিল?

– উহু, কবিতা না। আমি আরবদের সব ধরনের কবিতা শুনে অভ্যস্ত। এটা কবিতাও না।

– তাহলে কী এটা?

– আমি একটু ভেবে নিই দাঁড়াও।

পরদিন সকালে—

– ও আবদু শামস, কী খবরটবর। আমাদের প্রশ্নের কী জবাব?

– লোকেদের গিয়ে বলো—এটা জাদু। কেননা এটা হৃদয়কে একদম প্রভাবিত করে ফেলে।

হাজ্জের মৌসুম। কুরাইশদের চোখে ঘুম নেই। সারা আরব থেকে মানুষ আসবে। মুহাম্মাদের এসব অপূর্ব কথাবার্তা শুনলে তো তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। না জানি মুহাম্মাদের দল কত ভারী হয়ে যাবে। প্রধান নেতাদের নিয়ে কুরাইশরা বৈঠক ডাকল। সভায় সিদ্ধান্ত হলো: মক্কায় আগমনের সাথে সাথে হাজীদের কাছে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা শুরু করতে হবে। তাদের মধ্যে প্রবীণতম হলো ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। সে বলল—

– ভালো কথা। তোমরা যদি মুহাম্মদের ব্যাপারে একেকজন একেক রকম কথা বলো, তাহলে কেউ বিশ্বাস-ই করবে না। তাই যাই বলব, সবাই একই কথা বলব। এবার ঠিক করো তারা জিগ্যেস করলে কী বলবা।

– আমরা বলব, সে একটা গণক।

– তা বলা ঠিক হবে না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমাদের গণকদের সম্বন্ধে জানা আছে। গণকরা গুণ গুণ করে যে কথা আওড়ায়, যেসব কথা বানিয়ে বলে সে সবের সাথে কুরআনের সামান্যতম মিল নেই।

— তাহলে... তাকে পাগল বলা হোক।

— সে তো পাগল নয়। আমরা পাগল লোকদের ব্যাপারে জানি। পাগলা মাথাখারাপ লোক যে ধরনের আবোল তাবোল কথা বলে, উল্টাপাল্টা আচরণ করে মুহাম্মদের কথা-বার্তায় ও আচরণে তার রেশ মাত্র নেই। মুহাম্মদ যে বাণী পেশ করছে সে কথা শুনে কেউ বিশ্বাস করবে না যে তা পাগলের প্রলাপ বা জিনে ধরা মানুষের উক্তি।

— তাহলে আমরা তাকে কবি বলি।

— 'সে কবি নয়। আমরা সব রকমের কবি সম্পর্কে অবহিত। মুহাম্মদের মুখে উচ্চারিত কোনো বাণীর সাথে কবিতার সামান্যতম মিল নেই।'

— 'তাহলে তাকে জাদুকর বলা হোক।'

— 'সে জাদুকরও নয়। জাদুকরদেরকে আমরা ভালো করে জানি। জাদু দেখানোর জন্য তারা যেসব কাজ করে থাকে সে ব্যাপারেও তোমরা জানো। মুহাম্মদের ব্যাপারে এসব কথা খাটে না। তোমরা এতক্ষণ তার ব্যাপারে যেসব বলার প্রস্তাব করেছ লোকেরা তা শুনে বিশ্বাস করবে না বরং অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, তাঁর উচ্চারিত বাণীতে রয়েছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এসব কালেমার শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা-প্রশাখা খুবই ফলবান।'

— 'যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ সম্পর্কে কিছু না বলছো, ততক্ষণ পর্যন্ত কওমের লোকেরা তোমার প্রতি খুশি হবে না।'

— তাহলে আমাকে কিছু সময় ভাবতে দাও।

— অতঃপর সে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে বলল,

— 'মুহাম্মদ সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি জাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'

— 'বেশ বেশ, তাই হবে।

তারপর হাজ্জের সময় এলে সবাই মিলে পরিকল্পনা মোতাবেক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বহিরাগত হাজীদেরকে বলে বেড়াতে লাগল, 'এখানে একজন বড় জাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। তার জাদু পরিবারের মধ্যে বিভেদ পয়দা করে। এ লোকটির ব্যাপারে আপনারা সাবধান থাকবেন।' [১০]

---

[১০] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/১৯৯২০১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/৩০১-৩০৩; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৮৮-১৮৯।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা গাফির/মুমিন পাঠ করছিলেন-

“হা-মীম'। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তনস্থল।” (সূরা গাফির, ৪০ : ১-৩।)

শুরুর এই তিনটি আয়াত শুনেই এই ওয়ালীদ বলে উঠল...

'আল্লাহর কসম আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং তা কোনো জিনেরও কালাম হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর শব্দ বিন্যাসে রয়েছে এক বিশেষ বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর ওপরে কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা কখনোই মানুষের কালাম নয়।'[১১]

২.৩ নাদর ইবনুল হারিস:

একবার কুরাইশ নেতা নাদর ইবনুল হারিস নিজ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে এক ভাষণ দেন। ভাষণটা একটু দেখি চলেন:

'হে কুরাইশের জনগণ!

আজ তোমরা এমন এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার, যার মুখোমুখি ইতিপূর্বে কখনও হওনি। মুহাম্মাদ ছিল তোমাদেরই বংশের একজন যুবক। তার স্বভাব ও চরিত্রগুণে তোমরা সকলে ছিলে মুগ্ধ। তাকে আপন গোত্রে সর্বাপেক্ষা সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি গণ্য করতে এবং মুখে মুখেও একথা বলতে। আজ যখন তার চুলে বার্ধক্যের আলামত দেখা দিতে শুরু করেছে, আর তিনি এক অসাধারণ কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছেন তখন তোমরা তাকে জাদুকর বলতে আরম্ভ করেছ।

আল্লাহর কসম! তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি। তাদের চালচলন, কথাবার্তা, রীতি-রেওয়াজ সবই জেনেছি এবং বুঝেছি। তিনি মোটেই এদের মতো নন।

কখনও তোমরা তাকে গণক বলছো। খোদার কসম! তিনি গণকও নন। আমি অনেক গণক দেখেছি। তাদের কথা শুনেছি। তাঁর কালামের সঙ্গে সেসবের কোনো মিল নেই।

কখনও তাকে তোমরা কবি বলছো। আল্লাহর শপথ! তিনি কবিও নন। আমি নিজে কবিতা ও কাব্যকুশলতার যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করেছি। এর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। খ্যাতনামা কবিদের পদ্যচরণ আমার মুখস্থ। (মুহাম্মাদের বাণী এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।)

আবার কখনও তোমরা তাকে পাগল বলো। আল্লাহর কসম! তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি। ওদের এলোমেলো আবোল-তাবোল প্রলাপ শুনেছি। (এখানে এসবের কিছুই নেই।)

---

[১১] তাফসীরু কুরতুবি সূত্রে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, সূরা মুদ্দাসসির এর তাফসীর।

হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা ব্যাপারটি উদারমনে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখো। কারণ আল্লাহর কসম, তোমরা এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ।'[১২]

২.৪ উনাইস গিফারি:

সাহাবি আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমার ভাই উনাইস একবার পবিত্র মক্কা নগরীতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে সে বলে যে, 'মক্কায় একজন লোক আছেন। যিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত কী?' ভাই বলল, 'কেউ তাকে কবি বলে। কেউ গণক বলে। আর কেউ বলে জাদুকর।'

আমার ভাই উনাইস নিজেই একজন ভালো কবি। (ভাগ্য গণনা ইত্যাদি বিষয়েও তার বেশ জানাশোনা ছিল।) সে আমাকে বলল, 'আমি যতদূর চিন্তা করেছি, লোকজনের সবগুলো মতই অবাস্তব, ত্রুটিপূর্ণ। তার কথাগুলো না কবিতা, না গণকের ভবিষ্যদ্বাণী, না পাগলের প্রলাপ; বরং আমার দৃষ্টিতে একে সত্যবাণী বলে মনে হয়েছে।'[১৩]

২.৫ কায়েস ইবনু নুসাইবা

বানূ সুলাইম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। নাম কায়েস বিনু নুসাইবা। লোকটি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলো। তার পবিত্র জবানে কুরআন তিলাওয়াত শুনল। এরপর রাসূলকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। রাসূল উত্তর প্রদান করলেন। লোকটি তখনই ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে লোকদের বলল, 'আমি রোম-পারস্যের অগণিত সুসাহিত্যিক ও কথা-শিল্পীর বক্তব্য শুনেছি। অসংখ্য ভাগ্যগণকের কথা শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। জাদুকরদের কথাবার্তাও প্রায়ই শুনি। কিন্তু মুহাম্মাদের অসাধারণ বাণী আমি আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা সকলে আমার কথা শোনো, সবাই তার আনুগত্য করে নাও।' এ দাওয়াতে অনুপ্রাণিত হয়ে তার গোষ্ঠীর এক হাজার মানুষ মক্কাবিজয়ের সময় রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৪]

---

[১২] বাইহাকি, দালাইল, ২/২০১-২০২; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩২৭-৩২৮; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯।

[১৩] মুসলিম, ২৪৭৩-২৪৭৪; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯৩।

[১৪] সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯৩-১৯৪।

ঘটনাগুলো মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহিমাহুল্লাহ) রচিত আল-কুরআন : নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনন্য মু'জিযা ও নুবুওয়াতের প্রমাণ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। মাসিক আল-কাউসার নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। এসকল ঘটনা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

ঘটনা কী?

তাহলে কাহিনি কী আসলে? আরবের জাঁদরেল সব কবি, কাব্যবোদ্ধারা ভিরমি খাচ্ছে কেন? কী এমন আছে কুরআনে।

আরবি সাহিত্য মূলত দুই প্রকার হয়—পদ্য আর গদ্য। পদ্য বা কাব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য: ছন্দ (rhyme) আর মাত্রা (metre)। ছন্দ মানে তো বোঝেনই, একই অক্ষর দিয়ে শেষ হওয়া- অন্ত্যমিল। অবশ্য অন্ত্যমিল ছাড়াও ছন্দ হতে পারে। আর মাত্রা হলো, ছন্দ গণনার একক। যেমন: (বাঁশ+বা+গা+নের) এখানে ৪টি মাত্রা। আরবি কবিতায় এই মাত্রাকে বলে 'আল-বিহার' (সমুদ্র)। ছন্দে ছন্দে কাব্যের প্রবাহ বোঝাতে এমন বলা হয়। আরবি কাব্যে ১৬ রকম বিহার আছে— তাওয়িল, বাসিত, ওয়াফির, কামিল, রাজস, খাফিফ, হাযাজ, মুত্তাকারিব, মুনসারিহ, মুকতাতাব, মাদিদ, মুজতাছ, খাবাব, রামিল, সারিয়া। [১৫]

আরেক প্রকার আরবি সাহিত্য হলো গদ্য। গদ্য ২ প্রকার—গদ্যকাব্য (সায) আর সিধা গদ্য (মুরসাল)। গদ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো—ইরাকে নিয়োগের পর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের প্রথম ভাষণ, আর প্রাক-ইসলামি যুগে বললে কুস ইবনু সাইদার রচনা। আর সিধা গদ্য মানে নর্মাল বক্তৃতা-টক্তৃতা যেভাবে দেয় আরকি। মজার ব্যাপার হলো, Louis Cheikho কর্তৃক সংকলিত[১৬] ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী সব আরবি কবিতাই এই ১৬ বিহারের কোনো-না-কোনো ফরম্যাটে পড়ে। কিন্তু কুরআন এগুলোর কোনোটাতেই পড়ে না। ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট Arthur J. Arberry বলছেন: *For the Koran is neither prose nor poetry, but a unique fusion of both.*[১৭] আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কুরাইশ নেতা নাদর ইবনুল হারিসের কথাটুকু: '*আল্লাহর শপথ! তিনি কবিও নন। আমি নিজে কবিতা ও কাব্যকুশলতার যাবতীয় বিদ্যা অর্জন*

---

[১৫] উস্তায আবদুর রহীম গ্রীন-এর আলোচনা থেকে নেওয়া। Joseph Smith –এর সাথে এক বিতর্কে উনি একটি বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। আগ্রহীরা দেখতে পারেন। Lyall's book Translations Of Ancient Arabian Poetry. [C J Lyall, Translations Of Ancient Arabian Poetry, Chiefly Pre-Islamic, Williams & Norgate Ltd., London, 1930]

[১৬] Louis Cheikho, Shu'ara' 'al-Nasraniyah, 1890-1891, Beirut. Vol. 1: Qabla al-Islam and Vol. 2: Ba'da al-Islam

[১৭] A.J. Arberry, The Qur'an interpreted, London 1955, page 29.

করেছি। এর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। খ্যাতনামা কবিদের পদ্যচরণ আমার মুখস্থ'। এজন্য তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জ বুঝেছিল: **কুরআন তাদেরকে বলছে, এমন একটা আয়াত বানাতে যেটা না পদ্য, না গদ্যকাব্য, না ১৬ বিহারে পড়বে, আর না সেটা গণকের স্পীচের মত সরল গদ্য হবে। ফলে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি, 'ঝুলন্ত সপ্তক'-এ যার কবিতা টিকেছে, সেও হাল ছেড়ে দিল**—কীভাবে সম্ভব যাবতীয় সব ধরনের বাইরে গিয়ে কিছু বানানো। এটা কোনো মানুষের কম্মো?

এমনকি অমুসলিম আরবি ভাষাবিদ যারা, তারাও বিস্মিত। যদিও ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদী দর্শন[১৮] তাদেরকে 'অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব' স্বীকার করতে দেয় না, আগেই হিদায়েতের রাস্তা বন্ধ করে, কানে তুলো দিয়ে, চোখে ঠুলি নিয়ে গবেষণায় নামেন তাঁরা। সামনে আমরা দেখব, পশ্চিমা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' কীভাবে পথ চলে। সবকছুর বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য পশ্চিমা গবেষকরাও কুরআনের ভাষাশৈলীতে মুগ্ধতা আটকে রাখতে পারেনি। প্রকৃতিবাদে 'বদ্ধমনা' বলে হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করেননি, কিন্তু তলা দিয়ে মুগ্ধতাটুকু ঠিকই বেরিয়ে গেছে। প্রাচ্যবিদ H A R Gibb বলে ফেলেছেন:

> “ 'As a literary monument the Koran thus stands by itself, a production unique to the Arabic literature, having neither forerunners nor successors in its own idiom. ... and in forcing the High Arabic idiom into the expression of new ranges of thought the Koran develops a bold and strikingly effective rhetorical prose in which all the resources of syntactical modulation are exploited with great freedom and originality.'[১৯]

> “ 'সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললে কুরআনের সমতুল্য কিছু নেই, সে একাই। আরবি সাহিত্যে সে ইউনিক, বাগধারার ব্যবহারে যার আগে-পরে উদাহরণ নেই ... উচ্চমার্গের আরবি বাগধারাকে প্রয়োগ করে কুরআন বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আর এর মাধ্যমে সে তৈরি করেছে দৃঢ় এবং আশ্চর্য প্রভাবধারী গদ্যালঙ্কার। যার মাঝে বাক্যগঠনের সকল রসদকে কাজে লাগানো হয়েছে স্বাধীনভাবে এবং মৌলিকত্বের সাথে।'

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে

তাহলে বুঝলাম, সপ্তম শতকে কুরআনকে 'ফেস করা' পয়লা জাতির গর্ব-অহংকার-উৎকর্ষ-সর্বোচ্চ পারদর্শিতা ছিল—কাব্য। বর্তমান যুগে কী বলেন তো? এখন মানবজাতির গর্ব-উৎকর্ষ কী? ভাবা হয় এখন আমাদের সর্বোচ্চ অর্জন হলো—বিজ্ঞান।

---

[১৮] সামনে বিস্তারিত আসছে।

[১৯] H A R Gibb, Arabic Literature - An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press, p. 36.

বিজ্ঞান হলো সোজাসাপ্টা 'পর্যবেক্ষণলব্ধ বিশেষ কাঠামোগত জ্ঞান'। যদিও একটা সময় গেছে যখন এক্সপেরিমেন্ট করে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বলা হতো *arabicorum studiorum sensa* (view of the arabs) বা 'আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি'[২০]। দিন বদলেছে, তুমি আর নেই সে তুমি, বিজ্ঞানও আর নেই সে বিজ্ঞান। কী দর্শনে এখনকার বিজ্ঞান কাজ করে, কারা এখন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে এগুলো সামনে আলাপ করছি। এখন আমরা আক্ষরিক অর্থে বিজ্ঞান বলতে যা বুঝি, বা 'যা আমাদের বোঝানো হয়' সেটাই মীন করছি 'বিজ্ঞান' বলতে।

মানবজাতির পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এখন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। আমরা এখন চোখের চেয়েও বেশি দেখি, কানের চেয়েও বেশি শুনি, মগজের চেয়েও দ্রুত হিসেব কষি, ত্বকের চেয়েও বেশি অনুভব করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের power বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা বেড়েছে। দূরবীন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, এক্স-রে, আল্ট্রাসাউন্ড, রেকর্ডিং, ইসিজি, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বহুকিছু। আগে মানুষ যা দেখতে পেত না, তা দেখতে পাচ্ছে। যা শুনতে পেত না, তা ভিন্নভাবে বুঝছে। যা বুঝত না, তা বুঝে নিচ্ছে। ইসিজির গ্রাফ দেখে হার্টের ভোল্টেজ (electrical activity) বুঝে নিচ্ছে, এক্স-রে দিয়ে ভেতরে দেখে নিচ্ছে, সাউন্ড দিয়ে দেখছে গর্ভের সন্তান, ডপলার দিয়ে রক্তের প্রবাহ দেখে বুঝে নিচ্ছে হার্টের ছিদ্র, আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের বিকিরণ বিশ্লেষণ করে দেখে নিচ্ছি। সামান্যতম তাপের পার্থক্য ত্বকে না বুঝলেও মেশিনে ডিটেক্ট হচ্ছে। কম্পিউটার দিয়ে হিসেব-তথ্য সংরক্ষণ হচ্ছে মগজের চেয়ে দ্রুত, সেগুলো বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসাও যায় দ্রুত। মানে প্রযুক্তির বদৌলতে মানুষের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন বহুগুণে। ফলে যা আগে বোঝা কঠিন বা অসম্ভব ছিল, তা আজ চোখে দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর আগে এগুলো কল্পনাতেও আসত, বলেন?

এবার আগের হাদীসের কথাটা খেয়াল করুন: '*প্রত্যেক নবিকে 'তাঁর যুগের প্রয়োজন মোতাবেক' কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়েছে...*'। আমাদের নবির যুগ কোনটা? সেই নবি তো আজও নবি, কিয়ামাত পর্যন্ত তিনি নবি, আরবভূমি ছাপিয়ে সারা বিশ্বের জন্য নবি। মানে, তাঁর যে মু'জিযা সেটা তো কিয়ামাত তক মু'জিযা হবার কথা। তার মানে, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো যুগের যেকোনো জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে, তাদের excellence-কে ছাপিয়ে তাদের হয়রান করে দেবার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে কুরআনকে।

কাব্যবোদ্ধা আরবজাতিকে কুরআন যেভাবে বিস্ময়াহত করে দিয়েছিল, আজকের

[২০] Metlitzki, D. 1977. The matter of araby in medieval england. Yale university press সূত্রে Islam in Europe, Jack Goody. P.61

বিজ্ঞান-দর্পী মানবজাতিরও সেই একই হাল হবার কথা। জি, ঠিক তাই। কিয়ামাত পর্যন্ত আনেওয়ালা প্রত্যেক মানুষকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দেবার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে কুরআনকে। তারা যেভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—'مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ'- এটা কোনো মানুষের কথা নয়'। সেই একই সুরে কখনও আপনি দেখবেন—

- থাইল্যাণ্ডের Chiang Mai University-র এনাটমির চেয়ারম্যান প্রোফেসর Tejatat Tejasen কে বলতে:

“ এই কনফারেন্সে যা কিছু শুনলাম আর আমার পড়াশুনা থেকে যা বুঝলাম, তাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে: কুরআনে যেসব কথা ১৪০০ বছর আগে এসেছে, সেগুলো অবশ্যই সত্য, আর তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করাও সম্ভব। যেহেতু নবি মুহাম্মাদ লিখতে-পড়তে পারতেন না, তিনি নিশ্চয়ই সত্য বার্তাবাহক, যে কিনা এই সত্য তথ্যগুলো পৌঁছানোর কাজটি করেছেন। যে সত্য তাঁর কাছে আলো হিসেবে নাযিল করেছেন তিনিই, যিনি স্রষ্টা হিসেবে যোগ্য সত্তা। আর এই স্রষ্টা নিশ্চয়ই গড।

- কখনও দেখবেন ভ্রূণতত্ত্ববিদ প্রোফেসর Keith L. Moore -কে বলতে:

“ কুরআনে মানবভ্রূণের যে বিবরণ, তা ৭ম শতাব্দীর জ্ঞান হতে পারে না। একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এটাই যে, এই বিবরণ GOD-এর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের কাছে এসেছে। তিনি নিজে এত বিস্তারিত জানতে পারেন না, কেননা তিনি ছিলেন নিরক্ষর মানুষ যার কোনো বিজ্ঞান-প্রশিক্ষণ একদমই ছিল না।

- দেখবেন University of Colorado-র ভূতত্ত্ববিদ প্রোফেসর William Hay-কে বলতে:

“ আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে যে, এই ধরনের তথ্য কুরআনের মত প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে। এবং এই জিনিস কোথা থেকে এর ভেতরে এল তা জানার কোনো কায়দাও নেই। কিন্তু এইটা খুবই অদ্ভুত যে, কিছু প্যাসেজে যে তথ্য বলা আছে, তা আবিষ্কারের গবেষণা এখনও চলছে। আমি বরং ভাবব, এটা নিশ্চয়ই সেই দৈব সত্তার কাজ।

- টোকিও ইউনিভার্সিটির এস্ট্রোনমির প্রোফেরসর এমিরেটাস Dr. Yoshihide Kozai বললেন:

“ কুরআনে জ্যোতির্বিদ্যার সত্য তথ্যগুলো দেখে আমি খুবই আপ্লুত। আমরা, আধুনিক জ্যোতির্বিদরা এখনও মহাবিশ্বের খুব অল্প অংশ নিয়েই গবেষণা করেছি।

- জার্মানির University of Mainz-এর ভূবিদ্যার অধ্যাপক Alfred Kroner বলেন:

“ মুহাম্মাদ কেমন জায়গা থেকে এসেছেন, ভাবতে গিয়ে আমি দেখলাম: এটা প্রায় অসম্ভবই যে, তিনি মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে জানবেন। কেননা বিজ্ঞানীরা কেবল গত কয়েক বছরের ভেতর অত্যন্ত জটিল ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটা জেনেছেন।

- King Abdulaziz University-র সমুদ্রতত্ত্বের প্রোফেসর Durja Rao বলেন:

> "এটা অবশ্যই সাধারণ মানবজ্ঞান নয়। একজন সাধারণ মানুষ এই ঘটনা এত বিস্তারিত বলতে পারে না। তাই আমি মনে করি, এসব তথ্য নিশ্চয়ই কোনো অতিপ্রাকৃত উৎস থেকে এসে থাকবে।

এমনি করে আপনি দেখতে পাবেন:

- University of Manitoba-র এনাটমির প্রোফেসর Dr. T. V. N. Persaud
- Baylor College of Medicine-এর স্ত্রীরোগবিদ্যার প্রোফেসর Dr. Joe Leigh Simpson
- ফিলাডেলফিয়ার Thomas Jefferson University-র এনাটমি ও ভ্রূণবিদ্যার প্রোফেসর এমিরেটাস Dr. E. Marshall Johnson
- Georgetown University-র ভ্রূণবিদ্যার প্রোফেসর Dr. Gerald C. Goeringer

নেট ঘাঁটলে এমন বহু সাক্ষাৎকারের ভিডিও ক্লিপ আপনি পাবেন। এরা সবাই নিজ নিজ ফিল্ডে excellence অর্জন করেছেন, এরা সবাই সেই আরব কবির মতো নিজ বিষয়ে পারদর্শী। আরব কবি যেমন বলেছেন: এটা কোনো মানুষের রচনা নয়। আজকের এই এক্সপার্টরাও হয়রান হয়ে ঘোষণা করছেন-'এটা কোনো মানুষের জ্ঞান না'। ইসলাম কবুল করুক বা না করুক, বিবেকের কাছে যে পরিষ্কার, সে স্বীকার করেছে। এবং আল্লাহ যাকে চাইবেন, যার মনের সন্ধানী শুদ্ধতা তাঁর পছন্দ হবে, সে হয়তো বুঝে মেনেও নিবে।

আবার কেউ কেউ বুঝেও অস্বীকার করবে, ইনিয়েবিনিয়ে ব্যাখ্যা করবে—হয়তো মুহাম্মাদ বাইরে থেকে জেনেছে, হয়তো তিনি অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন, হয়তো বাইবেল থেকে নিয়েছে, হয়তো এই, হয়তো সেই... ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন আরবেও কিছু লোক করত। যখন হতবাক হয়ে যেত কুরআনের মু'জিযার সামনে, মন-মগজ অবশ হয়ে যেত; তারা বলত: মুহাম্মাদ আমাকে জাদু করেছে। কানে আঙুল দাও, মুহাম্মাদের কথা শুনলেই আছর করে। মুহাম্মাদ জাদুকর, পাগল, জিনগ্রস্ত। কেন করেছিল? পদ, নেতৃত্ব, সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে। লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে, পরিবার মেনে নেবে না, খাহেশ পূরণে বাধা আসবে। এমনটা আজও পাবেন, খোদ মুসলিমদের ভেতরেই পাবেন। ইসলামকে ভয় পায় মুসলমানেই। কাফিরের কথা বাদ-ই দিলাম।

এরকম বিজ্ঞানীদের মুখ থেকে কুরআনের মু'জিযার প্রকাশ দেখতে খুব ভালো লাগে, তাই না বলেন? আমারও লাগে। কিন্তু এর একটা বিপদ আছে। মহাবিপদ।

বিপদটা কোথায়?

সমস্যা ১: নগদে পল্টি [২১]

- Joe Leigh Simpson সাহেব একজন ধার্মিক প্রেসবাইটেরিয়ান খ্রিষ্টান। তিনি Houston শহরের Baylor College of Medicine-এ obstetrics and gynecology বিভাগের চেয়ারম্যান। ১৯৮০ সালের দিকে তিনি মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কেননা সেসময় তিনি দাবি করেছিলেন: কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস ও বিজ্ঞানগত বিষয়গুলো অলৌকিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্য। ২০০২ সালে তিনি নগদে পল্টি মেরে দিলেন। ওয়াল স্ট্রীট জার্নালকে বললেন: *সেসময় আমি কিছু 'আউট অব কনটেক্সট' কিছু 'সিলি' মন্তব্য করেছিলাম।*

- শেইখ আবদুল মাজীদ জিন্দানি প্রতিষ্ঠা করেন Commission on Scientific Signs in the Quran and Sunnah, বিভিন্ন কনফারেন্স আয়োজন করে দাওয়াত দেওয়া হতো অমুসলিম বিজ্ঞানীদেরকে। কুরআনের আয়াত ও হাদীস তাদের সামনে পেশ করে ভিডিওটেপ করা হতো। সমুদ্রবিজ্ঞানী William Hay-কে আনা হয়েছিল এবং তাঁর সামনে দেওয়া হয়েছিল কুরআনের এই আয়াত:

  সেখানে তিনি মন্তব্য করেন: I would think it must be the divine being. পরে তিনি ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে বলেন, জিন্দানি সাহেব বার বার তাকে 'পুশ' করছিলেন এটা বলার জন্য। এভাবে—

  জিন্দানি : সাগরের গভীরেও যে ঢেউ হয়, এটা ১৪০০ বছর আগে নবিজি কীভাবে জানতেন?

  Hay : মুহাম্মাদ হয়তো নাবিকদের কাছ থেকে জেনেছেন।

  জিন্দানি : নবি কখনও কোনো সমুদ্র-বন্দরে যাননি। তাহলে কীভাবে জেনেছেন?

বর্তমানে জার্মান এক মেরিন ইন্সটিটিউটে কর্মরত William Hay বলেন: এভাবে ফাঁদে ফেলে আমার মুখ থেকে বের করা হয়েছে 'it must be the divine being'. একই

---

[২১] Daniel Golden (Jan. 23, 2002) Western Scholars Play Key Role In Touting 'Science' of the Quran, The Wall Street Journal

ধরনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন Geological Society of America-র Allison Pete Palmer সাহেব।

শেইখ জিন্দানি তাঁর সংস্থার এক প্রকাশনার ইন্টারভিউয়ে বলেন: *মুসলিমরা যখন কুরআন-সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক সত্যতা জানতে পারেন, তখন তারা এক ধরনের সম্মান, আত্মবিশ্বাস ও তৃপ্তি অনুভব করে এটা ভেবে যে, আমরা সত্য ধর্মের ওপর আছি।* কুরআনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমাণ করার এই চেষ্টাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'বুকাইলিজম', ড. মরিস বুকাইলি (বুকাই)-র নামানুসারে। ১৯৭৬ সালে এই ফরাসি সার্জন কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা উঠান। তিনি দাবি করেন 'বিগ ব্যাং থিওরি', 'মহাকাশ ভ্রমণ' ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিক চমকের ব্যাপারে কুরআন আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। একই সাথে তিনি দেখান, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে বাইবেল ব্যাপক হারে বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল তথ্যে ঠাসা। তাই কুরআন সৃষ্টিকর্তার ওহি হিসেবে বেশি নির্ভরযোগ্য বাইবেলের চেয়ে। আধুনিক পশ্চিমা বিজ্ঞানকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে কুরআন ও ইসলামকে সত্য প্রমাণের এই প্রবণতা অনেকের মাঝেই দেখা যায়। University of Pensylvania-র ইতিহাসবিদ S. Nomanul Haq বলেন:

> "'এই মানসিকতা আসলে এক ধরনের 'হীনম্মন্যতা' যেটা দীর্ঘ কলোনিয়ালনিজমের ফলে জন্মেছে। ইসলাম সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সেই হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের বাসনাও এর একটা কারণ।'

দেখলেন তো, কীভাবে এই খ্রিষ্টান বা সেক্যুলার বিজ্ঞানীরা ঘুরে যেতে পারে। আচ্ছা এঁদের সাথে কি আমার আপনার ঈমানও ঘুরে যাবে। কক্ষনো না। **বিজ্ঞান কখনোই আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি না।** আমাদের বিশ্বাস কুরআনে; বিজ্ঞানে না। বিজ্ঞান ঠিক বললে কুরআন ঠিক, আর বিজ্ঞান ঘুরে গেলে কুরআন ভুল—এটাকে ঈমান বলে না। এজন্য বিজ্ঞানকে কষ্টিপাথর ধরে কুরআনের আয়াত হাদীসের বিধানকে ঘষাঘষি মারাত্মক বোকামি। কেননা বিজ্ঞান তো মানুষের জ্ঞান, আর কুরআন-হাদীস তো স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞান। কীভাবে মানুষের জ্ঞান বিচারক হতে পারে আল্লাহর জ্ঞানের? এজন্য আমরা আমাদের ঈমানকে বিজ্ঞানের পাগলা ঘোড়ায় চড়াই না। সারা দুনিয়ার সব বিজ্ঞানী এক হয়ে কুরআনকে ভুল প্রমাণ করে দিলেও আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা, খোদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর চেয়ে কে বেশি জানবে। বিজ্ঞান চলুক বিজ্ঞানের মতো, এ ঘাটে ও ঘাটে জল খেয়ে যদি কোনোদিন নিরপেক্ষ মত দিতে পারে, বিজ্ঞান নিজেই ইঙ্গিত করবে ওহির সত্যতার দিকে। প্রিয় পাঠক, মনে বেশ কিছু প্রশ্ন আসছে, ঠিক না? জি, আমারও আসছে। তাহলে লিখে ফেলি প্রশ্নগুলো?

- ➡ কিন্তু কুরআন তো পর্যবেক্ষণ করতে বলেছে। কুরআনে তো বিজ্ঞানের অনেক বিষয় আছে, যেগুলো সত্য বলে আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে। আপনি এগুলান কী বলেন?
- ➡ তাহলে ধর্ম আর বিজ্ঞান কি প্রতিপক্ষ? মুখোমুখি?
- ➡ বিজ্ঞান কী? কীভাবে কাজ করে বিজ্ঞান? বিজ্ঞান কি নিরপেক্ষ?
- ➡ মধ্যযুগে মুসলিমরাই তো বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তক। তাহলে এ কথা কেন বলছেন?

এসব প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদের যেতে হবে একটু আগে। আচ্ছা, চলেন যাই তাহলে মধ্যযুগ থেকেই একটু ঘুরে আসি।

আব্বাসী খিলাফত (৭৫০-১২৫৮)

ধর্ম ও বিজ্ঞান

ধর্ম কী?

ইউরোপ 'ধর্ম' বলতে বিশেষ একটা জিনিস বোঝে বা বোঝায়। তাদের কাছে 'ধর্ম' মানে হলো দুনিয়ার সাথে নিঃসম্পর্ক আধ্যাত্মিকতা। যেজন্য খ্রিষ্টবাদ হলো তাদের চোখে 'পিওর ধর্ম'। ইসলাম ও ইয়াহূদিবাদ 'পিওর ধর্ম' না। এতে পারিবারিক, সামাজিক, বিচারিক, রাষ্ট্রীয় কথাবার্তা আছে বলে। সেন্ট পলের খ্রিষ্টবাদ (ইউরোপীয় খ্রিষ্টবাদ) ইউরোপের চোখে ধর্মের যে ছবি এঁকে দিয়েছে তা হলো—

১. দুনিয়া ও ধর্ম পৃথক জিনিস। একসাথে মেলানো যাবে না—*'Render unto GOD that is GOD's. And render unto Caeser that is Caeser's.'*[২২] কিংবা *'My kingdom is not of this world'.*[২৩] ধর্ম দুনিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সমাজ-রাষ্ট্র এগুলো ধর্মের টপিক না। বর্তমান সেক্যুলারিজমের জন্মের পিছনে খ্রিষ্টবাদের দায় অনেক।

২. দুনিয়ার কাজ আর ধর্মের কাজ আলাদা আলাদা। ধর্মের কাজ করতে হয় দুনিয়া থেকে বেরিয়ে। মঠবাসী সন্ন্যাসী হয়ে।

৩. ধর্মে কোনো যুক্তি নেই, যুক্তির স্থান নেই। মানবিক বুদ্ধিতে ধর্ম ধরে না। নিরেট বিশ্বাসে ধর্মের অস্তিত্ব।

৪. ধর্ম মানে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক সাধনা। দুনিয়ার সম্পর্ক-সম্পদ-মোহ ত্যাগ, মঠবাসী জীবন, লাগাতার উপবাস, নিজেকে নানাভাবে অকারণ কষ্ট দেওয়া, অবৈজ্ঞানিকভাবে মানবিক চাহিদাকে বঞ্চিত করা। এগুলোই ধর্ম।[২৪]

এই চোখে ইসলামকে দেখলে তাই পছন্দ হয় না। বরং রুমির 'সুফিজম' এই চোখে বেশ। **ধর্ম যে যৌক্তিক হতে পারে, মানবীয় যুক্তিকে পরাস্ত করতে পারে, ধর্ম যে**

---

[২২] Mark 12:17

[২৩] John 18:36

[২৪] ড. আলিজা আলি ইজাতবেগোভিচ, *প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও ইসলাম*, পৃ.৭০-৭৮
Uehlinger, Christoph. *"Concepts of Religion between Asia and Europe - Some Retrospective Preliminaries"* Asiatische Studien - Études Asiatiques, vol. 72, no. 1, 2018, pp. 137-145.

বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে, চোখের দেখা-অন্তরের যুক্তিবোধ-পর্যবেক্ষণ দিয়ে যে ধর্মের সত্যতা অনুভূত হতে পারে—এটা ধর্মের 'ইউরোপীয় সংজ্ঞায়' পড়ে না। কেননা ইউরোপ ধর্মকে চিনেছে খ্রিষ্টবাদ দিয়ে। ধর্ম ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও যুক্তি, ধর্ম ও দুনিয়ার এই সেপারেশন খাঁটি ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

এজন্যই ইসলামকে কখনও ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বলেছে 'বস্তুবাদী ইয়াহূদিবাদের আধ্যাত্মিক সংস্করণ', কখনও বলেছে 'এটা কোনো ধর্ম না, এটা একটা 'socio-politico-economic system'। কেননা ইসলাম তাদের পরিচিত 'পিওর ধর্ম' খ্রিষ্টবাদের মতো না। এখানে যুক্তির জায়গা আছে (কিয়াস)। এখানে পর্যবেক্ষণের স্থান আছে। এখানে মানবীয় আকল/ জ্ঞানবোধ খাটানোর তাগিদ আছে। ইন্দ্রিয়-বেক্ষণের উৎসাহ আছে, না খাটালে ভর্ৎসনা আছে। কুরআনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়–

তোমরা কি আক্কেল করো না?
তোমরা কি দেখো না?
তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না?

চিন্তাভাবনা করে, আকল খাটিয়ে, বীক্ষণ করে মানে আলামত দেখে (সেটা হতে পারে দূরবীক্ষণ, হতে পারে অণুবীক্ষণ) এই ধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে চিনে নেওয়া যায়। ফিতরাতের এই দ্বীন মানবীয় আকলি ফিতরাতের সাথে যায়। জোর করে যুক্তিবুদ্ধি-হিসাব অস্বীকার করে 'একে তিন, তিনে এক' মেনে নিতে হয় না।

ঈমানের সাথে যুক্তি-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক

ঈমানের ভিত্তি: রিসালাত ও মু'জিযা

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সব কথা মেনে নিয়েছেন। যা বলেছেন, সব। এজন্যই তাঁর নাম 'সিদ্দীক'—সর্বোচ্চ সত্যায়নকারী। মি'রাজের মতো অবিশ্বাস্য কথা শুনে বলেছেন: *'যদি এ কথা মুহাম্মাদ বলে থাকে, তবে তা-ই সত্য'।* এটাকে কি আপনি অন্ধ-বিশ্বাস বলবেন? সাহাবিরা কি নুবুওয়াতে অন্ধবিশ্বাস করতেন? সামি'না ওয়া আত্ব'না—এর আগে কি কিছু ছিল? নাকি মাথায় আসুক, না আসুক, গিলতেই হবে ট্রিনিটির মত'—ইসলামের বিশ্বাসগুলো এমন? আমি বলি 'না'। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ঈমান আনার আগে তাঁর

সামনে ৪০ বছরের একটা empirical knowledge ছিল। সেই 'অভিজ্ঞতালব্ধ ও পর্যবেক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান' ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আবূ বকরের ৪০ বছরের রিসার্চ। রিসার্চের ফলাফল হলো: 'এই ব্যক্তি, ৪০টা বছর যাকে আমি একবারের জন্যও মিথ্যা বলতে দেখিনি, এখনও সে মিথ্যা বলছে না'। মক্কার অধিবাসী প্রাপ্তবয়স্ক সাহাবিদের ক্ষেত্রে কমবেশি এই empirical knowledge প্রযোজ্য।

আল্লাহ কুরাইশদের 'রিসার্চ-অসততা'-কেই ভর্ৎসনা করেছেন কুরআনে বার বার।

- তোমরা দুনিয়াবি স্বার্থে তোমাদের ৪০ বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিসর্জন দিতে পারলে?
- তোমরা তাঁকে চেনো-জানো-মেনে এসেছ এতকাল। তোমরাই তাঁর নাম দিয়েছ আল-আমীন। তোমরা তাঁর মুখে কুরআন শুনলে, তাও তো আরবি ভাষায়ই ছিল, তোমাদেরই ভাষায়। শুনেটুনে বুঝলেও যে এটা তার পক্ষে বানানো অসম্ভব, কোনো মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। এত এত ডেটাকে তোমরা তুচ্ছ দুনিয়ার লোভে এখন অস্বীকার করছো।
- ও ইয়াহূদিরা, তোমাদের কী হলো? নিজেদের কিতাব থেকে তোমরা তো তাঁকে নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি চেনো। এত এত ডেটা দেওয়া ছিল তোমাদের কিতাবে। আজ সব ডেটা পিছনে ফেলে দিলে, যেন তোমরা জানোই না।

সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম) এর স্বতঃস্ফূর্ত ঈমান আমাদের মতো পৈতৃক অন্ধবিশ্বাস ছিল না। প্রত্যেক সাহাবিকে ঈমান আনার আগে এমনই 'লজিক এন্ড রিজনিং'এর ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, অন্ধবিশ্বাস করেননি কেউ-ই। তাদের বিশ্বাসের দুটো ভিত ছিল। দুটো লজিকে হেরে তারা আত্মসমর্পণ করেছিলেন নবিজির দাওয়াতের সামনে। তাদের তাবৎ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান (empirical evidence) দুটো জিনিসের কাছে লুটিয়ে পড়েছিল। দুটো শর্তে হেরে যখন কেউ বুঝে ফেলল, ইনি যা বলছেন তা মিথ্যে হতে পারে না। যা তিলওয়াত করছেন, তা মানুষের হতে পারে না। নবিজির সত্যতার ব্যাপারে যখন আর কোনো সন্দেহ নেই, এবার বাদবাকি সব সামি'না ওয়া আত্ব'না। তিনি যা বলছেন, সব মেনে নিলাম।

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) যে আবূ জাহলের মুখে মি'রাজের ঘটনা শুনে বলেছিলেন: যদি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দাবি করে থাকেন, তাহলে তা সত্য। এই কথা নবিজির প্রতি তাঁর অন্ধবিশ্বাস ছিল না। বরং এটা ছিল তার ৪০ বছরের রিসার্চের চোখ-খোলা বিশ্বাস, ৪০ বছরের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা দেখা-শোনা-ওঠা-বসা তাকে বলেছে, মুহাম্মাদ মিথ্যা বলতে পারেন না। একইভাবে মক্কার লোকেদেরকে আল্লাহ

তাআলা একটা বুনিয়াদে ঈমান আনতে বলেছেন, ঈমান চাপিয়ে দেননি। তোমাদের প্রতি 'তোমাদের মধ্য থেকে' একজন রাসূল, তোমরা জানো সে 'উম্মি' রাসূল। আল্লাহ মক্কাবাসীকে আহ্বান করেছেন, তোমাদের ৪০ বছরের চর্মচক্ষুর জ্ঞানের ওপর ইনসাফ করো। তোমরা খুব ভালো করেই জানো, এই ব্যক্তি ৪০ বছর কোনো মিথ্যা বলেনি, আল-আমীন নামে তোমরাই তাকে ডেকেছ। যখন শত্রুতা করেছ, তখনও আমানত গচ্ছিত রাখার জন্য তার চেয়ে উত্তম কাউকে পাওনি। আবু সুফইয়ান হিরাক্লিয়াসের দরবারে পর্যন্ত মানসম্মানের ভয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে: ইতিপূর্বে সে কখনও মিথ্যা বলেনি[২৫]। **মক্কাবাসী সাহাবিদের ঈমানের ভিত্তি নবিজির ৪০ বছরের 'সীরাহ'** এর বুনিয়াদেই আল্লাহ তাদের ঈমান আনতে বলেছেন, ভর্ৎসনা করেছেন। এটা গেল এক নম্বর। মদীনাবাসীরা মক্কাবাসী সাহাবিদের থেকে শুনে আর নবিজির চালচলন স্বচক্ষে দেখে এই পয়েন্টে নিশ্চিত হয়েছেন।

আর দুই নম্বর ছিল 'কুরআন'। আরবি ভাষা-কাব্যে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি তাদেরই এক উম্মি প্রৌঢ়ের মুখঃনিসৃত অলৌকিক আরবি বাচন। কুরআনের মু'জিযা তাদেরকে হয়রান করে দিয়েছে। ১ ও ২ নং মিলিয়ে তাদের সামনে পুরো চ্যালেঞ্জটা ছিল: "এনাকে আমরা চিনি ভালোমতো, ইনি মিথ্যা বলতে পারেন না। আর এই কিতাব ইনার দ্বারা লেখাও সম্ভব না"। কুরআনও সেই চ্যালেঞ্জই করেছে: যদি উম্মি হয়েও মুহাম্মাদ লিখে থাকে, তবে তোমরা শিক্ষিত, তোমরা লিখে আনো এমন একটা কিতাব, নইলে একটা সূরা, নইলে একটা আয়াতই আনো হে। নবিজির সত্যতা এবং কুরআনের অলৌকিকত্ব— এই দুই দানে হেরে সত্যনিষ্ঠ সাহাবিদের ঈমান না এনে আর কোনো উপায় ছিল না। সীরাহ ও আরবি ভাষা শেখা ঈমানের দুই খুঁটি। ঈমানের মেহনত এই দুটো ছাড়া অপূর্ণ।

আমার কথা হলো, খ্রিষ্টবাদের মতো আমরা মুসলিমরা জোর করে ব্রেনের বিপরীতে গিয়ে মেনে নিই, বা অন্ধবিশ্বাস করি—ব্যাপারটা মোটেই তা না। **বরং আমরা বুঝে বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করার জন্য বিশ্বাস করি না। বরং আমরা বিশ্বাস করি, কারণ আমরা জানি।** Epistemology ক্লাসে Prof Duncan Pritchard বলেছিলেন: *We don't merely believe, We believe because we know it.* ইয়েস উই নো ইট বিফোর উই বিলিভ। জানি বলেই, এটা আমরা শাহাদা দিই, সাক্ষ্য দিই। যা জানি না, তার সাক্ষ্য দেবো কীভাবে? আমরা মনেপ্রাণে জানি, মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু

[২৫] আবু সুফইয়ান (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণের পর স্বীকার করেছেন, 'আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, আমার সাথে থাকা মক্কার লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাহলে অবশ্যই আমি ঐদিন মুহাম্মাদের নামে মিথ্যা কথা বলে আসতাম। সম্রাটের একটা প্রশ্ন ছিল, 'তাঁর দাবির পূর্বে তোমরা কি কখনও তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ?' আমি বললাম, 'না'।—বুখারি, ০৭।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে ৪০ বছরে কোনোদিন মিথ্যা বলেননি, যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তাঁর জানের দুশমনও।

যখন আল্লাহ তাআলা নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নির্দেশ দিলেন: "*এবং আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।*" নবিজি সাফা পাহাড়ে চড়ে সবাইকে ডাকলেন: 'ইয়া সাবাহা'। শত্রুর হামলার খবর ঘোষণার জন্য এভাবে ডাকার রীতি ছিল, আমাদের সাইরেন টাইপ। সকলেই জড়ো হলো পাহাড়ের কোলে, যে আসতে পারল না, সেও নিজের পক্ষ থেকে কাউকে পাঠালো। নবিজি মুখ খুললেন:

— ও আবদুল মুত্তালিবের বংশ! ও ফিহরের বংশ! ও কা'বের বংশ! আমি যদি তোমাদের এই খবর দিই যে, এই পাহাড়ের ওপাশে একদল অশ্বারোহী শত্রু তোমাদের ওপর আক্রমণে উদ্যত। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? (শুধু আমার কথায় অদেখা বিপদের খবরে বিশ্বাস করবে?)

— হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব আমরা। যেহেতু ইতিপূর্বে তোমার থেকে মিথ্যা কথা তো আমরা শুনিনি।[২৬]

— শোনো তাহলে, আমি তোমাদেরকে অত্যাসন্ন এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করছি।

মিলিসেকেন্ডের মাঝে উল্টে গিয়ে আবূ লাহাব বলে উঠল: দিনমান তোমার ওপর ধ্বংস আর দুর্ভোগ নেমে আসুক। এজন্যই ডেকে এনেছ আমাদের? কেবল একটু আগেই বলেছিল, যা বলবে তা-ই বিশ্বাস করব, কেননা তুমি তো আল-আমীন। ৪০ বছর ধরে তোমাকে চিনি আমরা। আর এখন তারাই বলছে, মুহাম্মাদ মিথ্যাবাদী, গণক, জাদুকর, কবি। বাহ।

প্রশ্ন আসতে পারে। ৪০ বছর মিথ্যে বলেননি তো কী হয়েছে? নতুন করে মিথ্যে বলা শুরু করেছেন, তাও তো হতে পারে? আচ্ছা, ফৌজদারী আদালতে বিচারক প্রথম দেখেন *cui bono*—মানে এই অপরাধের দ্বারা কার লাভ? বাচ্চাটাকে যে হত্যা করা হলো, হত্যা করে কে কে লাভবান হয়েছে? কে কে সম্পত্তি পাচ্ছে বাচ্চাটার? যার লাভ, তাকে সাঁড়াশি দিয়ে ধরো, সত্য বেরিয়ে আসবে। একদিন দুরুম করে পাহাড় থেকে এসে মিথ্যা যে তিনি বলা শুরু করলেন, লাভ কী কী তার? ক্ষমতা-নারী-মর্যাদা-সম্পদ?

কুরাইশরা উতবা ইবনু রবীআ-কে পাঠালো নবিজির দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার একটা চেষ্টা করতে। উতবার প্রস্তাব ছিল[২৭]—

---

[২৬] বুখারি, তাফসীর অধ্যায়, ৪৭৭০-৪৯৭১-৪৯৭২; মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, ২০৮; সূত্রে সীরাতুন নবি, শাইখ ইবরাহীম আলি, মাকতাবাতুল বায়ান, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৯।

[২৭] হাকিম, ইবনু আবী শাইবা, আবূ ইয়া'লা, ইবনু হিশাম, বাইহাকি সূত্রে প্রাগুক্ত। এবং হায়াতুস সাহাবা, ১/৬৩-৬৯।

> ‘হে পুরুষ! তোমার যদি আর্থিক চাহিদা থাকে তাহলে বলো। আমাদের সকলের সম্পদ থেকে অংশবিশেষ জমা করে তোমাকে দেবো। তাতে তুমি বনে যাবে কুরাইশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। (সম্পদ)
>
> যদি বিয়ের প্রয়োজন বোধ করো, বলো। কুরাইশ নারীদের মাঝে যাকে ইচ্ছা বেছে নাও। আমরা তোমার কাছে ১০ জনাকে বিয়ে দেবো। (নারী)
>
> যদি বাদশাহি চান বলুন, আপনাকে বাদশাহ বানিয়ে নেবো। (ক্ষমতা)
>
> আপনার উদ্দেশ্য যদি সম্মান হাসিল করা হয়, তবে আমরা আপনাকে এমন সম্মান দেবো যে, কওমের কেউ আপনার চেয়ে সম্মানের অধিকারী হবে না। (সম্মান)
>
> আর আপনার যদি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা আমাদের সকল গোত্রের ঝাণ্ডা আপনার ঘরের সামনে গেড়ে দেবো।’ (নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব)

সকল প্রলোভন আর হুমকির মুখে তাঁর জবাব ছিল একটাই—

> “আপনারা যদি সূর্যের আগুন দিয়ে একটা মশাল জ্বালিয়ে এনে দেন, তাতেও আমি আমার কার্যক্রম ছাড়তে পারব না। আমাকে যে কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।” [২৮]

> “যদি আমার বামহাতে সূর্য ও ডানহাতে চন্দ্র এনে দেওয়া হয়, তারপরও আমি এই কাজ (তাওহীদের দাওয়াহ) ছাড়তে পারব না।” [২৯]

ক্ষমতা-নারী-মর্যাদা-সম্পদ এর সবগুলো তাঁকে আবূ তালিব বেঁচে থাকতেই অফার করা হয়েছিল। মেনে নিলে তখনই জোয়ানকালে আরবের সর্দার হয়ে যেতেন তায়িফ-বদর-উহুদ-খন্দক ছাড়াই। সারাটা জীবন এত কষ্ট-বিপদ-উৎকণ্ঠা পাড়ি দিতে হতো না। মেনে নিলেই আরবের টপ-টেন সুন্দরী কুমারী ১০ জন একসাথে পেতেন স্ত্রী হিসেবে। বিধবা আম্মাজানদের পেতাম না তখন আমরা। মেনে নিলেই মক্কার সবচেয়ে ধনী বনে যেতেন এক নিমেষেই। খেয়ে-না খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে, পা-মেলা-যায়-না-এতটুকু খুপরিতে শুয়ে জীবন পার করতে হতো না। সেসময় যিনি এগুলো নেননি, তাঁর মিথ্যা বলার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। মানবযুক্তি মানে না, সুস্থ মগজ সায় দেয় না। সুতরাং তাঁর কোনো কথাই মিথ্যে হতে পারে না। আরোহ বা অবরোহ—কোনোভাবেই না।

দার্শনিক David Hume তাঁর *On Miracles* প্রবন্ধে অতিপ্রাকৃত ঘটনার ব্যাপারে কারও বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে বলেন:

---

[২৮] মুসনাদু আবী ইয়ালা, তাবারানি, আওসাত ও কাবীরে বিশুদ্ধ সনদে। সীরাতুন নবি, শাইখ ইবরাহীম আলি মাকতাবাতুল বায়ান।

[২৯] বাইহাকি থেকে বর্ণিত, হায়াতুস সাহাবা, ৩/৬৪ ।

> " That no testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous, than the fact, which it endeavours to establish.

কোনো সাক্ষ্য দ্বারাই অতিপ্রাকৃত ঘটনা সাব্যস্ত হয় না। যদি না, সাক্ষ্য মিথ্যা হওয়াটাই মূল ঘটনার চেয়ে বড় আশ্চর্য বিষয় হয়ে পড়ে। মূল মিরাকল যত না আশ্চর্যের, যে খবর এনেছে, তার মিথ্যে বলাটা আরও বেশি আশ্চর্যের। হিউম ব্যাখ্যা করেন: ধরুন, কেউ খবর আনল যে, সে মরা লোককে জিন্দা দেখে এসেছে। এখন আমি বিচার করব, মরা লোক বেঁচে ওঠা বেশি সম্ভব? নাকি যে লোক খবর এনেছে তার ভুল হওয়া বা মিথ্যা বলা বেশি সম্ভব? যেটা বেশি আশ্চর্যের, আমি সেটা অস্বীকার করব, কম আশ্চর্যেরটা মেনে নেবো। যদি খবরদাতার মিথ্যে বলাটা বেশি আশ্চর্যের হয়, তখন গিয়ে সে আমার বিশ্বাস বা মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে। [৩০]

হিউমের এই balancing principle on miracles অনুযায়ী চিন্তা করলে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য নবিজিকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। মক্কা থেকে জেরুসালেম ১৪৮৩ কিলো একরাতে গিয়ে ফিরে আসা আবূ বকর চোখে দেখেনি, এটা মেনে নেওয়া সোজা। কিন্তু মুহাম্মাদ নামের মানুষটাকে আবূ বকর ৫০ বছর চোখের সামনে দেখেছে, একসাথে বড় হয়েছে, একসাথে ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন করেছে। জীবনেও লেখতে-পড়তে-না-দেখা, কাব্য-কবিতা-শিখতে-না-দেখা মানুষটার মুখ থেকে হঠাৎ একদিন গড়গড় করে অলৌকিক সুন্দর অপরিচিত ছন্দের আরবি কালাম বেরিয়ে আসতে দেখেছে। ৩০০০ কিলো ভ্রমণের অদেখা গল্পের চেয়ে ৫০ বছরের **স্বচক্ষে দেখা গল্পটা অস্বীকার করাটা** আবূ বকরের কাছে বেশি আশ্চর্যের। **মুহাম্মাদ মিথ্যে বলবে, এটাই মক্কাবাসীদের** কাছে বড় মিরাকল। যারা নিজেদের চোখ-কানের **অভিজ্ঞতার সাথে ইনসাফ করতে** পেরেছে তারা হয়েছেন সাহাবি; **ঈমান না এনে তাঁদের উপায় ছিল না। নিজের আকল-বুদ্ধি-চোখ-কানের সাথে এতবড় প্রতারণা তাঁরা করতে পারেননি।** আল্লাহ তাঁদের ওপর রাজি হোন। আর যারা সম্পদ-নেতৃত্ব-আভিজাত্য-ঐতিহ্য-অহংকারের বেদীতে নিজেদের চোখের-দেখা, কানের-শোনা, বিবেক-যুক্তিকে বলি দিয়েছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। চোখকে বলি দিয়ে তারা অন্ধ সেজেছে, কানকে বলি দিয়ে ঠসা হয়েছে। *'তারা মূক-বধির-অন্ধ, তারা ফিরবে না'*।

সুতরাং, ঈমানের শুরুটা যুক্তিতে। মানবযুক্তির যেখানে শেষ, বস্তুগত সকল ব্যাখ্যা-অভিজ্ঞতা যেখানে পরাস্ত, সেখানে ঈমানের শুরু। সাহাবিদের যুক্তি, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরাস্ত হয়েছে নবিজির সত্যতা এবং কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে। সাহাবাগণ

---

[৩০] David Hume, *An Inquiry Concerning Human Understanding*, Section X: *OF MIRACLES*, Para 91

কেউ-ই আন্দাগোন্দা ঈমান আনেননি। হিসেব মেলাতে না পেরে ঈমান এনেছেন। এক আরবি নামের নাস্তিক একবার বলেছিল: আমাকে তোমরা মুরতাদ কেন বলো? আমি মুসলিম পরিবারে জন্মই নিয়েছি, যা আমার ইচ্ছাধীন ছিল না। আমি স্বেচ্ছায় তো আর ঈমান আনিনি যে, এখন আমি ঈমান থেকে বেরিয়ে গেছি। আমি তো ঈমানদার ছিলামই না কখনও। ঠিক তাই ঘটেছে আমাদের বেলায়ও। এক জীবন পেরিয়ে যায়, ঈমানের অনুভূতি ছাড়াই মুসলিম রয়ে গেলাম। সীরাত বুঝে পড়ি না বলে নবিজির সত্যতার অকাট্যতা বুঝি না। আর আরবি জানি না বলে কুরআনের অলৌকিকতাও বুঝি না। এজন্যই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: *'আরবি ভাষা জানা ইসলামের প্রতীক ও আমাদের দ্বীনের অংশ।'* [৩১]

গায়েবের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস

এখন একটা প্রশ্ন আছে। কিন্তু ঈমানের বিষয়গুলো তো আমরা না দেখেই বিশ্বাস করি—আল্লাহ, কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম। কেবল আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যে বিশ্বাসের বিষয়গুলো (গায়েব) নিপাট চোখ বুজে নবিজির দেওয়া খবরের ওপর নির্ভর করে বিশ্বাসের জিনিস। কেননা এখানে জ্ঞানতত্ত্ব একমাত্র 'ওহি'। মৃত্যুর পর কী ঘটবে, তা জানার উৎস একমাত্র নবিজির দেওয়া খবর। এখানে পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আল্লাহর বিষয়টা ভিন্ন।

আল্লাহর ওপর ঈমান আনাকেও আল্লাহ যুক্তিবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গত পর্যবেক্ষণের সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত করেছেন। বার বার নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছেন পর্যবেক্ষণের ভেতরে। বলছেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির ভেতর আমার চিহ্ন রয়েছে, দিবারাত্রির পরিবর্তনে আমার আয়াত (নিদর্শন) রয়েছে।[৩২] জীবজগতের ভেতর, তোমার নিজ শরীরের ভেতর[৩৩], দিগন্তে উদয়াস্তের ভেতর, পানিবণ্টনের ভেতর আমার নিদর্শন, আমার চিহ্ন রয়েছে। *'তোমরা কি দেখো না?' 'তোমরা কি ভাবো না?' 'এগুলো চিন্তাশীলদের জন্য, যারা ভাবে', 'তোমাদের কি আকল নেই?'*

আর নবিজির সত্যতা বোঝার অনীহার ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলা আকল-যুক্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন—তাদের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে তাদেরই ভাষায় একজন নিরক্ষর নবি পাঠিয়েছি। যে তাদেরই মাঝে জন্ম নিয়েছে, ৪০টা বছর তাদেরই সাথে ওঠা-বসা করেছে, ৪০টা বছর তারা তার মুখ থেকে একটাও মিথ্যে শোনেনি, তারাই

[৩১] ইবনু তাইমিয়্যা, ইক্বতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম, ২/২০৭।

[৩২] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৯১-১৯২।

[৩৩] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২০-২১।

তার নাম দিয়েছে আল-আমীন, তাদেরই ভাষায় পাঠালাম যাতে তারা ভাষাশৈলীর মু'জিযা বুঝে হয়রান হয়ে যায়, তাদের বড় বড় কবিরা স্বীকারও করেছে 'এটা কোনো মানুষের কথা না'। আর তারাই এখন তাকে মিথ্যেবাদী বলছে, স্রেফ স্বার্থে আঘাত লেগেছে বলে। আরবদের যুক্তিকে-বোধকে আল্লাহ ভর্ৎসনা করলেন। আল্লাহ নিজের আর রাসূলের সত্যতা উপলব্ধির ব্যাপারে মানুষের চিন্তাশক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ফিতরাতগতভাবেই অনেক মানুষ এই দুই বিষয়ে ঈমান আনতে পারে, যদি ফিতরাত দূষিত না হয়। আর তাওহীদ ও রিসালাতে এই আস্থা এসে গেলে গায়েবের বিষয়ে (মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলী) বিশ্বাস আপনাতেই এসে যায়।

বিধিবিধানের ওপর বিশ্বাস

তাহলে এ পর্যায়ে এসে ঈমানের বিষয়বস্তুর ওপর ঈমান পূর্ণতা পেয়ে গেল। এবার বিধিবিধানের ক্ষেত্রটা। আনীত বিধিবিধান আমরা সব মেনে নিই আল্লাহর হুকুম বলে। না মানার কারণ সব খণ্ডন হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু এখানেও যুক্তি ও অভিজ্ঞতার স্থান আছে। আল্লাহ-রাসূলের টেক্সট ধরে নতুন বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মূল্য রয়েছে। শুধু তাই না, কোনো বিধানের ভেতর আল্লাহর হিকমাহ (প্রজ্ঞা) বোঝার ক্ষেত্রে যুক্তি-পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয়, যা ঈমানের ওপর আরও ঈমান বৃদ্ধি করে। আল্লাহর একেকটা বিধানের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা অনুধাবন আমাদেরকে আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান, ভবিষ্যতের প্রজ্ঞার ব্যাপারে আরও দৃঢ়বিশ্বাস (ইয়াকীন) প্রদান করে। যেমনটি পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) চেয়েছিলেন আল্লাহর কাছে। তিনি আল্লাহকে প্রশ্ন করলেন—

— রব্বী, মৃত্যুর পর দেহ তো বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। পোকা মাকড়ের পেটে যাবে। পানি-মাটি-বাতাসে মিশে কোথায় কোথায় চলে যাবে। সেগুলোকে আবার তুমি একত্রিত করে পুনর্জীবন দেবে। পুনর্জীবনে তো আমি বিশ্বাস করিই, কিন্তু কীভাবে তুমি সব একখানে আবার গুছিয়ে পুনর্জীবন দেবে সেই 'প্রক্রিয়া'টা দেখতে সাধ হয়। দেখাবে?

— বন্ধু, তবে কি তুমি আমার খবরে বিশ্বাস করো না।

— না না মালিক, বিশ্বাস তো আলবৎ করি। কিন্তু কেমন করে তুমি করবে সেইটা দেখতে চাইছি। আর স্বচক্ষে দেখার সাথে তুমি অন্তরের যে তৃপ্তি রেখেছ, সেটা চাইছি, মালিক। বেয়াদবি নিও না।[৩৪]

এরপর আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যেটা করলেন, সেটাকে

[৩৪] সূরা বাকারার ২৬০ নং আয়াতের তাফসীর, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (ইফা)।

এক্সপেরিমেন্ট বললে কি ভুল হবে? ৪ প্রজাতির ৪ টি পাখি নিলেন। তাদেরকে পোষ মানালেন। এতটাই ন্যাওটা করে তুললেন যাতে ডাকলেই ছুটে আসে। এরপর তাদেরকে জবাই করলেন, টুকরো টুকরো করলেন, গোশত মেশালেন। সেগুলোকে ভালোভাবে মিশালেন একসাথে। এরপর সেই মিশানো গোশত পাহাড়ে পাহাড়ে রেখে আসলেন। এবার আল্লাহর আদেশমতো পাখিগুলোকে নাম ধরে ডাক দিলেন। পাখিগুলো উড়ে উড়ে নয়, বরং মাটি দিয়ে 'দৌড়ে' এল, যাতে তাদের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াটা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিতে পারেন।[৩৫]

অর্থাৎ **'ঈমান আনার পর'** চোখ-কান-অন্তর দ্বারা আল্লাহর প্রজ্ঞা বুঝে ঈমানকে আরও দৃঢ় করতে মানা নেই। তবে কেন ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম আর পর্যবেক্ষণকে আলাদা করার কথা বলি আমরা? একটা হুকুম তো আমরা মানি **'আল্লাহর হুকুম' বলেই**, বিনা প্রশ্নে। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের গবেষণা আমাদেরকে সেই হুকুমটার ব্যাপারে, আল্লাহর ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়ার ব্যাপারে, আল্লাহর সর্বজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদেরকে অন্তরের তৃপ্তি জোগায় পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মতো, তাহলে তাকে কেন আমরা পৃথক রাখতে বলি? কেন পশ্চিমা সভ্যতার সুরে সুর মিলিয়ে আমরা ইসলামকেও খ্রিষ্টবাদের পর্যায়ে নামাই?

বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে না মেলানোর কিচ্ছু নেই। ঐ কথা খ্রিষ্টবাদের জন্য তুলে রাখুন ভাই। **ঈমান আনার পর তা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানকে টানতে কোনো দোষ নেই, নেই কোনো হীনম্মন্যতা।** বিজ্ঞান আমাদের স্ট্যান্ডার্ড না, সুতরাং ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড বলারও সুযোগ নেই। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্গেল—ওহি। যা মিলবে নেবো, যা মিলবে না নেবো না। কেন বিজ্ঞানকে (পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, পশ্চিমাটা না) ধর্মের সাথে মেলাবো, মুহাম্মাদ আসাদ (রহিমাহুল্লাহ)-এর (Leopold Weis) কথায়—

> 'ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভাববাদী মতবাদের ভিত্তিযুক্ত নয়। বরং সেখানে যুক্তি ও সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের পথ সদা উন্মুক্ত। এজন্য আমরা গর্বিত এবং সংগতভাবেই গর্বিত। সুন্নাহ পালনের যে দায়িত্ব আমাদের ওপর রয়েছে, আমাদের যে কেবল সুন্নাহর তথ্যটুকুই জানবার অধিকার আছে, তাই নয়। বরং সেই সুন্নাহ আমাদেরকে শারীআ হিসেবে দেবার মৌলিক যুক্তি উপলব্ধি করবারও অধিকার রয়েছে।' [*ইসলাম এট দ্য ক্রসরোড*]

সমস্যা হলো, কিছু মানুষ প্রতিটি বিধানকে 'পশ্চিমা বিজ্ঞান'-এর কষ্টিপাথরে ঘষে। না মিললে তাদের আবার ঈমানে টান পড়ে। মিলল কি না সেটা জরুরি না, বার বার মেলানোর চেষ্টাটাই ঈমানের কমতির লক্ষণ। **বিধিবিধান তো পরের ধাপ, ১ম ধাপ ছিল নবিজির সত্যতা ও আল্লাহর অথোরিটিতে বিশ্বাস।** বার বার বিজ্ঞানে-লজিকে ঘষার

[৩৫] প্রাগুক্ত

মানে শুরুর জানাটাই ঠিক নেই। ভিত্তিই নেই, ঈমানই আনা হয়নি ঠিকমতো। ভিত্তিতে একবার বিশ্বাস করে ফেলেছি, এখন বার বার প্রতিটা আহকাম নিয়ে ঘষার কিছু নেই। এ যেন প্রতিটা পিলার গাঁথার সময়, দেওয়াল গাঁথার সময় বার বার ফাউন্ডেশন খুঁড়ে চেক করে নেওয়া। জেনেই ঈমান এনেছি, এখন ঈমানের দাবি হলো 'নবিজি থেকে প্রমাণিত' সবকিছু মেনে নেওয়া। ঈমান হতে হবে ইয়াকীনি (চোখে দেখার মত দৃঢ়বিশ্বাস)। সেজন্য **ঈমানের ভিত্তির ওপর যতটুকু** empirical knowledge **বা অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণ ঈমানের সাথে জোড়া যায়।**

ইসলামের বিধানের সাথে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। আমার বাস্তব জীবনের। আব্বাজান মুহতারাম বাজার থেকে ১২টা মুরগি কিনে আনলেন ড্রেসিং করা। এদিকে আগে থেকেই তাবলীগে বিভিন্ন সমবয়সি আলিমদের সাথে ওঠা-বসা ও বেহেশতী জেওর পড়া থাকার সুবাদে জানা ছিল যে, ড্রেসিং করলে সেই গোশত হারাম হয়ে যায়। কারণ হিসেবে ওনারা যা বলেন এবং বেহেশতী জেওরে যা উল্লেখ আছে, সেটা হলো: গরম পানিতে পেটের ভেতরের নাড়ি গলে মুরগির পায়খানা বা পায়খানার রসটস মিশে যায় গোশতের সাথে। ফলে পুরো গোশতটা নাপাক হয়ে যায়। আরও নিশ্চিত হবার জন্য পছন্দের একজন আলিমকে ফোনও করলাম: হযরত কী করণীয়। উনিও জানালেন, এটা নাপাক হয়ে গেছে, আর খাওয়া যাবে না। অগত্যা আব্বা-আম্মাকে অনেক বুঝিয়ে বাদানুবাদ করে ১২টা মুরগি ডাস্টবিনে ফেলার ব্যবস্থা করা হলো।

বছরখানেক আগে ফেসবুকে একজন কওমি ঘরানার মুফতী সাহেবকে ফলো করতাম। তিনি একদিন স্ট্যাটাস দিলেন যে, তিনি সশরীরে বাজারে গিয়েছেন ড্রেসিং-এর প্রক্রিয়া দেখেছেন, পানির তাপমাত্রা দেখেছেন, কতক্ষণ মুরগিটা চুবিয়ে রাখে দেখেছেন। এবং তার ফতোয়া হলো: ড্রেসিং-এ পানির তাপমাত্রা এত বেশি থাকে না বা এত বেশি সময়ও রাখা হয় না, যাতে ভেতরে সবকিছু গোশতের সাথে মিশে যাবে। সুতরাং ড্রেসিং-এর দ্বারা গোশত নাপাক হবার যে কারণ দেখানো হয়, বাস্তবে তা হয় না। অতএব ড্রেসিং-এর গোশত খাওয়া যাবে।

এই ঘটনাটা বলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি: **ইসলামি ইলমেও** empirical knowledge **বা 'পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ জ্ঞান'-এর মূল্য রয়েছে। এই জ্ঞানও ইলমেরই অংশ; ইলম চর্চা ও ইলম প্রয়োগে এর বিকল্প নেই।** জাদীদ (নতুন ও

আধুনিক) সমস্যাগুলোতে ইলমকে প্রয়োগ করতে 'পর্যবেক্ষণ', 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' শারঈ ইলমেরই অংশ।

আরেকটা উদাহরণ দিই। ইসলামি বিচার-ব্যবস্থা কেমন হয়, এটা আমাদের চোখের সামনে নেই। ব্রিটিশ বিচার-ব্যবস্থাকে আমরা বিচার নামে চিনি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, ইসলামের কয়েকটি ভূখণ্ড আল্লাহ মুসলিমদের হাতে আবার দিয়েছেন শারীআ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। সেই ভূখণ্ডগুলোর তথ্য উম্মাহর সামনে বেশি বেশি আসা দরকার, যাতে শারীআ প্রয়োগের বাস্তব সুফল উম্মাহর সামনে থাকে। যেমন উদাহরণ হিসেবে নিকটবর্তী ভূখণ্ডটিতে বিচারিক ব্যবস্থার কথা পড়েছিলাম কোথায় যেন। সেখানে বিচারক ফুলবাবু সেজে চেয়ারে বসে থাকে না। আর পুলিশ যে রিপোর্ট দেবে সেটাই চোখ বুজে মেনে তার ওপর বিচার করেন না। বরং নিজে অকুস্থলে যান, জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অনূর্ধ্ব এক সপ্তাহের ভেতর মজলুম বিচার পেয়ে যায়। শুনানির জন্য ডেটের পর ডেট দেওয়া লাগে না। এটা হলো বিচারকের empirical knowledge.

কুরআনের বিভিন্ন তাফসীরে বিশেষ বিশেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'অভিজ্ঞ হেকিমরা বলেন...' এভাবে চিকিৎসকদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধিকেন্দ্রিক হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ) তৎকালীন চিকিৎসকদের মতামতও উল্লেখ করেছেন। আমজনতার মাসআলার কিতাব 'বেহেশতী জেওর'-এও হেকিম-ডাক্তারদের মতামত জায়গায় জায়গায় উল্লেখ আছে। তার মানে কুরআনের ব্যাখ্যায়, হাদীসের ব্যাখ্যায়, ফিকহের আলাপে 'মূলসূত্র' তো কুরআন-হাদীস-আছার। কিন্তু সহকারী বা সম্পূরক হিসেবে ওহির সাথে 'সংগতিপূর্ণ' empirical knowledge বা পেশাদারদের 'অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ প্রসূত জ্ঞান' (বিজ্ঞান)-এর মূল্য শারীআ রেখেছে ও দিয়েছে। এবং আমার বক্তব্য হলো, **'ওহির সাথে সংগতিপূর্ণ বিজ্ঞান' ইলমে-দ্বীনেরই অংশ।** সেটা **'ওহিকে যাচাই করার জন্য নয়, ওহিকে বোঝার জন্য'।**

ঠিক এই সাইকোলজির কারণেই মধ্যযুগে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান ফ্লারিশ করেছিল। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে বোঝাতেও 'ইলম'-শব্দটিই ব্যবহার করতেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান আলাদা করা হয়নি শুরুতে। ইমাম শাফিয়ি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ فِقْهِ الْأَدْيَانِ، وَعِلْمُ طِبِّ الْأَبْدَانِ"

'ইলম দুই প্রকার: দ্বীনি ফিকহের ইলম, দেহের চিকিৎসার ইলম।'[৩৬]

'ইলম' আলাদা করার প্রয়োজন পড়ল তখন, যখন দর্শন দিয়ে ওহিকে যাচাই করে ওহির বিরোধিতা শুরু হলো—আল্লাহর সিফাত অস্বীকার, তাকদীর অস্বীকার। তখন

[৩৬] বাইহাকি, মানাকিবুশ শাফিয়ি, ২/১১৪।

মানবিক জ্ঞান থেকে ওহির জ্ঞান ও পৃথক মর্যাদা পাবলিককে বোঝাতে 'ইলমুদ্দীন'-এর পুনরুজ্জীবনের দরকার হলো। ইমাম গাযালি (রহিমাহুল্লাহ) লিখলেন 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন'। এর আগে যতদিন 'পর্যবেক্ষণ প্রসূত জ্ঞান' (বিজ্ঞান) শারীআর অধীনে চলেছে, তা ছিল ইলমেরই অংশ এবং ইবাদাত। নিঃসন্দেহে 'ফারায়েজ শাস্ত্র' (উত্তরাধিকার বণ্টন) সহজীকরণের জন্য যে 'বীজগণিত' তা ইবাদাত-ই। জমি মেপে শারঈ খারাজ নির্ধারণের জন্য যে 'পরিমিতি-জ্যামিতি' তা ইলমেরই অংশ। 'সকল রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে'-হাদীস শুনে তা বের করার যে গবেষণা, মানুষের কষ্ট দূর করার যে প্রচেষ্টা—তা ইলম না হবার কোনো কারণ নেই। কিবলা ঠিক করার উদ্দেশ্যে যে 'গোলীয় ত্রিকোণমিতি' তা তো দ্বীনেরই অংশ। **ওহির তাবি' (অধীনে) যে বিজ্ঞান, তাও দ্বীনি ইলম। ফিকহে এরও মূল্য দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম আলাদা রাখতে হবে, মেলানো যাবে না– এই বকওয়াস ইসলামের জন্য না।**

পার্থক্য

মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞান আর আধুনিক পশ্চিমা বিজ্ঞান কি একই? নাকি কোনো পার্থক্য আছে? জি আছে। 'মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞান' আর 'আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান' এক জিনিস না। আরেকটু ভেঙে বলি, মুসলিম সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞান আর এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান, মুসলিম পদার্থবিদ্যা আর এখনকার ফিজিক্স, মুসলিম যুগের রসায়ন আর এখনকার রসায়ন—এক জিনিস না। কেন না?

কেবলই যা বলছিলাম, মুসলিমদের বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রই ছিল কুরআন-হাদীস-শারীআ:-

- খাওয়ারিজমির হাতে 'বীজগণিত'-এর উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল আমাদের শারীআতের ইলমুল ফারায়েজ বা উত্তরাধিকার বণ্টনের সমাধান (Gandz, 1938)। তিনি গ্রন্থের ভূমিকার শেষে লেখেন:

> “ আমার নিয়তের শুদ্ধতার ওপর ভরসা করি, আর আশা রাখি যে, এই কিতাব থেকে উপকৃতরা দুআ করবেন আমার জন্য যেন আল্লাহর দয়ার কল্যাণের ভাগী হই। এই কাজটিতে এবং সকল কাজে আমার আত্মবিশ্বাস তো আল্লাহর কারণেই এবং তাঁরই ওপর আমার সকল ভরসা। [৩৭]

- **ইসলামি সভ্যতায় ব্যাপক জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, গোলীয় জ্যামিতি ও গোলীয় ত্রিকোণমিতি চর্চার মূল শুরুর উদ্দেশ্য ছিল:- পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে কিবলা**

---

[৩৭] The Algebra of Mohammed Ben Musa, translated by Frederic Rosen, Oriental Translation Fund 1831

ঠিক করা, যেকোনো স্থানে সালাতের সময় নির্ধারণ এবং ইসলামি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন। যেহেতু সে সময় নতুন নতুন এলাকা ইসলামি সভ্যতার অধীনে আসছিল (Gingerich, 1936)। সালাতের সময় বের করতে গিয়ে মুসলিমরা এই শাস্ত্র আবিষ্কার করেন।[৩৮] আসরের সালাতের সময় বের করা অন্য গুলোর তুলনায় কঠিন ছিল। তো এই সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলিমরা নতুন নতুন প্যারামিটার আবিষ্কার করে: সৌর অয়নবৃত্তের বাঁক বা inclination of the ecliptic, অপভূ এর গতি, অয়নচলন এর হার, সূর্যের কেন্দ্রীয় দূরত্ব, নতুন সৌর সমীকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। মুসলিমরা শুধুমাত্র আসরের নামাযের সময় বের করতে গিয়ে এত কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। [৩৯]

- *'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি'*[৪০]—এই হাদীস থেকে মুসলিম চিকিৎসকরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন গবেষণায়, বিভিন্ন সভ্যতার চিকিৎসাবিদ্যা অনুবাদ ও বিশ্লেষণে। ইবনু নাফিস এই হাদীস দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে 'মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া' আবিষ্কার করেন ১২৪২ সালে, যেটার ক্রেডিট এখন নেন উইলিয়াম হার্ভে। এবং এর দ্বারা তিনি 'কিয়ামাত' বা আমাদের মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের ব্যাখ্যা দেন। 'মদকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার অনুচিত'—তাঁর এই গবেষণাও ইসলামি বিধানকে সামনে নিয়ে করেন।[৪১]

- ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর *'মাতালিব'* কিতাবে ইসলামের কসমোলজি (মহাকাশবিজ্ঞান) আলোচনা করেন। **এরিস্টটলের পৃথিবী-কেন্দ্রিক মডেলের সমালোচনা করেন**। এবং *'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন'* আয়াতের ওপর ভিত্তি করে 'মাল্টিভার্স'-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে কল্পনা করেছেন।

- আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জনক, ইতিহাস-দর্শনের জনক আল্লামা ইবনু খালদূন (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব *'আল-মুকাদ্দিমা'র* প্রত্যেক অধ্যায়ে সমাজবিদ্যার এককেকটা নীতি আলোচনা করেছেন। আর প্রতিটি অধ্যায় শেষ করেছেন এভাবে—

> 'আল্লাহই ভালো জানেন।'

> 'দিবারাত্রির পরিবর্তন আল্লাহই ঘটান।'

> 'এটাই আল্লাহর সুন্নাহ (রীতি), যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন'- এভাবে।

---

[৩৮] The New Cambridge History of Islam. vol: 4, p: 594

[৩৯] George Saliba in Sabreen Syed, "How the Muslim Prayer Led to Modern Astronomy" online video, kn-ow.com.

[40] মুসলমি, ২২০৪।

[৪১] Fancy, Nahyan A. G. (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafis (d. 1288)"

- কুরআনের আয়াতগুলো আমাদের বার বার উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর সৃষ্টিকে জানার জন্য।

> "বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।"[৪২]

> "নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।"[৪৩]

> "আমি আমার নিদর্শন দেখাবো দূর দিগন্তে এবং তোমাদের নিজেদের ভেতর..." [৪৪]

এজন্যই ইমাম গাযালি (রহিমাহুল্লাহ) শব ব্যবচ্ছেদ-এর অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা যায় (Savage-Smith, 1995)। যার ফলে তৈরি হয়েছেন আল-জাহরাভী, আলি ইবনু আব্বাসের মতো সার্জন। দৃষ্টিবিজ্ঞানে ইবনু হাইসামীর মতো বিজ্ঞানী। একাধিক অমুসলিম গবেষক গবেষণা করতে করতে আল্লাহর নিদর্শন অনুধাবন করে মুসলিমও হয়ে গেছেন।

* আলি ইবনু রব্বান (Meyerhof, 1931) ৯ম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের একজন। ইমাম রাযি (Rhazes)-এর শিক্ষক তিনি। *'ফিরদাউস আল-হিকমাহ'* নামে ৩৬০ অধ্যায়ের চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনা করেন। নেস্টরিয়ান খ্রিষ্টান এই বিজ্ঞানী ৭০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন:

> 'খ্রিষ্টান থাকা অবস্থায় আমার এক জ্ঞানী চাচা বলতেন—বাগ্মীতা নুবুওয়াতের চিহ্ন হতে পারে না, এটা তো যে কারোরই থাকতে পারে। কিন্তু যখন আমি অন্ধ অনুকরণ, পুরনো অভ্যেস, প্রথা ও গেড়ে থাকা শিক্ষা ঝেড়ে ফেলে কুরআনের অর্থে মনোনিবেশ করলাম; দেখলাম একে মুসলিমরা সত্য গ্রন্থ বলে দাবি করে। আসল কথা হলো, আমি আরব-পারসিক-ভারতীয়-গ্রীকদের রচিত এমন কোনো বই দেখিনি যাতে একইসাথে দুনিয়ার আদ্যোপান্ত, স্রষ্টাবন্দনা, নবির অনুসরণ, সৎকাজে আদেশ-অসৎ কাজে নিষেধ, জান্নাত-জাহান্নামের কথা, কর্মের নিত্যতা সবকিছু রয়েছে। তাই যখন কেউ এমন মিষ্টি শ্রদ্ধা জাগানিয়া কামিয়াব গ্রন্থ এনে বলবে যে এর প্রচারক একজন নিরক্ষর ব্যক্তি যার লেখালেখি ও উপমা-অলংকারের প্রশিক্ষণ নেই; নিঃসন্দেহে সেই বই নুবুওয়াতের চিহ্ন।'[৪৫]

* ইয়াকূত হামাবি-এর *'মু'জামুল বুলদান'* ভূবিদ্যার এক বিখ্যাত বই, যার আবেদন আজও অটুট। তার বাবা-মা গ্রীক খ্রিষ্টান। তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ

---

[৪২] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২০।

[৪৩] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯০।

[৪৪] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২০-২১।

[৪৫] Abdul Aleem, I'jaz ul Qur'an, Islamic Culture, Op. Cit., pp. 222-223.

করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেন, এই কাজ করতে তিনি কুরআন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।[৪৬]

- মোটকথা সব কিছু, এমনকি দর্শনচর্চাও ছিল ইসলামকেন্দ্রিক। একদল এরিস্টটলীয় দর্শন দিয়ে স্রষ্টাকে চিনতে চাচ্ছিলেন (মু'তাযিলা)। আরেকদল এরিস্টটলীয় দর্শনকে রদ করছিলেন (ইলমুল কালাম)।

এবং এসকল বিজ্ঞানীরাও ফরজিয়াত বা ফরজ পরিমাণ 'শারীআর ইলম' প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই অর্জন করতেন, অনেকে আলিম হিসেবেও উঁচু মানের ছিলেন। আল্লামা ইবনু খালদূন, ইমাম রাযি, ইমাম ইবনু রুশদ, ইমাম গাযালি, আল-বিরুনী প্রমুখ আলিম-ফকীহ হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবনু নাফিস মাসরুরিয়্যা মাদরাসায় ফিকহ পড়াতেন। কেউ কেউ শারীআ আদালতের প্রধান কাযীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। দ্বীনি জরুরি ইলমের সাথে এইসকল প্রযুক্তিগত সাহায্যকারী জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন ও গবেষণায় এগিয়ে গিয়েছেন। যা তাদের ঈমান প্রতিনিয়ত আরও বৃদ্ধি-ই করেছে।

জ্ঞানী মহলে এ কথা অবিসংবাদিত যে, মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার কারণই ছিল ইসলাম।[৪৭] রিচার্ড ডকিন্স এর বন্ধু নাস্তিক বিজ্ঞানী জিম খালিলী অস্বীকার করতে পারেননি: *ইসলামই ছিল তৎকালীন বিজ্ঞানের উচ্চতায় পৌঁছার মূল কারণ।*[৪৮] ইয়াহূদি প্রাচ্যবিদ Hartwig Hirschfeld-এর একটি উক্তিই এ ব্যাপারে যথেষ্ট:

> "
> 'আল-কুরআনকে যে জ্ঞানধারার উৎসমুখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এটা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আকাশ-পৃথিবী থেকে শুরু করে মানবজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। ফলে এই পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে রচিত হয়েছে বিষয়ভিত্তিক অগণিত প্রবন্ধ-রচনা। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা, এবং পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানের নানা শাখার বিস্ময়কর অগ্রগতির জন্য আল-কুরআনই দায়ী। ...একইভাবে কুরআন চিকিৎসাবিদ্যার জন্যও একটা উদ্দীপনা যুগিয়েছিল, সামগ্রিকভাবে উৎসাহ দিয়েছিল প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণকে।'[৪৯]

---

[৪৬] Muzaffar Iqbal, p: 39

[৪৭] D.E. Smith and L.C. Karpinski, The Hindu-Arabic Numerals (Ginn and Company Publishers, 1911)

[৪৮] Jim al-Khalili, "The House of Wisdom and the legacy of Arabic Science" online video, YouTube ; J. al-Khalili, Pathfinders.

[৪৯] Hartwig Hirschfeld (1902), New researches into the composition and exegesis of the Qoran, Royal Asiatic Society, p.9

ফলে কী হলো?

বিজ্ঞানের জন্ম: ইলমুত তাজরিবা

ইসলাম আসার আগে দুনিয়ায় জ্ঞান বলতে ছিল ইয়াহূদি আইন, খ্রিষ্ট মরমীবাদ আর গ্রীক যুক্তিচর্চা। ইসলাম এনে দিল নতুন জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology): 'ইন্দ্রিয় দ্বারা নিবিড় পর্যবেক্ষণ'। কুরআন বার বার 'أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ' (তোমরা কি দেখো না?) বলে বলে খুলে দিল চোখ।

ইসলামি ভূমিকর (খারাজ) আরোপের জন্য ৬৪০ সালে[৫০] উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'ভূমি জরিপ' করেন। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ গুণ করে জমি মাপা হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল জারিব (جَرِبٌ), বাংলা করলে জরিপ। আরবি جَرَّبَ অর্থ: কিছু যাচাই করা (check out something), পরীক্ষা করা (examine), পরখ করা (put to test), নমুনা নিয়ে দেখা (examine by taking a sample), পরীক্ষা সাজানো (make an experiment)[৫১]।

খাওয়ারিজমীর *'আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা'* রচনার পর থেকে (৮২০ সাল) গাণিতিকভাবে নির্ণীত জ্ঞানকে বলা হতো 'ইলমুত তাজরিবিয়্যাহ' (عِلْمُ التَّجْرِبِيَّةِ) বা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। **বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞান (ধর্ম) ও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান (দর্শন) থেকে পৃথক করতে এই 'সম্পূর্ণ বস্তুগত তথ্যভিত্তিক' জ্ঞানের নাম দেওয়া হয় তাজরিবিয়্যাহ।** মুসলিমদের বিজ্ঞানচর্চায় এই তাজরিবা (পরীক্ষার দ্বারা গাণিতিক তথ্য আহরণ) হয়ে ওঠে উদ্ভাবনপদ্ধতি। যদিও ইউরোপ 'তাজরিবা'র অনুবাদ করেছে *empeiria* অর্থে (experience)। আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখে নিই, আসলে কাহিনি কী?

---

[৫০] ঐতিহাসিক theophanes এর মতে। The Spread of Islam Throughout the World, edited by Idris El Hareir, Ravane Mbay, p.204

[৫১] www.almaany.com

উদাহরণ ১

আধুনিক রসায়নের জনক জাবির ইবনু হাইয়্যান (মৃ. ৮১৫ খ্রি.) তাঁর ছাত্রদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন[৫২]:

وَ أَوَّلُ وَاجِبٍ أَنْ تَعْمَلَ وَتُجْرِيَ تَجَارُبَ ،لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْمَلُ وَيُجْرِي التَّجَارُبَ لَا يَصِلُ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْإِتْقَانِ. فَعَلَيْكَ بِالتَّجْرِبَةِ لِتَصِلَ إِلَى الْمَعْرِفَةِ.

> 'রসায়নবিদের সবচেয়ে প্রথম কর্তব্য হাতেকলমে কাজ করা ও তাজরিবা (run experiment) চালানো। তা না হলে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। অতএব তুমি 'তাজরিবা' (পরীক্ষামূলক গবেষণা) চালাবে।'

ثُمَّ تَقْصُدُ لِتُجَرِّبَ فَيَكُوْنَ بِالتَّجْرِبَةِ كَمَالُ الْعِلْمِ

> '(জ্ঞান আহরণের পর) তুমি তাজরিবা করবে (experimentation), তাহলে তাজরিবা ইলম-কে পরিপূর্ণ করবে।'

'তাজরী তাজরিবা'- মানে run experiment. 'অভিজ্ঞতা চালানো' এটা কোনো কথা হয় না। আর জাবির ইবনু হাইয়্যান distillation, sublimation, crystallization, calcination, evaporation-সহ বহু এক্সপেরিমেন্ট পদ্ধতি যে নিজে আবিষ্কার করেছেন, এটা তো অজানা নয়। ফলে তিনি যে এক্সপেরিমেন্টের কথাই বলবেন, শুধু দেখে অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বলছেন না—এটা সহজেই প্রতীয়মান।

উদাহরণ ২

একটু উদাহরণ না দিলে হয় না। ইবনু সিনা-র (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) *'কিতাবুশ শিফা'* গ্রন্থে একটি অধ্যায় *'আল-বুরহান'* (on demonstration) থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। (McGinnis, 2003)

এরিস্টটলের সময় থেকে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি ছিল Induction বা আরোহ পদ্ধতি (إِسْتِقْرَاء)। একটা বিশেষ বিষয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে সার্বজনীন জ্ঞান তৈরি। এভাবেই হাইপোথিসিস তৈরি করা হয়। যেমন ধরেন:

---

[৫২] Hella Martyr, Aesthetic awareness between the two philosophies of science and pragmatism (الوعي الجمالي بين فلسفتي العلم والبرجماتية)

Dr. Ahmed Fouad Pasha, Islamic visions in the philosophy of science and civilization development (رؤي اسلامية في فلسفة العلم والتنمية الحضارية)

অনুসিদ্ধান্ত ১ (premise)	জন্তুর ৪ পা থাকে। Major term
অনুসিদ্ধান্ত ২	সব কুকুর-ই জন্তু minor term middle term
সিদ্ধান্ত (conclusion)	সব কুকুরেরই ৪ পা আছে Subject predicate

'জন্তু-ত্ব' টা অনুসিদ্ধান্ত ১ ও ২-এর মাঝে কমন বা middle term. ১ ও ২ সত্য হলে ৩-ও সত্য। ইবনু সিনা বললেন: এরিস্টটলীয়ান ইন্ডাকশন পদ্ধতি ঠিক আছে, কিন্তু ১ ও ২ এর মাঝে যদি কোনো মিডল টার্ম না থাকে, তাহলে ৩ বের করব কীভাবে। সেক্ষেত্রে 'সিদ্ধান্ত'-এর সাবজেক্ট ও প্রেডিকেটের মধ্যে সম্পর্ক হয়...
(১) আপনাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে হবে। নইলে,
(২) দুটোর মাঝে সম্পর্কটা ব্রেন দিয়ে উপলব্ধি করতে হচ্ছে।

যদি ব্রেন দিয়ে বোঝেন, তাহলে সাবজেক্ট-প্রেডিকেটের সম্পর্কটা...
(২ক) নিশ্চিত ওতপ্রোত সম্পর্কও হতে পারে, আবার
(২খ) সাময়িক কাকতালীয়ও হতে পারে।
তাহলে কীভাবে আমরা একটা বৈজ্ঞানিক প্রথম সূত্র নির্ধারণ করব?

ইবনু সিনা বললেন: এখানে তাজরিবা (experiment) করা হবে। যদিও ল্যাটিন অনুবাদগুলোতে 'তাজরিবা'র অর্থ নিয়েছে গ্রীক empeiria-র অর্থে (experience/ অভিজ্ঞতা)। প্রোফেসর McGinnis টীকায় বলেন: করতে করতে 'হয়ে যাওয়া' অভিজ্ঞতা (knack) অর্থে 'তাজরিবা' ব্যবহার করেননি ইবনু সিনা। বরং কিছুটা টেকনিক্যাল অর্থে, 'যত্নের সাথে আগের-পরের নোট নিয়ে নিবিড় ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ'-কে তাজরিবা বলেছেন।

ইবনু সিনা-র 'তাজরিবা' কনসেপ্টের বৈশিষ্ট্য:-

➡ Scientific establishment- এর জন্য কেবল এরিস্টটলীয় ইন্ডাকশন যথেষ্ট নয়।
➡ যুক্তি-সজ্জার (syllogism) সাথে তাজরিবা যুক্ত হলে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হবে।
➡ তাজরিবা কেবল একটা জিনিস বার বার দেখারই নাম না।
➡ তাজরিবা-র সময় বিজ্ঞানী অবশ্যই বিভিন্ন variables-গুলো (পরিবর্তনশীল ফ্যাক্টর) আগে-পরে খেয়াল করবেন।
➡ তাজরিবা-র দ্বারা 'সার্বজনীন পরম যৌক্তিক' (universal-absolute-syllogistic) জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। 'সার্বজনীন শর্তাধীন' জ্ঞান পাওয়া যাবে। বার বার তাজরিবার

দ্বারা যা পাওয়া যাচ্ছে, তা আসলেই বাধাহীনভাবে প্রকৃতিগত কি না, সেটা দেখতে হবে।

উদাহরণ ৩

এবার আমরা একটু দেখব ইবনু হাইসাম (মৃ. ১০৪০ খ্রি.) কী বলেছিলেন।

১.আমাদেরকে আমাদের প্রস্তাবনাকে পুনরুৎপাদন/ পুনঃপ্রমাণ করব (recommencement)। কীভাবে? মানে যেই ভিত্তিগুলো সাব্যস্ত করছি, সেগুলোকে আগে নিবিড় পর্যবেক্ষণ (inspection) করব। তার খুঁটিনাটি (particulars) দেখব, দৃশ্যমান অবস্থা সার্ভে করব।

২. এবার ইন্দ্রিয়গতভাবে (found in the manner of sensation) যা স্পষ্ট, সন্দেহবিহীন, অপরিবর্তনশীল পাওয়া গেল, তার ভিত্তিতে প্রস্তাবনা (premise) সাজাবো।

৩. এইবার প্রতিটি প্রস্তাবনাকে সমালোচনা করে করে (gradually and orderly criticizing premisses) 'আরোহ' পদ্ধতিতে (ascend in our inquiry and reasonings) সিদ্ধান্তে পৌঁছব।

৪. আমাদের লক্ষ্য হলো: যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার আওতায় আনব, তাতে কোনো ব্যক্তিগত মত বা পূর্বধারণার অনুসরণ করব না। বরং ইনসাফের সাথে সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা করব।

৫. এভাবে আমরা হৃদয়-প্রশান্তকারী সত্যে পৌঁছব, ক্রমে ধীরে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। অবিসংবাদিত সত্য পাওয়া যাবে সমালোচনা ও সতর্ক পদক্ষেপ দ্বারা।

৬. প্রকৃতিগতভাবে আমরা মানব ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নই। আমরা কেবল সত্যে উপনীত হবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। সকল বিষয়ে দৃঢ়তা তো আসে আল্লাহর থেকেই।[৫৩]

ইবনু হাইসামের *Book of Optics*

কমেন্টারি অংশে Harvard University-র প্রোফেসর A.I Sabra এই প্যাসেজের ব্যাখ্যায় বলেনঃ (the language of the whole passage is strikingly Baconian.) **ইবনু হাইসামের (মৃ. ১০৪০ খ্রি.) এই প্যাসেজের ভাষা আশ্চর্যজনকভাবে ফ্রান্সিস বেকনের (মৃ. ১৬২৬ খ্রি.) ইন্ডাকশন থিওরির মতো। ওয়াহ! বাপ-টা দেখতে একদম ছেলের মত হয়েছে। কী চমৎকার!**

ইবনু হাইসাম আরেকটা পরিভাষা এনেছেন—ই'তিবার (اِعْتِبَارٌ)। পরস্পর তুলনা

[৫৩] Ibn al-Haytham, Abu Ali Al-Hasan. Optics. p. 5.

ও পরিমাপ করা অর্থে। এক অংশের সাথে আরেক অংশের তুলনা। তিনি إسْتِقْرَاء অর্থ করেছেন দেখে নেওয়া, تَجْرِبَةٌ অর্থ করেছেন নিবিড় পর্যবেক্ষণ, আর إعْتَبَرَ অর্থ করেছেন—নিজের পদ্ধতিটা আগের সিদ্ধান্তের সাথে তুলনা ও মাপজোখ। এর উদ্দেশ্য 'নিশ্চিত জ্ঞানে পৌঁছানো'।

জ্ঞানের এই শ্রেণিকরণ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে দার্শনিকরা বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন:

- কিন্দি লেখেন *'কিতাবুন ফী মাহিয়্যাতিল ইলমি ওয়া আকসামিহা'* (definition and classification of knowledge) *'কিতাবু আকসামি ইলমিল ইনসি'* (classification of human knowledge)
- ফারাবি লেখেন *'ইহসাউল উলূম'* (calculation and classification of knowledge)
- ইবনু সিনা লেখেন *'ফী আকসামিল উলূমিল আকলিয়্যা'* (on classification of knowledge of reason)

এই একই জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়গুলো ইবনু রুশদের 'কুল্লিয়াত', ইমাম গাযালির 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন'সহ নানান তাত্ত্বিক লেখাগুলোতেও ঘুরেফিরে আলোচিত হয়েছে। 'কুল্লিয়াত' গ্রন্থে ইবনু রুশদ বলেন: *'এই শিল্পে (চিকিৎসাবিদ্যা) 'তাজরিবা' সর্বাগ্রে দরকার।'*[৫৪]

১২শ শতকে খ্রিষ্ট-ইউরোপে অনুবাদের জোয়ার বয়ে যায়। অধিকাংশ আরবি গ্রন্থ ল্যাটিনে অনুবাদ হয়। ল্যাটিন ভাষায় 'ইলমুত তাজরিবিয়্যাহ' (عِلْمُ التَّجْرِيبِيَّة)-এর অনুবাদ হয় *scientia experimentalis* (পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান), আজ যাকে আমরা বলি তথ্য-উপাত্ত-গবেষণা-পরিসংখ্যান লব্ধ 'বিশেষ জ্ঞান'...বিজ্ঞান। এই তথ্য-উপাত্ত-গবেষণা-পরিসংখ্যান দিয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে (science) বা এই ঝোঁককে একটা সময় বলা হতো *'arabicorum studiorum sensa'* (study view of arabs), আরবদের জ্ঞান-দর্শন।[৫৫]

'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' রজার বেকনকে experimental method এর আবিষ্কর্তা বলে দুনিয়াকে চেনানো হয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্টকে থামাবেন কে?—

> 'কে experimental method-এর আবিষ্কর্তা, সেটা অন্যান্য আরব আবিষ্কারের মতোই—১ম ইউরোপীয় যে সেটার উল্লেখ করবে সে-ই সেটার আবিষ্কারক। ঠিক যেমন কম্পাস

[৫৪] Paraph. On Fevers, at Averroes. On the notion of tajriba, see McGinnis 2003 and Janssens 2004.

[৫৫] Metlitzki, D. 1977. The matter of araby in medieval england. Yale university press সূত্রে Islam in Europe, Jack Goody. P.61

Flavio Gioja–এর নামে, এলকোহল Arnold of Villeneuve –এর নামে, লেন্স ও বারুদ Schwartz কিংবা Bacon–এর নামে। এসবই ইউরোপীয় সভ্যতার উৎসের ব্যাপারে বিরাট বিরাট ভুল বার্তার অংশ। বেকনের সময়েই আরবদের experimental method সমগ্র ইউরোপে বহুল প্রচলিত ও চর্চিত হতো। এ কথারই উচ্চারণ মেলে Adelhard of Bath, Alexander of Neckam, Vincent of Beauvais, Arnold of Villeneuve, Bernard Silvestris (যিনি বই লেখেন *Experimentarius* নামে), Thomas of Cantimpre, Albertus Magnus-দের জবানে।'[৫৬]

এই 'তাজরিবা' বা নিবিড় পূর্বাপর পর্যবেক্ষণের ফলে এবং পর্যবেক্ষণ-যুক্তিকে জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দরুন ইসলামি বিশ্বে—

১. গ্রীক দর্শন আরবিতে অনূদিত হয়

২. ভারতীয় বিজ্ঞান অনূদিত হয়

৩. তাজরিবার ভিত্তিতে সেগুলো সংশোধন এবং একই সাথে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জোয়ার বয়ে যায়।

এবার মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানের বিকাশের ধারণা দেবার চেষ্টা করছি, আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায়। কেবল চিকিৎসাবিদ্যা ও গণিতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকছি এই দফা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিপথ

[৫৬] Robert Briffault (1919), The Making of Humanity, p201
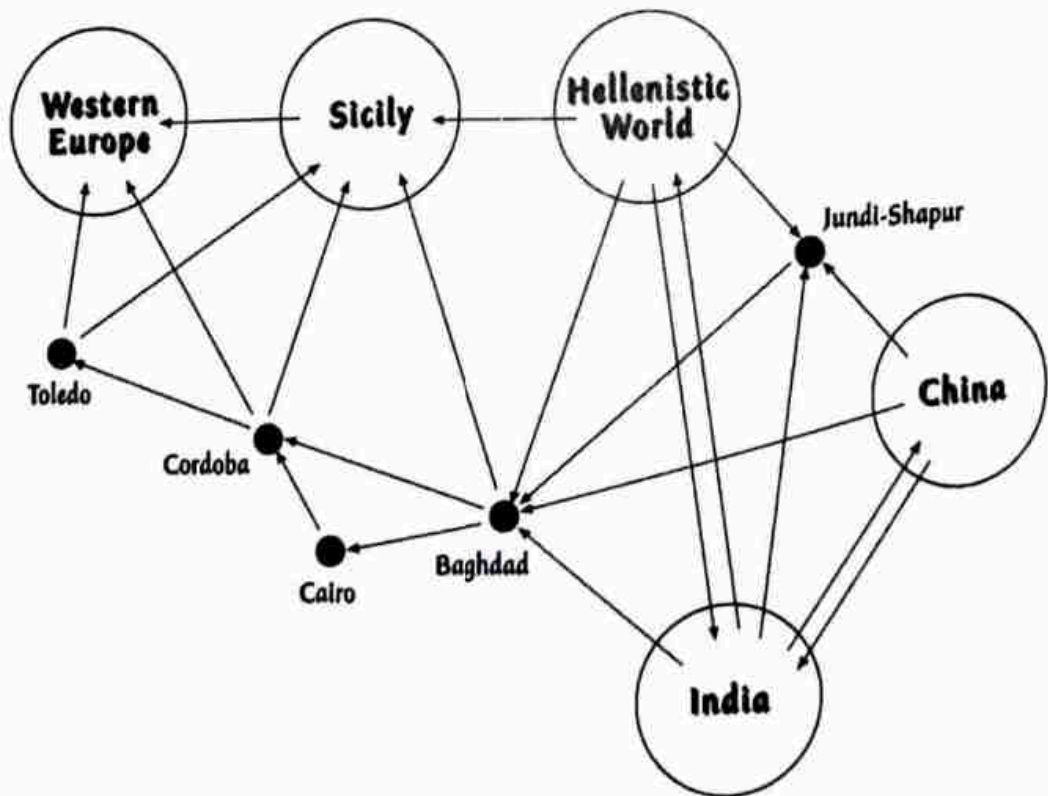
চিকিৎসা বিদ্যায় মুসলিম অবদান:

বিজ্ঞানী	কাজ	অনুবাদ
আল-কিন্দি (Alkindus/ Alhandreus) (Plinio, 2002)	তাঁর ২৭০টার ভেতর ২৭টা বই মেডিসিনের। De Gradibus বইয়ে তিনি সর্বপ্রথম ফার্মাকোলজিতে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ করেন। ওষুধের শক্তিমাত্রা (strength) হিসাব করা, রোগের প্রকোপ বেশি হবার হিসেব (most critical days) করা।	Gerard of Cremona ১২শ শতকে De Gradibus অনুবাদ করেন ল্যাটিনে। এর আরেক নাম Quia Primo. তার ২২৬ টি প্রেসক্রিপশান ও ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী সংবলিত সংকলন the medical formulary (AQRABADHIN) of al-kindi ১৯৬৬ সালে অনুবাদ করেন প্রোফেসর Martin Levy.
আম্মার আল-মসুলী [মৃ.১০০০]	▪ শ্রেষ্ঠ মৌলিক চক্ষু-সার্জন [১] ▪ hypodermic syringe আবিষ্কারের জন্য খ্যাত, যা তিনি বানান cataract সার্জারির জন্য। ▪ কিতাবুল মুন্তাখাব ফী ইলমিল আইন (selectives from ophthalmology) রচনা করেন।	Natan ha-Me'ati ১২৮০ সালে রোমে এটা হিব্রুতে অনুবাদ করে।
আলি ইবনু আব্বাস (Haly Abbas)	২০ খণ্ডে কিতাবুল মালিকি (The Complete Art of Medicine) রচনা করেন। ১৯ তম খণ্ডে সার্জারি, ২য়-৩য় খণ্ডে এনাটমি। প্রথম ১০ খণ্ডে থিওরি, পরের ১০ খণ্ডে প্র্যাকটিক্যাল।	প্রথম ৩ খণ্ড Liber pantegni নামে অনুবাদ করেন Constantinus Africanus. এই বইয়ের ওপরই Salerno শহরের বিখ্যাত মেডিকেল স্কুলের ভিত্তি [২]। পরে পুরোটা অনুবাদ করেন Stephen of Antioch. ১৪৯২ সালে ভেনিসে প্রকাশিত হয়। Regalis Dispositio নামে

---

[২] নাম ছিল Schola Medica Salernitana. সামনে বিস্তারিত।

আবূ বকর রাযি Rhazes [১] [মৃত্যু ৯২৫ খ্রি.] বাগদাদ ও রাই হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন। experimental medicine-এর প্রথম সারির একজন।	▪ Psychology ও psychotherapy-এর জনক ▪ শিশুরোগবিদ্যার (paediatrics) জনক [২], একে আলাদা একটা সাবজেক্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, আলাদা গ্রন্থ রচনা করেন। ▪ গাইনী ও প্রসূতিবিদ্যা এবং চক্ষু সার্জারির ভিত্তি স্থাপন করেন ২৩ খণ্ডে লিখিত টেক্সটবুক 'কিতাবুল হাযি'-তে। ▪ আম মানুষের জন্য 'ঘরোয়া চিকিৎসা ম্যানুয়াল' লেখেন। ▪ গুটিবসন্ত ও হাম সম্পর্কে প্রচলিত হিপোক্রিটাসের মতবাদ থেকে বেরিয়ে আসেন 'আল-জুদারি ওয়াল হাসবা' গ্রন্থে। ▪ তখনকার প্রচলিত 'গ্যালেনের হিউমারিজম' মতের কঠোর সমালোচনা করেন ▪ এছাড়া এলকোহলকে 'স্টেরিলাইযার' হিসেবে ব্যবহার, পারদ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার তাঁর উদ্ভাবন, যা আমরা আজও ব্যবহার করি। বানরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে evidence-based medicine চর্চা করা তিনি শুরু করেন। ▪ গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত control group-এর ব্যবহার প্রথম তাঁর থেকে পাওয়া যায়। [৩]	Continens Rasis নামে ১২৭৯ সালে ল্যাটিন অনুবাদ করেন সিসিলীয় ইয়াহূদি ফারায ইবনু সালিম। আরেক নাম Continens Liber. Gerard of Cremonaও একই বই অনুবাদ করেন liber divisionum নামে। সেই সাথে liber ad al-monsorem নামে সার্জারির বই 'কিতাবুল মানসুরী'-ও অনুবাদ করেন। পুরো ইউরোপ জুড়ে তাঁর বইগুলো নানান শহর থেকে নানান সংস্করণ বের হতে থাকে। শুধু গুটিবসন্তের বইটাই ১৪৯৮-১৮৬৬ এর মধ্যে ৪০ বারের বেশি অনুবাদ ও মুদ্রণ হয়।
জাবির ইবনু হাইয়্যান Geber	ইবনু নাদীমের মতে তিনি ৫০০ গ্রন্থ লিখেছেন চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর।	
আলি ইবনু রব্বান (Meyerhof, 1931)	৩৬০ অধ্যায়ের চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনা করেন গ্রীক ও ইউনানী মেডিসিন সহযোগে। 'ফিরদাউস আল-হিকমাহ' নামে।	

[১] Phipps, Claude (5 October 2015). No Wonder You Wonder!: Great Inventions and Scientific Mysteries. Springer. p. 111.

[২] Elgood, Cyril (2010). A Medical History of Persia and The Eastern Caliphate (1st ed.). London: Cambridge. pp. 202–203. [By writing a monograph on 'Diseases in Children' he may also be looked upon as the father of paediatrics.]

[৩] humorism theory হল মূলত হিপোক্রিটাসের রোগতত্ত্ব। একে গ্যালেন আরও বিস্তৃত করেন। এই মতানুসারে মানবদেহে ৪ প্রকার তরল (humor) রয়েছে। কালো পিত্ত, হলুদ পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত। এই ৪ তরলের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব হলে অসুখবিসুখ হয়। (William, 2001)

ইবনুল জাযযার [মৃ. ৯৭৯ খ্রি.] Algizar	ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ওপর 'যাদুল মুসাফির', geriatric medicine-এর ওপর 'কিতাবু তিব্বিল মাশায়িখ' লেখেন। দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য আলাদা গ্রন্থ রচনা করেন 'তিব্বুল ফুকারা ওয়াল মাসাকীন'। এছাড়া dementia, child mortality rate, sexual disorder এর ওপর তাঁর আলাদা আলাদা লেখা রয়েছে।	যাদুল মুসাফির প্রথম Viaticum নামে লাতিন অনুবাদ করেন Constantinus Africanus, মূল লেখকের নাম ছাড়া। [৬] তাঁর ২২টি বই ইউরোপ জুড়ে ১৬শ শতকে লাতিন-গ্রীক-ফ্রেঞ্চ-হিব্রুতে অনূদিত ও পুনঃপুন মুদ্রিত হতে থাকে।
ইবনু সিনা Avicenna	father of early modern medicine. [৭] ৫ খণ্ডে রচনা করেন বিখ্যাত 'আল-কানূন ফিত তিব্ব' (The Canon of Medicine), যা ১৮শ শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য হিসেবে ছিল। আজও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটিই শেষকথা।	Gerard of Cremona ১২শ শতকে ল্যাটিন অনুবাদ করেন। Natan ha-Me'ati ১৩শ শতকে এটা হিব্রুতে অনুবাদ করে।
ইবনু রুশদ [৮][মৃ. ১১৯৮ খ্রি.] Averroes	৭ খণ্ডে চিকিৎসা বিশ্বকোষ 'কুল্লিয়াত ফীত তিব্ব'(The General Principles of Medicine) তাঁর এই লাইনে শ্রেষ্ঠ অবদান। এছাড়াও আর্নেস্ট রেনানের মতে, আরও ২০টি চিকিৎসা গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। ইবনু আবী উসাইবিয়ার মতে ১৫টি। স্নায়ুর উৎপত্তি, অনুভূতি প্রক্রিয়া, নারীদের ডিম্বাণুর অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহুল প্রচলিত Galen-এর মত খণ্ডন করেন।	ইতালির পদুয়ার ইয়াহূদি Bonacosa ১২৮৫ সালে ল্যাটিনে Colliget নামে অনুবাদ করে। যা শতাব্দীকাল ইউরোপে মেডিকেল টেক্সটবুক হিসেবে সমাদৃত হয়। University of Bologna ১৪০৫ সালে বইটির ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি অংশগুলো পাঠ্য করে।

[৬] Sezgin F. Tarikh Negareshhay Arabi]. Vol. 3. Tehran, Vezarat Farhang va Ershad, 2000.এবং Max Meyerhof, LEGACY OF ISLAM, ed. Arnold and Guillaume (p.326, 346)

[৭] Colgan, Richard (2009-09-19). Advice to the Young Physician: On the Art of Medicine. Springer Science & Business Media. p. 33. ISBN 978-1-4419-1034-9. Avicenna is known as the father of early modern medicine.

[৮] Joël Chandelier(2018), Averroes on Medicine. In P. Adamson & M. Di Giovanni (Eds.), Interpreting Averroes: Critical Essays (pp. 158-176).

ইবনু নাফিস [মৃ. ১২৮৮ খ্রি.]

(West, 1985)

- ৩০০ ভল্যুমের বিশ্বকোষ লেখার পরিকল্পনা করেন 'আশ-শামাইল ফীত তিব্ব' নামে। ৮০ খণ্ড লেখার পর ইন্তিকাল করেন।
- 'শারহু তাশরীহিল কানূন' নামে ইবনু সিনা-র আল-কানূনের ব্যাখ্যা লেখেন। এই বইয়েই তিনি ১০০০ বছর ধরে চলে আসা গ্যালেন-এর তত্ত্বকে বাতিল করে রক্ত সঞ্চালনের নতুন তত্ত্ব দেন। আজ William Harvey (মৃ.১৬৫৭) কৃতিত্ব পেলেও ইবনু নাফিস সর্বপ্রথম pulmonary circulation (হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড) বর্ণনা করেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় father of circulatory physiology.
- গ্যালেনের মডেলে interventricular septum ছিদ্রযুক্ত হবার যে কথা বলা হয়েছে, তাকে ভুল প্রমাণ করেন। গ্যালেন 'অদৃশ্য ছিদ্রের' কথাও বলেন, যা তিনি কঠোরভাবে বাতিল করেন।
- তিনি বলেন: pulmonary artery ও pulmonary vein এর মধ্যে অবশ্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংযোগ থাকতে হবে, যেটা ৪০০ বছর পরে Marcello Malpighi দেখে আবিষ্কার করেন (pulmonary capillaries)।
- আগে মনে করা হতো right heart-এর রক্তই হৃৎপিণ্ডকে পুষ্টি দেয়। তিনি বলেন, না, বরং হার্টের জন্য আলাদা ধমনী আছে (coronary arteries)
- তিনি বলেন, যে শিরাটা হার্ট থেকে রক্ত ফুসফুসে আনে, সেটা অন্যান্য শিরার মতো না। তিনি একে বলেন 'artery-like vein', যেটাকে আজ আমরা pulmonary artery বলে জানি।
- ইবনু নাফিস সেসময় হাতেগোনা দু'একজন চিকিৎসকের একজন, যে মনে করে যে হার্ট নয় বরং ব্রেইন হলো সকল অনুভূতির জন্য দায়ী।
- 'আল-মুজায ফিত তিব্ব' গ্রন্থে কিডনি-স্টোন আর ব্লাডার-স্টোনের মধ্যে পার্থক্য করেন। দুটোর ইনফেকশনের মধ্যে পার্থক্য করেন। বিভিন্ন রকম inflammatory and noninflammatory renal swellings এর বর্ণনা দেন। এবং কিডনি পাথরের conservative management উল্লেখ করেন।
- সর্বপ্রথম concept of metabolism বা শারীরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কথা বলেন।

সেই অংশ যেখানে তিনি রক্ত-সংবহন ব্যাখ্যা করেন

ইবনু নাফিসের রক্তসংবহন তত্ত্ব

আবুল কাসিম জাহরাভী [মৃ.১০১৩ খ্রি.] (Albucasis) [৯]

- আধুনিক সার্জারির জনক। [১০]
- ৩০ খণ্ডের 'কিতাবুত তাসরীফ' ৫০০ বছর ধরে ইউরোপের টেক্সটবুক ছিল (illustrated surgical guide)। সার্জারির আলোচনা তিন ভাগে করেন: cauterization, operation আর fracture-dislocation.
- ২০০-এরও বেশি শল্যযন্ত্র (surgical instrument) উদ্ভাবন করেন। কিছু তো আজও ব্যবহার হয়, যেমন: 'forceps delivery' এর forceps.[১১]
    - — কানের internal examination-এঁর যন্ত্র
    - — Throat-এর ফরেন বডি রিমুভাল ইন্সট্রুমেন্ট
    - — হুক দিয়ে নাকের পলিপ অপারেশন
    - — ৫০ এর বেশি ধরনের অপারেশনে কটারাইযেশন ব্যবহার
    - — Urethra inspection-এর ইন্সট্রুমেন্ট
    - — দাঁতের পাথর, ব্লাডারের পাথর রিমুভাল
- ভেতরের সেলাইয়ে (internal stitch) প্রথম catgut ব্যবহার করেন। সেলাইয়ের জনক হিসেবে পরিচিত Ambroise Pare-এর ৫০০ বছর আগে।
- আফিম ও ক্যানাবিস দিয়ে প্রথম inhalant এনেস্থেশিয়া দেন।
- Kocher মেথডের শত শত বছর আগে একই মেথড দেন shoulder dislocation-এর জন্য। প্রসূতিবিদ্যার walcher position-ও তাঁর উদ্ভাবিত, যদিও ক্রেডিট নেন আরেকজন।
- প্রথম tonsillectomy ও tracheostomy-র বর্ণনা দেন, ectopic pregnancy-র বর্ণনা দেন।
- প্রথম thyroidectomy করেন। আগে ছাগলের ওপর, এরপর মানুষের ওপর।

Gerard of Cremona ১২শ শতকে De Chisurgia নামে অনুবাদ করেন ল্যাটিনে।

পরবর্তী ৫ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপের মেডিকেল ভার্সিটিগুলোয় ইবনু সিনা, আল-রাযির সাথে পড়ানো হত জাহরাভীকে।

ইউরোপীয় সার্জারির জনক Guy de Chauliac [মৃ.১৩৬৮] তাঁর গ্রন্থে ২০০ বারের বেশি কোট করেছেন জাহরাভী থেকে। [১২]

১২৮০ সালে Moses Ibn Tibbon অনুবাদ করেন হিব্রুতে। [১৩]

২০০ ইন্সট্রুমেন্টের মধ্যে একটি

[৯] Cosman, Madeleine Pelner; Jones, Linda Gale (2008). Handbook to Life in the Medieval World. pp. 528–530.

[১০] Krebs, Robert E. (2004). Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the Middle Ages and the Renaissance

[১১] Holmes-Walker, Anthony (2004). Life-enhancing plastics : plastics and other materials in medical applications. London: Imperial College Press. p. 176.

[১২] Badeau, John Stothoff; Hayes, John Richard (1983). Hayes, John Richard (ed.). The Genius of Arab civilization: source of Renaissance (2nd ed.). MIT Press. p. 200.

[১৩] Science in Medieval Jewish Cultures, edited by Gad Freudenthal

আলি ইবনু ঈসা কাহহাল (the oculist) [১৪] Jesu Occulist	▪ তাযকিরাতুল কাহহালীন (Memorandum of the Oculists) রচনা করেন। ▪ ১০০-এর বেশি চক্ষুরোগ শ্রেণিকরণ ও চিকিৎসা বিবরণ রয়েছে এতে। চক্ষুরোগকে তাদের এনাটমিগত ভাবে সাজিয়েছেন। ▪ অপটিক কায়াজমা শনাক্ত করেন। ব্রেইনের সচিত্র বিবরণ দেন। ▪ Vogt–Koyanagi–Harada syndrome (VKH) রোগটির লক্ষণসমূহ শনাক্ত করেন। চক্ষুপ্রদাহের সাথে এই রোগে চুল-ভুরু-চোখের পাপাড়ি সাদা হয়ে যায়। ▪ temporal arteritis রোগটি আবিষ্কার করেন সর্বপ্রথম। যদিও পরে Sir Jonathan Hutchinson (১৮২৮–১৯১৩)-কে এর ক্রেডিট দেওয়া হয়। (Baum, 1982)
ইবনু যুহর [মৃ.১১৬২ খ্রি.] Avenzoar	▪ সেভিলে ৬ পুরুষ ধরে তাঁরা চিকিৎসক। ▪ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'কিতাবুত তাইসীর' ▪ অন্ননালী, পাকস্থলী ও মিডিয়াস্টিনামের ক্যান্সারের নিখুঁত বর্ণনা দেন (van den Tweel, 2010)। ▪ otitis media ও pericarditis-এর প্যাথলজি প্রথম বর্ণনা করেন। ▪ স্ক্যাবিস যে একধরনের কীট দ্বারা হয়, তা প্রথম আবিষ্কার করেন। [১৫] ▪ প্রাণিদেহে পরীক্ষামূলক অপারেশান (application of experimental method by introducing animal testing) তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান মেডিসিনে। ছাগলের ওপর tracheostomy করে প্রসিডিউর নির্ধারণ করেন। ▪ বড় নাক, মোটা ঠোঁট, বাঁকা দাঁতের জন্য প্লাস্টিক সার্জারির কথা উল্লেখ করেন তাঁর 'কিতাবুল ইকতিসাদ' গ্রন্থে। [১৬]

জাহরাভীর সার্জারি যন্ত্রপাতি

LIBER THEIZIR
DAHALMODANA VAHALTADABIR:
CVIVS EST INTERPRETATIO,
Rectificatio Medicationis & Regiminis
editus in Arabico à perfecto viro,
Abumeron Abynzoahar.
PROOEMIVM AVCTORIS.

ইবনু যুহরের কিতাবুত তাইসীর

[১৪] Lin, Daren (2008). "A Foundation of Western Ophthalmology in Medieval Islamic Medicine"

[১৫] ove, David (2014). Tapeworms, Lice, and Prions: A Compendium of Unpleasant Infections.

[১৬] Glick, Thomas F.; Livesey, Steven; Wallis, Faith (2014). Medieval Science, Technology, and Medicine:

গণিতশাস্ত্রে মুসলিম অবদান:

বিজ্ঞানী	কাজ
মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ফাজারি [১৭]	ব্রহ্মগুপ্তের 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের অনুবাদ করেন 'সিন্দহিন্দ' নামে। ৭৭২ সালে নিজ পিতা ও ইয়াকূব ইবনু তারিক-এর সাথে মিলে।
মাহানি [১৮] [মৃ. ৮৫০ খ্রি.]	▪ ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস', আর্কিমিডিসের On the Sphere and Cylinder এবং মেনেলাউসের Sphaerica-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন। ▪ দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত অবাস্তব সংখ্যা নিয়ে কাজ করেন। ▪ কণিকের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক সমীকরণ Al-Mahani's equation-তাঁর নামে $[x^3+c^2b=cx^2]$ ▪ কণিকের ত্রিমাত্রিক কোণে ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে, যা তিনি প্রথম করেন।
মারওয়াযি [মৃ. ৮৬৯ খ্রি.]	▪ সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর ধারণা দেন: sine, cosine, tangent এবং cotangent. সেই সাথে বিভিন্ন কোণের মানের সাথে এগুলোর সর্বাধুনিক তালিকা তৈরি করেন।[১৯] ▪ বাগদাদে আশ-শামসিয়্যা মানমন্দিরে গবেষণা করে তিনি বিভিন্ন astronomical values নির্ণয় করেন। যেমন পৃথিবীর পরিধি-ব্যাস, চাঁদের দূরত্ব-পরিধি-ব্যাস-কক্ষপথের ব্যাস, সূর্যের পরিধি-দূরত্ব-ব্যাস-কক্ষপথ ইত্যাদি। এবং এগুলো The Book of Bodies and Distances কিতাবে সংকলন করেন হিসাবসহ। [২০]
বাত্তানি [মৃ. ৯২৯ খ্রি.] Albategnius, Albategni or Albatenius	▪ ত্রিকোণমিতির বিভিন্ন নিয়ম তিনি তৈরি করেন: $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $\sec\alpha = \sqrt{1+\tan^2\alpha}$, $b\sin\alpha = a\sin(90^\circ - A)$ ইত্যাদি। ▪ $\sin x = a\cos x$ -কে সমাধানের জন্য নিচের ফর্মুলা বের করেন: $\sin x = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$ ▪ cotangent-এর টেবিল তৈরি করেন ১° থেকে ৯০°-এর প্রতি ডিগ্রীর জন্য।

[১৭] Plofker, Kim (2007). "Fazārī: Muhammad ibn Ibrāhīm al-Fazārī". In Thomas Hockey; et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers

[১৮] O'Connor, J.J.; Robertson, E.F (1999). "Abu Abd Allah Muhammad ibn Isa Al-Mahani". MacTutor History of Mathematics archive. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews

[১৯] Jacques Sesiano, "Islamic mathematics", p. 157

[২০] Langermann, Y. Tzvi (1985). "The Book of Bodies and Distances of Habash al-Hasib". Centaurus, 28 (2): 108–128

খাওয়ারিজমী [মৃ. ৮৪৭ খ্রি.] (Algorithmi / Algorismus)

- বীজগণিত, লগারিদমের জনক। [২১]
- তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা' থেকে algebra, তাঁর নিজের নাম থেকে elgorithm ও logarithm শব্দের উৎপত্তি।
- সর্বপ্রথম রৈখিক সমীকরণ $[a_1x_1+...+a_nx_n+b = 0]$ ও দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণের $[ax^2+bx+c=0]$ পদ্ধতিগত সমাধান করেন।
- এজন্য ৬ভাবে সমাধান করা যায় বলে উল্লেখ করেন:
    - squares equal roots ($ax^2 = bx$)
    - squares equal number ($ax^2 = c$)
    - roots equal number ($bx = c$)
    - squares and roots equal number ($ax^2 + bx = c$)
    - squares and number equal roots ($ax^2 + c = bx$)
    - roots and number equal squares ($bx + c = ax^2$)

আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা বইয়ের অংশ

- দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের বর্গকরণ নিয়ম (completing the square) [ax^2+bx+c কে $a(x-h)^2+k$-তে পরিণত করে সমাধান] আবিষ্কার করেন এবং তাকে জ্যামিতি দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।
- সমীকরণের সমাধানে 'reduction' ও 'balancing' প্রক্রিয়া আলোচনা করেন।
- এই বইয়ের মাধ্যমে গণিতে দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি শুরু হয় (decimal positional number system)
- ত্রিকোণমিতির sin ও cos-এর তালিকা নিখুঁত করেন। প্রথমবারের মত tan-এর তালিকা তৈরি করেন। তাঁর ভাষায় এগুলো ছিল Jibb (sin), tajibb (cos), dhill (cot), tadhill (tan).
- এই গ্রন্থে ৮০০ রকম সমীকরণের উদাহরণ ও সমাধান করেছেন।
- শূন্যের আবিষ্কার ও প্রচলন করেন।[২২]
- তিনি আরেক ধরনের হিসাব পদ্ধতি তৈরি করে, যার নাম 'হিসাব আল-খাতা'আইন' (calculus of two errors), সেটা আধুনিক ক্যালকুলাসের derivation-এর কাছাকাছি।

---

[২১] Boyer, Carl B., 1985. A History of Mathematics, p. 252. Princeton University Press. *"Diophantus sometimes is called the father of algebra, but this title more appropriately belongs to al-Khowarizmi..."* , *"...the Al-jabr comes closer to the elementary algebra of today than the works of either Diophantus or Brahmagupta..."*

[২২] Will Durant (1950), The Story of Civilization, Volume 4, The Age of Faith, p. 241, *"In 976, Muhammad ibn Ahmad, in his Keys of the Sciences, remarked that if, in a calculation, no number appears in the place of tens, a little circle should be used "to keep the rows". This circle the Mosloems called ṣifr, "empty" whence our cipher."*

সাবিতইবনুকুররা[২৩]
[মৃ. ৯০১ খ্রি.]

- আরবিতে অনুবাদ করেন: Apollonius এর Conics, Euclid এর Elements, Ptolemy এর Almagest, Ptolemy এর Geography
- Amicable numbers হলো এমন দুই সংখ্যা যাদের একটার গুণনীয়কগুলোর যোগফল আরেকটা (নিজেকে ছাড়া, proper divisors)। যেমন সবচেয়ে ছোট Amicable numbers হল (২,২০,২৮৪)। এই Amicable numbers বের করার একটা সূত্র আবিষ্কার করেন, যার নামই Thābit ibn Qurra theorem. যদি $p = 3\times2^{n-1} - 1$,, $q = 3\times2^{n} - 1$,, $r = 9\times2^{2n-1} - 1$ হয়, যেখানে $n > 1$ এবং p, q, r মৌলিক সংখ্যা, তাহলে $(2^n\times p\times q)$ আর $(2^n\times r)$ পরস্পরের amicable numbers.
- প্যারাবলয়েড-এর আয়তন নির্ণয়, যা integral calculus-এর দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়।
- দাবার বোর্ড সমস্যার সমাধান চক্রবৃদ্ধি সিরিজ দিয়ে।
- পীথাগোরাসের উপপাদ্য সরলীকরণ।
- তাঁকে বলা হয় স্থিতিবিদ্যার (statics) [illegible] (book on the beam balance) গ্রন্থটি সেসময় মেকানিক্সের ওপর বহুল পঠিত গ্রন্থ।

বানূমূসাভ্রাতৃত্রয়:[২৪]
১.আবূ জাফর মুহাম্মাদ
২.আবুল কাসিম
৩. হাসান ইবনু মূসা

- সমতল ও গোলীয় তল নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।
- পৃথিবীর প্রকৃত আকার ও আয়তন বের করেন।
- তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের (automata) ওপর লেখা Book of Ingenious Devices.
- ১ ডিগ্রী সমান কত দূরত্ব, সেটা বের করেন।
- গ্রীকরা ক্ষেত্রফল ও আয়তনকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারত না। অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করত। বনু মুসা π-এর ধারণা দিয়ে সংখ্যায় নির্ণয় করেন এবং π-কে এভাবে দেখান, 'যে বিশেষ মানে'র সাথে ব্যাস গুণ দিলে পরিধি পাওয়া যায় $(2\pi r)$। [২৫]
- প্রথমবারের মতো পাটীগণিতের পরিভাষা জ্যামিতিতে ব্যবহার করেন। চলমান জ্যামিতিক চিত্রের নানান হিসাব করেন (গতিবিদ্যা)। কোণকে সমান তিন ভাগে (problem of trisecting an angle) ভাগ করতে kinematic methods ব্যবহার করেন।
- ত্রিভুজের ৩ বাহু যদি a,b,c হয়, আর $S=\frac{a+b+c}{2}$ হয়। তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

  ইউরোপীয়রা একে চেনে Hero's theorem নামে। কিন্তু এটা ছিল আরও আগে আর্কিমিডিসের হারানো বইয়ে, যা জানত আরবরা। বানূ মূসা একে ভিন্নভাবে প্রমাণ করেন।

---

[২৩] J J O'Connor and E F Robertson, MacTutor History of Mathematics archive. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews

[২৪] Casulleras, Josep (2007). "Banū Mūsā". In Thomas Hockey; et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers. New York: Springer. pp. 92–4

[২৫] D El-Dabbah, The geometrical treatise of the ninth-century Baghdad mathematicians Banu Musa (Russian), in History Methodology Natur. Sci., No. V, Math. Izdat.

আবুল ওয়াফা বুযজানী
[মৃ. ৯৯৮ খ্রি.]

- ব্যবসায়ীদের জন্য পাটীগণিতের বই এবং শিল্পীদের জন্য জ্যামিতির বই লেখেন।
- মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস—এই সম্পর্কটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।
- ১৫′ অন্তর অন্তর sine ও tangent-এর মান নির্ণয় করে টেবিল বানান।
- মারওয়াযির ত্রিকোণমিতি অনুপাতের সাথে secant ও cosecant যুক্ত করেন।
- গোলীয় ত্রিভুজের (spherical triangles) ক্ষেত্রে sine-এর নিয়ম বের করেন: $\frac{\sin A}{\sin a}=\frac{\sin B}{\sin b}=\frac{\sin C}{\sin c}$
- বিভিন্ন ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা তৈরি করেন:

$$\sin(\alpha \pm \beta)=\sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\cos 2a = 1-2\sin^2 a$$
$$\sin 2a = 2\sin a\cos a$$

আবুল কামিল মিসরী
[২৬][মৃ. ৯৩০ খ্রি.]

Auoquamel

- সমীকরণের সমাধান হিসেবে 'অমূলদ সংখ্যা' র (irrational numbers: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$) এবং সমীকরণে সহগের (coefficients) প্রচলন করেন।
- খাওয়ারিজমীর 'আল-জাবর' ছিল আম-পাবলিকের জন্য। আর ইনি 'আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' লেখেন গণিতবিদদের জন্য।
- 'কিতাবুত ত্বরাইফ'-এ indeterminate equations (যার একাধিক সমাধান হয়)-এর ইন্টিগ্রাল সমাধানের একাধিক পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এতে একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, যার ২৬৭৮টি সমাধান রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।
- 'কিতাবুল মুখাম্মাস ওয়াল মুআশশার' গ্রন্থে পঞ্চভুজ ও দশভুজ নিয়ে আলোচনা করেন। ১০ একক ব্যাসের বৃত্তের অন্তর্গত পঞ্চভুজের ক্ষেত্র হিসেবের জন্য $x^4+3125=125x^2$ সূত্র ব্যবহার করেন।
- কিছু কিছু হিসাবে তিনি 'গোল্ডেন রেশিও' ব্যবহার করেন। যা পরে লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি তাঁর বইয়ে আনেন। দুঃখের বিষয় সেটি ফিবোনাচ্চির নামেই প্রচারিত।
- ভূমি-জরিপকারী ও সরকারি কর্মচারীদের জন্য লেখেন 'কিতাবুল মিসাহা ওয়াল হান্দাসা'। সামান্তরিক-ঘনক, গোলীয়-প্রিজম, বর্গ-পিরামিড ও গোলীয়-কণিক প্রভৃতির ক্ষেত্রফল-আয়তন মাপার নিয়মকানুন লেখেন।

আল-বুজযানীর কাজ

(Moscow, 1966), 131-139.

[২৬] Hartner, W. (1960). "ABŪ KĀMIL SHUDJĀ". Encyclopaedia of Islam. 1 (2nd ed.). Brill Academic Publishers. pp. 132–3
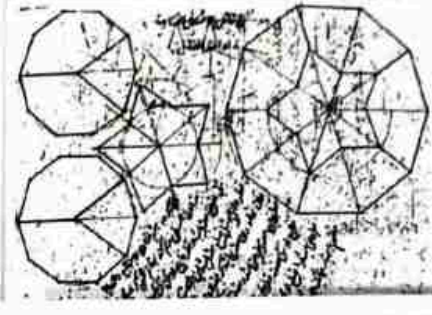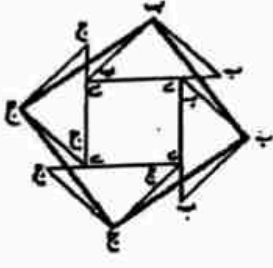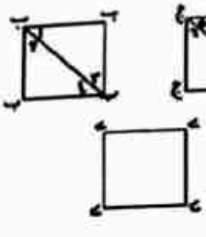
আবূ বকর কারখি [মৃ. ১০২৯ খ্রি.] বা আল-কারাজী

- কোনো সংখ্যার বর্গমূল বের করার জন্য সূত্র বের করেন:
  $\sqrt{a} = \frac{w + a - w^2}{I}$ [এখানে w সংখ্যাটির non-fractional part]
- আরও উচ্চ ঘাতের জন্য তিনি k'ab (x^3), mal-mal (x^4), mal-k'ab (x^5), k'ab-k'ab (x^6), mal-mal-k'ab (x^7) ব্যবহার করেন।
- 'আল-ফাখরি' গ্রন্থে $x^1, x^2, x^3, x^4, x^5, \cdots$ এবং $x^{-1}, x^{-2}, x^{-3}, x^{-4}, x^{-5}, \cdots$ এগুলো ডিফাইন করেন এবং এদের গুণফল কী হবে তাও নির্ধারণ করেন $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$)। কেবল $x^0 = 1$ হতো, এটা নির্ধারণ করতে পারেননি।
- ঘাতযুক্ত সংখ্যার ধারার যোগফলের সূত্র বের করেন, যা আমরা আজও ব্যবহার করি:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

- সর্বপ্রথম 'হাইড্রোলজি'র মূলনীতি বর্ণনা করেন 'ইনবাতুল মিআ আল-খাফিয়্যা' (extraction of hidden water) গ্রন্থে।
- প্রথম দ্বিপদ সমীকরণ, দ্বিপদ সহগ ও প্যাসকেলের ত্রিভুজের ধারণা দেন। [২৭]

ইবনু সিনার কানুন

জাবির ইবনু হাইয়্যান Geber

- নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ও সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) তৈরি।
- সোনা পরিশোধন প্রক্রিয়া
- যৌগের গাঠনিক মৌলের ধারণা
- পারদ পরিশোধন
- পানিতে দ্রাব্যতার ভিত্তিতে লবণের শ্রেণিকরণ
- ক্ষার জাতীয় পদার্থকে 'alkali' নামকরণ
- সোনাকে দ্রবীভূতকারী তরল aqua regia বানান
- পানি থেকে recrystallization দ্বারা ফিটকিরি তৈরি
- Crystallization দ্বারা বস্তু পরিশোধন
- আর্সেনাস এসিড তৈরি

জাবির ইবনু হাইয়্যানের ল্যাটিন অনুবাদ

[২৭] Mohammad Yadegari , The Binomial Theorem: A Widespread Concept In Medieval Islamic Mathematics, Historia Mathematics 7 (1980), 401-406
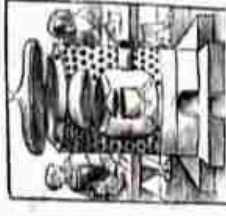
জ্ঞানের হাতবদল

ইউরোপের অবস্থা

কীভাবে জ্ঞানের হাতবদল হয়েছে, কতটুকু হয়েছে, তা বুঝতে আমাদের সেসময় ইউরোপের জ্ঞানতাত্ত্বিক লেভেল বুঝতে হবে। আর মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক লেভেল বুঝতে হবে।

সেন্ট পলের প্রচারিত খ্রিষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিতই ছিল ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অলৌকিক জন্ম, অলৌকিক কার্যক্রম এবং আধ্যাত্মিক জগতের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই অলৌকিক এসব বিষয় প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যুক্তির বিপরীত হয়ে থাকে। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও যুক্তিপ্রয়োগের সাথে খ্রিষ্টবাদের মৌলিক বিরোধ। ফলে মধ্যযুগের ১ম অংশে আমরা ধর্ম ও যুক্তি-জ্ঞানের বিরোধ ছাড়া আর কিছু দেখি না ইউরোপে।

ক.

সেন্ট পল প্রচার করছেন:

> ‘জ্ঞানীরা কোথায়? লেখকরা কোথায়? এ যুগের দার্শনিকরা কোথায় গেল? ঈশ্বর কি দুনিয়াবি জ্ঞানকে আহাম্মকি বানাননি?’ [১ কোরিন্থিয়ান ১:২০]

> ‘যেহেতু এই দুনিয়ার জ্ঞান ঈশ্বরের কাছে নির্বুদ্ধিতা। যেহেতু এটা লেখা রয়েছে: তিনি জ্ঞানীদেরকে তাদের ছলচাতুরির ভেতরেই পাকড়াও করেন।’ [১ কোরিন্থিয়ান ৩:১৯]

খ.

ধর্মতাত্ত্বিক Tertullian (মৃ. ২৪০ খ্রি.) বললেন: খ্রিষ্টবাদ প্রাকৃতিক যুক্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয় কেবল, বরং সরাসরি বিরুদ্ধে। ধর্মজ্ঞান যুক্তির বিরুদ্ধে এবং যুক্তির ঊর্ধ্বে। তিনি সরাসরি ঘোষণা করেন: *credo quia absurdum est* (অযৌক্তিক বলেই আমি এটা বিশ্বাস করি)।[৫৭]

গ.

আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ Cyril-এর আদেশে ধ্বংস করা হয় শহরের লাইব্রেরি। প্রোফেসর

[৫৭] James Swindal, Faith and Reason, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

Horapollon-কে শহর থেকে বের করে দেওয়া হলো।

ঘ.

Catherine Nixey তাঁর *The Darkening Age* বইয়ে লেখেন: খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে যায়, এমন সকল দর্শনের বইপত্রের ব্যাপারে ঘৃণা ছড়ানো হলো। সেন্ট অগাস্টিনের জবানে, দার্শনিকদের মতগুলো 'সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও দমিত হয়েছে'। আরেকজন খ্রিষ্টান সাধুর ভাষায় 'গ্রীকদের সব লেখাজোকা সব শেষ'। পরবর্তী শতকের মাঝে ৯০% ক্ল্যাসিকাল টেক্সট আর ৯৫% ল্যাটিন রচনা হারিয়ে গেল কালের গর্ভে।

ঙ.

Edessa-য় Zeno তাঁর ধর্মতত্ত্বের স্কুল সরিয়ে নিয়ে গেল পারস্যের Nisibis-এ। ৫২৯ সালে সম্রাট ১ম জাস্টিনিয়ান Law 1.11.10.2 জারি করেন, সকল নিও-প্লেটোনিক স্কুল (একাডেমি) বন্ধ করার ঘোষণা দিয়ে: প্যাগানিজমের ভূত ভর করে আছে, এমন কেউ কোনো মতাদর্শ শেখাবে না। John Malalas (মৃ. ৫৭০)-এর লেখা (Chronographia) থেকে জানা যায়: এথেন্সে পাঠানো হয় সম্রাট ডিসিয়াসের ফরমান, কেউ ফিলোসফি শেখাবে না...।[৫৮]

প্লেটোর হাতে গড়া ৯০০ বছর ধরে চলা এথেন্সের সবচেয়ে পুরনো দর্শনের স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। ৫৩২ সালে শেষ ৭ জন দার্শনিক চিরকালের জন্য এথেন্স ত্যাগ করেন, পারস্যে গিয়ে ঠাঁই নেন।

হাতবদল

মূলত ৩টি স্থানে ইউরোপ পরিচিত হয়েছে মুসলিমদের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে।

- ইতালির দক্ষিণে সিসিলি উপদ্বীপে (৮৭৮-১০৯০)
- পশ্চিম প্রান্তে স্পেন বা আন্দালুসে (৭১১-১৪৯২)
- পূর্ব প্রান্তে তুরস্ক (৬৩৪- এখনও)

ইসলামি সভ্যতার এসব জ্ঞানবিজ্ঞান আরবি থেকে বিপুল হারে অনুবাদ হতে থাকে ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায়।

[৫৮] Paavo Castren (ed.), Post Herulian Athens AD 267-529.

ইতালি

ইতালির দক্ষিণে সিসিলি উপদ্বীপ ৮৭৮-১০৬০ সাল পর্যন্ত ছিল মুসলিম শাসনাধীন। আগলাবী রাজবংশের হাত থেকে নর্মানরা ১০৬০-১০৯০ সালের মধ্যে সিসিলি দখল করে নেয়। এবার কিছু মানুষের সাথে আমরা পরিচিত হবো। [৫৯]

নাম	অনূদিত বই		বিষয়	ল্যাটিন নাম
Constantine the African ইতালির Monte Cassino মঠের সন্ন্যাসী (মৃ. ১০৮৭ খ্রি.)	আলি ইবনু আব্বাস–এর ২০ খণ্ডের বিশ্বকোষ কিতাবুল মালিকি (The Complete Art of Medicine)		চিকিৎসাবিদ্যা	১ম তিন খণ্ড *Liber pantegni* নামে
	হুনাইন ইবনু ইসহাক			*sagoge ad Tegni Galeni*
	ইসহাক ইবনু সুলাইমান ইসরাঈলি	কিতাবুল হুমাইয়াত (book of fever)		*Liber febribus*
		কিতাবুল আদউয়িয়াহ (book of diet)		*Liber de dietis*
		কিতাবুল বাউল (book of urine)		*Liber de urinis*
	ইসহাক ইবনু ইমরানের 'আল-মাকালা ফীল মালিখুকিয়্যা'		মনোরোগ	*De melancolia*
	ইবনুল জাযযার	'যাদুল মুসাফির'	মেডিসিন	*Viaticum*
		কিতাবুল মি'দা	পরিপাক রোগ	*Liber de stomacho*
		কিতাবুন নিসইয়ান	স্মৃতিরোগ	*De oblivione*
Gerard de Sabloneta	ইবনু সিনা'র 'আল-কানূন ফিত তিব্ব'		মেডিসিন	
	রাযি'র 'কিতাবুল মানসুরী'		সার্জারি	*liber ad al-monsorem*
Bonacosa	ইবনু রুশদের 'কুল্লিয়াত'		মেডিসিন	*Colliget*
John of Capua	ইবনু যুহরের 'কিতাবুত তাইসীর'		মেডিসিন	*Theisir*
Faraj ben Salem	রাযি'র 'কিতাবুল হাউয়ি'		মেডিসিন	*Continens Rasis*
	ইবনু বুলতানের 'তাকবীম আস-সিহহা'		স্বাস্থ্যনীতি	*Tacuinum sanitatis*
Simon of Genoa এবং Abraham Tortuensis	জাহরাভীর 'কিতাবুত তাসরীফ'		সার্জারি	*Liber servitoris*

[৫৯] Jerome B. Bieber. Medieval Translation Table 2: Arabic Sources, Santa Fe Community College.

অন্ধকার ইউরোপের প্রথম মেডিকেল স্কুল গড়ে ওঠে ইতালির সালের্নো শহরে (Schola Medica Salernitana)। প্রথমে এটা ছিল বিক্ষিপ্ত গ্রীক মেডিসিনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটা চার্চ-লাগোয়া ডিসপেনসারি (Benedictine monastery hospital or dispensary)। ১১শ শতকে এটা পরিণত হয় ইউরোপের প্রথম পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। যার পিছনে মূল কাজটা করেছেন Constantine the African নামক সাধু। দীর্ঘদিন তিনি তিউনিসিয়ায় চিকিৎসাবিদ্যা পড়েছেন বলে তাকে আফ্রিকান বলা হয়। প্রথম জীবনে মুসলিম এই ব্যক্তি (মুরতাদ) তিউনিসিয়া ও বাগদাদের হাসপাতালগুলোতে পড়াশোনা করেন। ১০৬৫ সালে তিনি ইতালি আসেন এবং আর্চবিশপ আলফনসোর পরামর্শে আরবি থেকে গ্রীক ও আরব ডাক্তারদের রচনাগুলো ল্যাটিনে অনুবাদের কাজ শুরু করেন। এই অনুবাদগুলোর ভিত্তিতেই চিকিৎসাবিদ্যার এমন রিসোর্স জমা হয় এখানে, যা খ্রিষ্ট দুনিয়ার উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে Schola Medica Salernitana-কে। এজন্যই D. Campbell তাঁর *Arabian Medicine* গ্রন্থে Constantine-কে বলেন: মধ্যযুগে ইউরোপের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান চরিত্র। McVaugh তাঁর *History of Medicine* গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন: 'কন্সটানটাইন অনূদিত Pantegni-র এনাটমি চ্যাপটারগুলো ছাড়া (আলি আব্বাস রচিত) ইউরোপের হাতে তখন কোনো এনাটমির কাজ ছিল না'। আর এ তো জানা কথা যে, এনাটমি ছাড়া আধুনিক মেডিসিন অসম্ভব।

আরও একদল মেডিকেল শিক্ষক তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ান থেকে ইতালিতে আসার ফলে ইতালির দক্ষিণাঞ্চল আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে চিকিৎসা শিক্ষায়। ইউনিভার্সিটি গড়ে ওঠে Bologna (১১শ শতকের শেষে)। পরের শতকে ভাণ্ডারে যোগ হয় Gerard of Cremona-র (মৃ. ১১৮৭ খ্রি.) অনুবাদকর্ম, নতুন নতুন সব জ্ঞান। পরে আলোচনা রয়েছে ওনার ব্যাপারে। গড়ে ওঠে University of Padua (1222) আর University of Naples (1224)। গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে গত ১০০০ বছরে খ্রিষ্টসাম্রাজ্যের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা ঘুচে গেল আরবি হয়ে। সাথে যোগ হলো মুসলিম সভ্যতার 'তাজরিবা'—গবেষণালব্ধ জ্ঞান... বিজ্ঞান। পরের শতকে ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠল Rome (1303) এবং Florence-এ (1321)।

স্পেন

৭৩২ সালের আগ অব্দি মধ্য ফ্রান্সের Tours পর্যন্ত দখলে নেয় মুসলিম বাহিনী। Tours-এর যুদ্ধে পরাজয়ের পরও দক্ষিণ ফ্রান্সের Grenoble পর্যন্ত তাদের দখলে ছিল। মুসলিমরা জার্মানীর স্যাক্সন সাম্রাজ্যের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখত। খলীফা
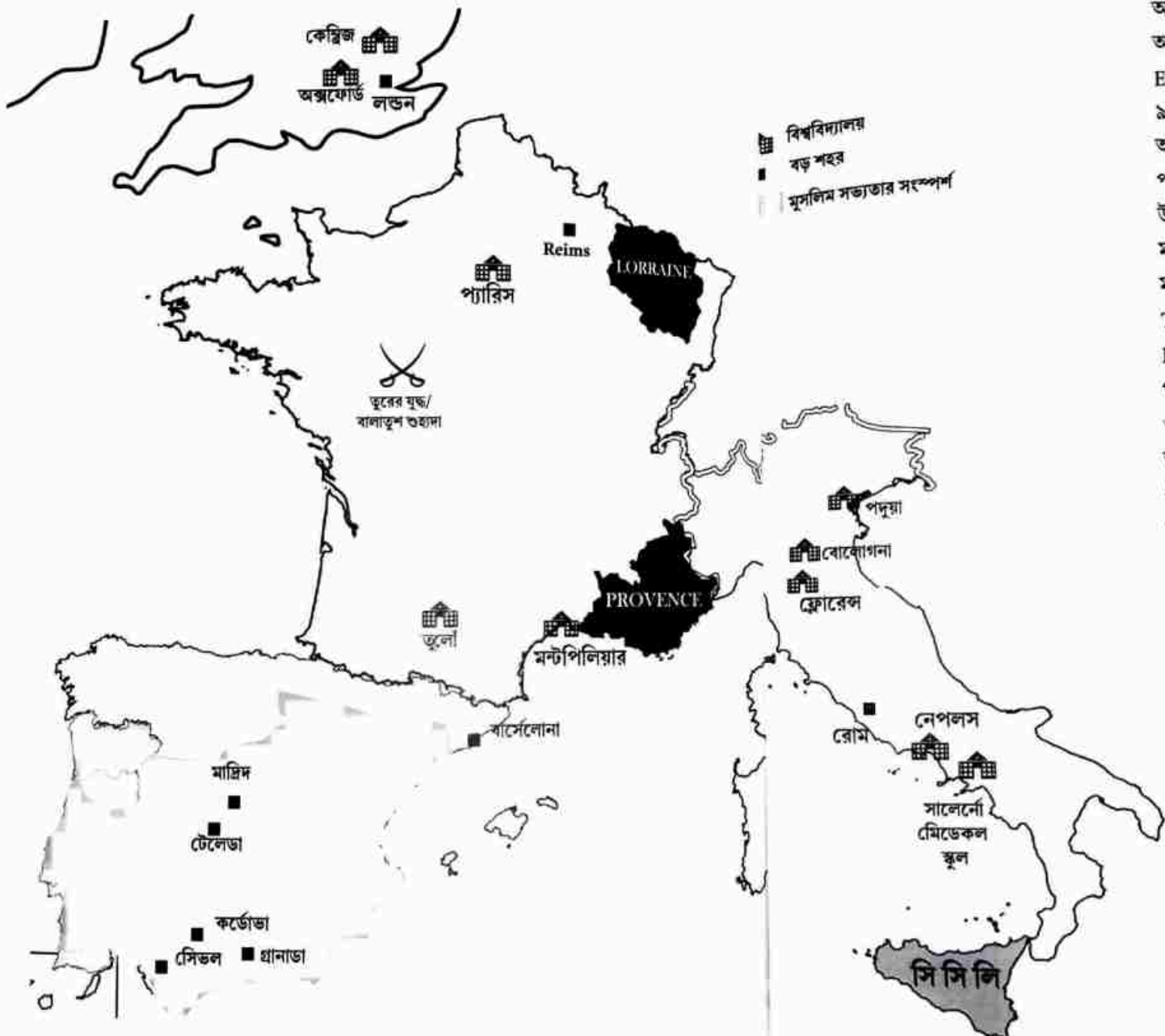
[৬০] James Westfall Thompson (1929). Th
the Tenth Century. Isis, 12(2), 184–193.

আবদুর রহমান ৩য় জার্মান সম্রাট ১ম অটোর দরবারে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন Elveira-এর বিশপ Recemundus-কে ৯৫৬ সালে। এর আগে ৯৫৩ সালে অবশ্য অটো নিজেই কর্ডোভাতে নিজের দূত হিসেবে পাঠান John of Gorze-কে। ইনি হলেন উত্তর ফ্রান্সের লোরেইন অঞ্চলের Gorze মঠের সাধু। Gorze মঠ তখন উত্তর ইউরোপে মশহুর ধর্মতাত্ত্বিকদের আনাগোনায়। Metz, Toul, Verdun, Burgundy, England, Ireland, Scotland, Calabria তখন সাধুদের পদচারণায় মুখর যারা জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও সংগীতে আগ্রহ রাখেন। যার মধ্যে আছেন Salecho, Bandincus, Bernacer, Rotlandus, Warimbertus, Sister Geisa প্রমুখ।[৬০]

দূত হিসেবে John কর্ডোভাতে ছিলেন ৩ বছর। ফিরবার সময় নিয়ে ফেরেন আরব জ্ঞানের খোঁজ। এর একটা প্রমাণ হলো, এবাকাস-এর হিসেবে প্রচুর আরবি টার্ম এবং ইউরোপের মঠগুলোতে আরবি কিতাবপত্র।

১০ম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা স্পেনে পড়তে আসেন। বিশেষ করে যখন ১০৮৫ সালে টলেডো শহর মুসলিমদের হাতছাড়া হয়। পুরো পশ্চিম ইউরোপ হুমড়ি খেয়ে পড়ে টলেডোয় এসে। শেখার জন্য। আগেই আন্দালুসের রূপ-রস-গন্ধে মোহিত হয়ে ছিল ইউরোপ। শুধু মুসলিমদের প্রতি শত্রুতাবশত গণহারে ভিড়তে পারছিল না

[৬০] James Westfall Thompson (1929). The Introduction of Arabic Science into Lorraine in the Tenth Century. Isis, 12(2), 184–193.

স্পেনের শহরগুলোয় (পূর্ব সীমায় ক্রুসেড কিন্তু চলছে)। একটা শহর হাতে আসতেই দলে দলে জ্ঞানপিপাসুরা আসতে থাকে টলেডোতে। মুসলিমদের রেখে যাওয়া শত শত বই ল্যাটিনে অনুবাদ হতে থাকে। এই অনুবাদ-যজ্ঞের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল টলেডোর Great Cathedral Library. আরবিভাষী খ্রিষ্টানদের বলা হতো মোজারব (Mozarab), এরা এক তো মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, আবার আরবি জানে, স্থানীয় ভাষা জানে, কেউ কেউ ধর্মীয় ভাষা ল্যাটিনও জানে।

রাজা Alfonso X of Castile সময় (মৃ. ১২৮৪ খ্রি.) এটা আরও বেগবান হয়। ইতালি-জার্মানি-নেদারল্যান্ড-ইংল্যান্ড থেকে পণ্ডিতরা পাড়ি জমায় টলেডোতে। ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে ফেরে দর্শন-চিকিৎসা-ধর্মীয়-ক্ল্যাসিকাল (গ্রীক-রোমান) জ্ঞানের সওদা। কারা কারা এসেছিলেন, এবং কেন এসেছেন, তা আমরা তাদের জবানিতে শুনব। এসেছিলেন—

Gerbert of Aurillac (৯৪৫-১০০৩)

এসেছিলেন বার্সেলোনাতে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা পড়তে। পরে Rheims-এ গীর্জার স্কুলে জ্যোতির্বিদ্যা শেখান। তাঁর ছাত্ররা উত্তর ইউরোপের আরও ৮টি গীর্জাস্কুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় শিক্ষক হিসেবে। স্পেনের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা পুরো উত্তর ইউরোপে খ্যাতিলাভ করে তার হাত ধরে।

Gerbert পরবর্তীতে পোপ হন। তাঁর উপাধি হয় Pope Silvester II. Gerbert-কে অন্যান্য পাদরিরা ভালো নজরে দেখত না, বিশেষত মুসলিমদের কাছে গিয়ে শিখে আসার কারণে। মধ্যযুগে মুসলিমদেরকে কী নজরে পাদরিরা দেখত সেটা জানলে বুঝতে সহজ হবে। তার ব্যাপারে যা ছড়িয়েছে পাদরিরা ১২শ শতকের প্রথম দিকে ঐতিহাসিক William of Malmesbury সেটা লিপিবদ্ধ করেন:

> “
> ‘Gerbert তার মঠ ছেড়ে ভেগেছে আরবদের থেকে জ্যোতিষ আর কালোজাদু শেখার জন্য। ওদের থেকে সে শিখেছে ‘পাখির গান ও উড়াউড়ি থেকে ভবিষ্যদ্বাণীর কৌশল, প্রেতপুরী থেকে প্রেতাত্মাদের ডাকার আহ্বানের বিদ্যে, আরও নানা ক্ষতিকর অপজ্ঞান’। Bodleian Library, Oxford-এর এক ১৩শ শতকের পাণ্ডুলিপিতে আছে: অপদেবতাদের মদদে জেরবার্ট পোপ হয়েছে। আর তার ওপর সোনামুখো এক প্রেতের ভর হয়, যার ফলে সে কঠিন কঠিন সব অঙ্ক করতে পারে।’

এই হচ্ছে ১০ম শতাব্দীতে ইউরোপের সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণির (পাদরির) মনমানসিকতা।

Raymond of Toledo (১১২৫-১১৫৫)

আর্চবিশপ Raymond-এর অধীনে (মৃ. ১১৫৫ খ্রি.) টলেডোর Great Cathedral Library-তে ধুমসে চলতে থাকে অনুবাদ। তাঁর অধীনে একটা পুরো টীম কাজ করত অনুবাদের। এইসব অনুবাদক পণ্ডিতদেরকে নিয়ে গড়ে ওঠে Toledo School of Translators. মূলত মোজারব খ্রিষ্টান, স্থানীয় ইয়াহূদি, কিছু মুসলিমও ছিল এই দলে। তারা আরবি থেকে স্থানীয় ক্যাস্টিলিয়ান ভাষায়, আবার ক্যাস্টিলিয়ান থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করত। কখনও সরাসরি আরবি থেকে ল্যাটিনে, বা গ্রীক থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ চলত। তিনি নিজেই বলেন:

> ‘আরবি কিতাবের সম্ভার, দোভাষী এক্সপার্টদের সমারোহ—মোজারব, লোকাল ইয়াহূদি— মিলে এক নিয়মিত বাহিনী কাজ করছে বিজ্ঞানের বইগুলো আরবি-ল্যাটিন অনুবাদের। ফলে সারা ইউরোপের জ্ঞানপিপাসুদের হাট বসেছে যেন।’[৬১]

John of Seville

প্রথম জীবনে ইয়াহূদি নাম ছিল আবূ দাউদ (avendauth)। পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে জন, জোহান, ইয়োহান্নেস ইত্যাদি নামে পাওয়া যায় তাঁকে[৬২]। তাঁর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- ফারগানি-এর Book on the Elements of the Science of Astronomy এবং Elements of astronomy on the celestial motions
- আবূ মাশার বলখী-এর Flowers of Abu Ma'shar
- কুস্তা ইবনু লুকা-এর The Difference Between the Spirit and the Soul
- ইবনু সিনা-এর De anima, Book of Healing
- গাযালি-এর The Aims of the Philosophers

Adelard of Bath

ফ্রান্সের লোরেইন থেকে পাশ করা সাধুরা ইংল্যান্ডে বিশেষ সমাদর পেতেন। নানান মঠে বড় বড় পজিশনে যেতেন। কেননা তাঁরা একই সাথে ধর্মতত্ত্ব, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যেমন: Duduc (Wells-এর বিশপ), Hermann (Ramsey-এর বিশপ), Leofric (Exeter-এর বিশপ), Walter (Hereford-এর বিশপ), Athelard (আইন কলেজের অধ্যক্ষ), Robert (Hereford-এর বিশপ),

[৬১] Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western Education, AD 800-1350, (Boulder: University of Colorado Press, 1964), p. 185.

[৬২] Robinson, Maureen. (2007). The Heritage of Medieval Errors in the Latin Manuscripts of Johannes Hispalensis (John of Seville). al-Qanara. 28.

Walcher Of Malvern, Walcher Of Durham, Thomas Of York এবং Samson Of Worcester—এরা সবাই লোরেইনের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। Walcher Of Malvern ছিলেন প্রথম সরাসরি আরবির ছাত্র। তার উস্তাদ ছিলেন রাজা ১ম হেনরির ব্যক্তিগত চিকিৎসক স্পেনীয় ইয়াহূদি Petrus Alphonsi, যার হাত ধরে আরব মেডিসিন ও জ্যোতির্বিদ্যা ইংল্যান্ডে ঢোকে। এরপর ব্রিটিশরা আসা শুরু করে স্পেনে।

Adelard of Bath (মৃ. ১১৫২ খ্রি.) ইংল্যান্ড থেকে প্রথমে আসেন ফ্রান্সের Laon শহরে। আরবি ভাষা শেখেন। এরপর সফর করেন সিসিলি, সালের্নোর মেডিকেল স্কুল, গ্রীস, এশিয়া মাইনর হয়ে পূর্বে আরবদের শহরগুলো। ৭ বছর পর ফিরে আসেন ফ্রান্সে, খুব সম্ভব নরমান্ডিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আরব জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদান শুরু করেন। তাঁর লেখা *Quaestiones Naturales* বইয়ের পাতায় পাতায় আরব জ্ঞানের প্রশংসা রয়েছে। কেন এলেন ভদ্রলোক ইংল্যান্ড থেকে এখানে? বলছেন:

> ‘যখন আমার মুখে কর্তৃপক্ষের লাগাম, তখন আর শেখার কীইবা আছে। আরব উস্তাযদের থেকে আমি একটা জিনিসই শিখেছি—যুক্তি দিয়ে বুঝে নেওয়া।’[৬৩]

Peter the Venerable

১১২২-১১৫৬ সাল অব্দি দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্লুনি মঠের (Abbey of Cluny) অধ্যক্ষ ছিলেন। ইসলামি বিশ্বের দর্শন ও জ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর এক বা একাধিক অনুবাদক দল কাজ করছিল টলেডো ও উত্তর স্পেনে। ১১৪২ সালে তিনি সেসব কাজের তদারকিতে স্পেন এসেছিলেন। তাঁর এই টীমে ছিল—Peter of Toledo, Peter of Poitiers, Robert of Ketton, Herman of Carinthia এবং মুহাম্মাদ নামের একজন মুসলিম।

Hermann of Carinthia এবং Robert of Ketton

স্লাভ বংশীয় হার্মান ১১৩৮-১১৪৩ সময়টা কাটান স্পেনে। সে আর ব্রিটিশ রবার্ট ছিল বন্ধু। একসাথে আরবি থেকে বেশ কিছু কাজ করে তারা।

- কুরআনের ১ম ল্যাটিন অনুবাদ Lex Mahumet pseudoprophete (Law of the False Prophet Muhammad)
- আল-কিন্দির Judicia (Astrological Judgements
- ইউক্লিডের Elements
- De generatione Muhamet et nutritura eius এবং Doctrina Muhamet (হার্মান একাই)

---

[৬৩] Norman Daniels, The Arabs and Medieval Europe, (London: Longman, Librarie du Liban, 1979), p. 268

- ➡ মাজরিতীর ব্যাখ্যা সহ টলেমি'র Planisphaerium
- ➡ আবূ মাশারের Introduction to Astronomy
- ➡ খাওয়ারিজমির astronomical tables

Hermann of Carinthia আরেক অনুবাদক Robert of Ketton-কে চিঠিতে জানাচ্ছেন নিজেদের কাজ নিয়ে:

> “ 'আরবদের সাগর সেঁচে মুক্তো নিয়ে আসব আমরা।'[৬৪]

Plato of Tivoli

গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। ১১১৬-১১৩৮ পর্যন্ত ছিলেন বার্সেলোনাতে। Plato of Tivoli ১১৪৫ সালে লেখেন: 'ল্যাটিনদের... একটা জ্যোতির্বিদও যদি থাকত... খালি আকাশকুসুম আর আষাঢ়ে গপ্পো।'[৬৫]

ইয়াহূদি গণিতজ্ঞ আব্রাহাম বারহিয়ার সাথে কাজ করেন। অনুবাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য—

- ➡ টলেমির টেট্রাবিব্লস
- ➡ আল বাত্তানির কাজগুলো
- ➡ ইবনুস সাফফারের De usu astrolabii

Gerard of Cremona (মৃ. ১১৮৭ খ্রি.)

তিনি টলেডোতে আসেন মূলত মেডিসিন আর টলেমি-র Almagest-এর প্রতি আগ্রহের কারণে। কিন্তু এখানে এসে প্রতিটা সাবজেক্টে এত এত আরবি বই দেখে আর এসব বিষয়ে ল্যাটিনদের মূর্খতার কথা চিন্তা করে নিজেই আরবি শিখতে লেগে যান। [৬৬] ১১৮৭ সালে মৃত্যুর আগে ৮৭টি বই ল্যাটিনে অনুবাদ করেন।

- ➡ টলেমি'র Almagest
- ➡ এরিস্টটলের কাজগুলো
- ➡ খাওয়ারিজমির আল-জাবর
- ➡ আর্কিমিডিসের On the Measurement of the Circle
- ➡ ইউক্লিডের Elements of Geometry
- ➡ জাবির ইবনু আফলাহর Elementa astronomica
- ➡ আল-কিন্দির On Optics, De Gradibus

---

[৬৪] Daniels, p. 275.

[৬৫] Nakosteen, p. 185.

[৬৬] Richard Fletcher, Moorish Spain (New York: Henry Holt and Co., 1992), p. 151.

- ফারগানির On Elements of Astronomy on the Celestial Motions
- ফারাবির On the Classification of the Sciences
- ইমাম রাযির রসায়ন ও মেডিকেল কাজগুলো (Liber ad Almansorem, Liber divisionum, Introductio in medicinam, De egritudinibus iuncturarum, Antidotarium and Practica puerorum)
- সাবিত ইবনু কুররা ও হুনাইন ইবনু ইসহাকের কাজগুলো

ইমাম রাযির ল্যাটিন অনুবাদ

- যারকালী, বানূ মূসা, আবূ কামিল, জাহরাভী, ইবনু হাইসামের কাজগুলো
- আলি ইবনু রিদওয়ান (Haly Abenrudian) এর Expositio ad Tegni Galeni
- ইউহান্না ইবনু সারাবিয়ুনের Practica, Brevarium medicine
- ইবনু ওয়াফিদের Liber de medicamentis simplicus
- ইসহাক ইবনু সলোমনের De elementis and De definitionibus
- ইবনু সিনার Canon of Medicine

Daniel of Morley [৬৭]

আরেক ইংরেজ (মৃ. ১২১০ খ্রি.)। এসেছিলেন প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে পড়তে। কিছুদিন সেখানে থেকে এলেন কর্ডোভাতে। নরউইচের বিশপ John of Oxford জানতে চেয়েছেন, কেন সে স্পেনে গেল। উত্তরে বলছেন:

> 'জ্ঞানের পিপাসা আমাকে ইংল্যান্ড থেকে বের করে নিয়েছে। গেলাম প্যারিসে। গিয়ে দেখি দরবেশরা সব সামনে ভল্যুম ভল্যুম কেতাব-কালি-কলম নিয়ে বসা। জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব নিয়ে থাকা লোকগুলোর মূর্খতাই তাদের থামিয়ে রেখেছে। মুখ খুললেই বেরিয়ে আসে শিশুতোষ সব কথাবার্তা। শুনলাম টলেডো-য় নাকি আরবদের সব শিক্ষাদীক্ষার ছড়াছড়ি। দুনিয়ার সবচেয়ে বিজ্ঞ দার্শনিকদের ক্লাশ করলাম সেখানে। খালি বন্ধু ডেকেছে বলে... একগাদা কেতাবপত্রসহ এসে পড়তে হলো।'[৬৮]

[৬৭] Singer, Charles , "Daniel of Morley: An English philosopher of the XIIth century", Isis, iii (1920-21), 263-9.

[৬৮] Jacques LeGoff, Intellectuals in the Middle Ages, (Cambridge, MA: Blackwell, 1993), pp. 18-19.

অন্যান্যদের মাঝে ছিলেন:

অনুবাদক	কিতাব	অনূদিত নাম
Avendauth (আব্রাহাম ইবনু দাউদ)	ইবনু সিনার কিতাবুশ শিফা-র মেটাফিজিক্স এর ১০টা চ্যাপ্টার	Liber de philosophia prima
Domingo Gundisalvo এবং Archdeacon of Cuéllar	ইমাম গাযালির মাকাসিদুল ফালাসিফা	Summa theoricae philosophiae
	ইবনু জিব্রাইল আল-ইয়াহূদির The Fountain of Life	Fons Vitae
Abraham of Tortosa	ইবনু সারাবি-র (Serapion Junior)	De Simplicibus
	জাহরাভীর আত-তাসরীফ	Liber Servitoris
Mark of Toledo	হুনাইন ইবনু ইসহাক ও অন্যদের মেডিকেল কাজ	Liber isagogarum
Robert of Chester	খাওয়ারিজমীর আল-জাবর, এস্ট্রনমি ও ত্রিকোণমিতির টেবিলগুলো	
Michael Scot	আল-বিতরুজী'র (Alpetragius) On the Motions of the Heavens	
	ইবনু রুশদের রচিত এরিস্টটলের ব্যাখ্যা	

AVERROIS
COLLIGET

ইবনু রুশদের কুল্লিয়াত

আমরা আগেই দেখেছি, ফ্রান্সের লোরেইন অঞ্চলে আরব জ্ঞানবিজ্ঞান প্রবেশ করেছিল সেই ১০ম শতকের শেষদিকে। সম্রাট শার্লম্যানের আমল থেকেই ফ্রান্সে একটা হালকা রেনেসাঁ (Carolingian renaissance) শুরু হয়েছিল। মূলত খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও ল্যাটিন ভাষা চর্চাই ছিল এর মূল ভিত্তি। ব্যাকরণ চর্চা, সংগীত, গণিত ইত্যাদি প্রতি মঠে শেখানোর একটা ফরমান জারি হয়। সম্রাট একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন; নিজ প্রাসাদে বিদেশি প্রশিক্ষকদের নিয়ে আসেন, যেমন—ব্রিটেন থেকে Alcuin, ইতালি থেকে ব্যাকরণিক Paul the Deacon, মুসলিম স্পেন থেকে উদ্বাস্তু খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা।

বার্সেলোনা থেকে পড়ে আসা Gerbert of Aurillac (মৃ.১০০৩ খ্রি.) উত্তর ফ্রান্সের Rheims-এ গীর্জার স্কুলে পড়াতে থাকেন quadrivium (geometry, arithmetic, harmonics, and astronomy)। তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স জুড়ে। স্থানে স্থানে শহরের স্কুলে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু হয়। ১১৫০-১১৭০ এর মাঝে University of Paris প্রতিষ্ঠা হয় মূলত খ্রিষ্টবাদ পড়ানোর জন্য। ছাত্ররা প্রথমে শিখত

ল্যাটিন ও ধর্মতত্ত্ব, এরপর trivium (grammar, rhetoric, logic), আরও যারা পড়বে তারা quadrivium, এরপরও যারা পড়বে তারা philosophy. ১২৭২ সালে এক ডিক্রিবলে প্যারিসের বিশপ এরিস্টটলের দর্শন পড়ানো ধর্মবিরোধী বলে ফতোয়া দিলেন। এরিস্টটল নিয়ে আরব দার্শনিকদের কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল একেশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ, যা খ্রিষ্টবাদের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে ইবনু রুশদ, ইবনু সিনা ও ইমাম গাযালির কাজগুলো। ফলে ১৩২৫ সালের মাঝে University of Paris-এর কারিকুলামে আবার এরিস্টটল ফিরে আসে এই শর্তে যে, এরিস্টটলের যেটুকু ইবনু রুশদ গ্রহণ করেছেন, সেটুকুই পাঠ্য হবে। [৬৯] যুক্তিপ্রিয় ও সূফিবাদী উভয় প্রকারের পাদরিদের জন্য দর্শনশাস্ত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

১২২০ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে University of Montpellier প্রতিষ্ঠা হয় একেবারে স্পেনের সীমান্তে, যা হয়ে উঠল মুসলিম মেডিসিন চর্চার প্রধান কেন্দ্র। কর্ডোভা থেকে পরে আসা ইয়াহূদি ডাক্তারদের হাতে ঠিক কর্ডোভারই আদলে। এই ভার্সিটির দুইজন প্রখ্যাত ছাত্র—রবার্ট ও গিলবার্ট। যারা নিজেরাই জ্যোতির্বিদ্যা ও মেডিসিনের ওপর স্বতন্ত্র বইপুস্তক লিখেছেন, যা পঠিত হয়েছে ইউরোপ জুড়ে। Arnold of Villeneuve এবং বেকনের বন্ধু Raymond Lully স্পেনে পড়ে Montpellier-এ শিক্ষকতা করেছেন। Campanus Novara কর্ডোভাতে গণিত পড়ে এসে ভিয়েনাতে শিক্ষকতা করেছেন। একদম কাছে Narbornne-এ ইয়াহূদি সাধুদের স্কুলগুলোয় আরব বিজ্ঞানচর্চা ও অনুবাদ হতে থাকে।

ইংল্যান্ডের পণ্ডিতেরা এতদিনে লোরেইন হয়ে আরব জ্ঞানের স্বাদ পেয়ে গেছে। লোরেইনের ছাত্ররা সেখানে বড় বড় পজিশনে। সরাসরি স্পেনে এসে ঘুরে গেছেন রবার্ট, এডেলার্ড, ড্যানিয়েলসহ অনেকে। রবার্ট ব্রিফল্ট তাঁর *Making Humanity*-তে লেখেন—

> “
> 'William of Normandy-র সাথে বহু ইয়াহূদি ব্রিটেনে আশ্রয় নেয় এবং অক্সফোর্ডে বিজ্ঞান স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তাদেরই ছাত্রদের কাছে সেখানে রজার বেকন আরবি ভাষা ও জ্ঞানের পাঠ লাভ করেন। বেকন বা তাঁর মিতারা (একই নামধারী) কেউই গবেষণামূলক পদ্ধতি (experimental method) প্রবর্তনের কৃতিত্ব রাখেন না। রজার বেকন খ্রিষ্ট ইউরোপে আরব জ্ঞানবিজ্ঞানের একজন বাহক ছাড়া আর কিছু নন। এবং তিনি কখনোই একথা বলা ছাড়েননি যে, তাঁর সময়ে আরবি এবং আরবজ্ঞানই ছিল সত্যে পৌঁছোবার একমাত্র রাস্তা।'[৭০]

১১৬৭ সালে ব্রিটিশ ছাত্রদের প্যারিসে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, ২য় হেনরি প্যারিসের

[৬৯] Rashdall, Universities, i.368 সূত্রে The Legacy of Islam, p. 276

[৭০] Robert Briffault (1919), The Making of Humanity, p200

সব ব্রিটিশ ছাত্রকে দেশে ফেরত আসতে নির্দেশ দিলেন। বিজ্ঞান স্কুল অক্সফোর্ড হয়ে উঠল University of Oxford. এখানে লেকচার দিতেন Daniel of Morley, যিনি ছিলেন সরাসরি স্পেনের কর্ডোভার ছাত্র। সেসময় ইংল্যান্ডে লিবারেল আর্টস চর্চা ছিল না বললেই চলে, এরিস্টটল-প্লেটো কেউ চেনেই না।[৭১] ড্যানিয়েলের পরে এলেন মাইকেল স্কট, যিনি বার বার গেছেন কর্ডোভায় পাণ্ডুলিপির খোঁজে। বেকন যখন প্যারিসে পড়তে যান, সেখানে তখন চলছে First Averroism (c. ১২৪০-৪৮); ইবনু রুশদ বলতেই সেখানে সব পাগল। বেকনকেও তাই নিজের লেখায় ২০০ বার নিতে হয় ইবনু রুশদের নাম।

সেসময় ক্যাথলিক ধারাতেই দুটো ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর (মাসলাক) জন্ম হয়। ডোমিনিকান গোষ্ঠী ধর্মতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী ছিল, আর বিজ্ঞানের ব্যাপারে ছিল মারাত্মক বিরোধী। বার্সেলোনা শহরে তাদের ১২৯৯ সালের প্রোভিন্সিয়াল চ্যাপ্টারে (দাওয়াতি সম্মেলন) বিজ্ঞান পড়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি জারি করা হয়। বলা হয়:

> ‘বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অবস্থান হলো, আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের কেউ মেডিসিন বা দুনিয়াবি যুক্তিবিদ্যা চর্চা করবে না। যা কিছু আমাদেরকে দুর্বল করে, বিতর্কিত করে এমন কোনোকিছু পরিহারে আমাদের দ্বিধা নেই। এইসব বিষয়ের বইপত্র ছাড়াই আমরা এগিয়ে যাব।’[৭২]

বিপরীত মাসলাক হলো ফ্রান্সিসকান গোষ্ঠী। এদের ভাবনাচিন্তা কাছাকাছি হলেও ব্রিটিশ ফ্রান্সিসকানরা ছিল আবার আলাদা। তারা প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিল। রবার্ট গ্রসেটেস্ট, রজার বেকন, এডাম মারিস্কো এরা সবাই ব্রিটিশ ফ্রান্সিসকান গোষ্ঠির সদস্য ছিলেন। ১২৩০ সালে Robert Grosseteste অক্সফোর্ড স্কুলে দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের লেকচার শুরু করেন। ১২৫৭ সালে রজার বেকন এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন প্যারিসে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে। আর সেসময় প্রকৃতিবিজ্ঞান মানেই আরব জ্ঞানবিজ্ঞান। বেকন তাঁর বিজ্ঞান ট্রেনিং লাভ করেন মূলত আরব লেখকদের গ্রন্থ অধ্যয়ন থেকে। [৭৩]

১২০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর একে একে ইউরোপ জুড়ে গড়ে উঠল জ্ঞানপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়[৭৪]—

---

[৭১] Silverstein, Theodore (1948). Daniel of Morley, English Cosmogonist and Student of Arabic Science. Mediaeval Studies, 10(), 179–196.

[৭২] (Douais, "Acta Capitulorum Provincialium O. P.," Toulouse, 1894, p. 648, No. 14) সূত্র John M. Lenhart (1924). SCIENCE IN THE FRANCISCAN ORDER: A HISTORICAL SKETCH. Franciscan Studies, (1), 5–44.

[৭৩] The Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Vol.3, p153

[৭৪] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, April 27). University. Encyclopedia Britannica.

- স্পেনে: Salamanca (1218)
- ফ্রান্সে: Toulouse (1229), Aix-en-Provence (1409)
- ইতালিতে: Rome (1303), Florence (1321)
- মধ্য ইউরোপে: Prague (1348) and Vienna (1365)
- জার্মানিতে: Heidelberg (1386), Leipzig (1409), Freiburg (1457), Tübingen (1477), Louvain (1425)
- ইংল্যান্ডে: Saint Andrews (1411) এবং Glasgow (1451)

ইউরোপে রেনেসাঁ (১৩০০-১৬০০ খ্রি:) বা নবজাগরণের আঁতুড়ঘর তো এগুলোই। রেনেসাঁ শব্দের অর্থই 'নবজন্ম'। বিদেশি খ্রিষ্টবাদ পরিহার করে ইউরোপের নিজস্বতায় (ক্ল্যাসিকাল) ফিরে যাওয়াকে বলা হচ্ছে পুনর্জন্ম। ক্ল্যাসিকাল অর্থ গ্রেকো-রোমান সভ্যতা, যা ইউরোপের নিজস্বতা, খ্রিষ্টবাদ তো ইউরোপের বাইরের জিনিস। আর সেই ক্ল্যাসিকাল আদর্শ অর্থাৎ গ্রীকদর্শনের সাথে ইউরোপ আবার পরিচিত হলো আরবদের হাত ধরে।

ইয়াহূদি পণ্ডিতরা

মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপে আত্মীকরণে ইয়াহূদি পণ্ডিতদের বিরাট কর্মযজ্ঞ রয়েছে। Freudenthal তাঁর আর্টিকেলে ৫৭১টি কিতাবের তালিকা এনেছেন, যেগুলো ১২৫০-১৩৫০ এর মাঝে ইয়াহূদি পণ্ডিতেরা ল্যাটিন (আরবি থেকে) এবং আরবি থেকে হিব্রুতে অনুবাদ করেছিল।[৭৫]

তালিকা থেকে মনে হয় দক্ষিণ ফ্রান্সে ইতালির সীমান্তে Provence-এ একটা পুরো টিম কাজ করছিল আন্দালুসের পুরো জ্ঞানবিজ্ঞানকে হিব্রুতে অনুবাদের জন্য। প্রধান কয়েকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি:

এরিস্টটলের De Anima-র উপর ইবনু রুশদের ব্যাখ্যাগ্রন্থের হিব্রু অনুবাদ

[৭৫] Freudenthal, Gad (2012). Science in Medieval Jewish Cultures || Medieval Hebrew Translations of Philosophical and Scientific Texts.

অনুবাদক	বই	বইয়ের নাম	
Judah Ibn Tibbon	৬টি	ইয়াহূদি দার্শনিকদের ধর্মতত্ত্বের বইগুলো (৬টি)	
Samuel Ibn Tibbon		ইবনু রুশদের ২টি কাজ আলি ইবনু রিদওয়ানের গ্যালেনের ভাষ্য	
Moses Ibn Tibbon	২৭টি	ইবনু রুশদের ৯টা মাইমোনিডোসের ৩টা কাজ ইমাম রাযির চিকিৎসাগ্রন্থ ৩টা বাতরিযীর এস্ট্রোনমি টলেমি-থিওডোসিয়াস-ইউক্লিডের কাজগুলোর আরবি থেকে	ফারাবির ৩টা বাতালায়াসির কাজ ইবনু সিনার ২টা হাইসামের কাজ ইবনু জাযযারের কাজ
Jacob ben Makhir Ibn Tibbon	৮টি	ইবনু হাইসাম, ইবনু সিনা, যারকালী, ইবনু সাফফার, ইউক্লিডের কাজ	
Do'eg ha' Edomi	১৭টি	গ্যালেন, হিপোক্রেটাস, আলি আব্বাস, ইবনু জাযযারসহ অন্যান্যদের কাজ (ল্যাটিন থেকে)	
Qalonymos ben Qalonymos	৩৪টি	গ্যালেনের আরবি ২টা ইবনু রুশদের ৯টা ইবনু হুদ, ইবনু সামহের কাজ	কিন্দির ৩টা ফারাবির ৩টা গ্রীকদের আরবি অনুবাদ থেকে বাকিগুলো
Zerahiah Hen	১৭টি	মাইমোনিডসের ৪টা গ্যালেন-হিপোক্রিটাস আরবি থেকে ইবনু সিনা, ইবনু রুশদের কাজ	
Samuel ben Judah of Marseilles	১৪টি	ইবনু রুশদের ৫টি গ্যালেনের আরবি ভাষ্য যারকালী, মুআযের কাজ	ইবনু ইদ্রীস, ইবনু তাহির, ইবনু তালমুসের যুক্তিবিদ্যার কাজগুলো
Natan ha-Me'ati	১০টি	হিপোক্রেটাস, মওসিলী, ইবনু জাযযার, গ্যালেনের কাজ	
Jacob Anatoli	৯টি	ইবনু রুশদের ৭টি ফারগানির এস্ট্রোনমি টলেমি ও ইউক্লিডের আরবি ব্যাখ্যা	
Judah Romano	২১টি	ল্যাটিন কাজ থেকে	
Todros Todrosi	১২টি	ইবনু রুশদের ৪টা ফারাবির ৪টা ইবনু সিনার আশ-শিফা ও আরও ২টা গাযালি, ফাখরুদ্দীন রাযির কাজ	

ঘটনা প্রবাহ

আরবদের হাত ধরে ইউরোপ পেল খ্রিষ্টবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রীক দর্শন। এককালে যে পাদরিরা গ্রীক দর্শনকে পরিহার করেছিল, তারাই এখন সোৎসাহে ইবনু রুশদ, ইবনু সিনা, ফারাবিদের বেড়ে দেওয়া এরিস্টটল চেটেপুটে সাবাড় করছে। সেই সাথে আরবদের ন্যাচারাল সায়েন্স এবং ইলমুত তাজরিবা (পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান...বিজ্ঞান) তাদের সামনে জ্ঞানের এক নতুন দুয়ার খুলে দিল। দীর্ঘ এক হাজার বছরের অবরুদ্ধ মনন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখল। এ এক জাগরণ, হাজার বছরের অন্ধকারের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা—নবজন্ম, রেনেসাঁ। মধ্যযুগের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে খ্রিষ্ট-ইউরোপ এখন প্রবেশ করছে আধুনিক যুগে। ঠিক কবে থেকে রেনেসাঁ শুরু হলো, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলছেন ১৩০০-১৬০০ পর্যন্ত, কেউ বলেন ১৩৫৮-১৬৫৮ পর্যন্ত; আবার কেউ বলছেন ১৪৫৩-১৫২৭ সময়টুকুতেই আসলে মূল জাগরণ হয়েছে। খুব সংক্ষেপে ঘটনা প্রবাহগুলো বলে যাই, যাতে বিজ্ঞানের ইতিহাসটুকু বুঝতে সহজ হয়।

ঐ যে পড়লাম, ফ্রান্সিসকান গোষ্ঠীর কথা। এদের হাত ধরে ইতালিতে চিন্তার পরিবর্তন আসছে, একে বলা হচ্ছে প্রোটো-রেনেসাঁ বা প্রাক-রেনেসাঁ। প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের বাইরে গিয়ে ফ্রান্সিসকানদের কথা ছিল, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করা। ক্যাথেড্রাল স্কুলের যাজক-পণ্ডিতদের হাতেই দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান এগোলো। সুতরাং ১৩৫০ এর ঠিক আগে ইউরোপের হাতে রয়েছে—রোমান আইনের বিস্তৃত বইপুস্তক, মেডিসিন, এরিস্টটলীয় যুক্তি ও প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, লিখন-বর্ণমালা ও লেখ্যভাষা-অলংকার এবং ল্যাটিন কবিতার ভাণ্ডার।[৭৬] এগুলো চর্চা করে আবার ওদিকে ইউনিভার্সিটিগুলোতে তৈরি হয়েছে অযাজক পণ্ডিতরা। এই সময়ের মানুষ হলেন ভবিষ্যৎ রেনেসাঁর জনক Petrarch (মৃ. ১৩৭৪ খ্রি.) আর Giovanni Boccaccio (মৃ.১৩৭৫ খ্রি.) তাদের হাত ধরে ইতালিতে শুরু হলো এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন—'হিউম্যানিজম'। Gianozzo Manetti, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Lorenzo Valla এবং Coluccio Salutati-দের মাধ্যমে গ্রীক ও রোমান মূল্যবোধগুলো পুনর্পাঠ ও চর্চা চলতে থাকে। প্রধান চেতনাগুলো ছিল:

- এই বিশ্বের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজে। মানুষের জ্ঞান, মানুষের অর্জন, মানুষের জীবনই সত্য।
- মানবতার মর্যাদা: মর্যাদা নয় বিশ্বাসের অনুতাপে (খ্রিষ্টবাদের চেতনা), বরং

[৭৬] Paul Oskar Kristeller, *Renaissance Thought*, 1961

সংগ্রাম ও প্রকৃতিকে জয় করাতেই মানুষের মর্যাদা।

➡ মনের ওপর জেঁকে বসা বিদেশি মতবাদের (খ্রিষ্টবাদ) শেকল ভেঙে মুক্তচিন্তা ও সমালোচনা।

সাহিত্য, কবিতা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই চেতনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। অনেক ইতিহাসবিদ রেনেসাঁকে ir-religion বা un-christianizing বলেছেন। ধর্মের ব্যাপারে গ্রেকো-রোমান সার্বজনীন natural religion (এক জাতীয় সর্বেশ্বরবাদ) প্রোমোটকারী আলোচনাও নিজে থেকেই চলে আসে। এই অখ্রিষ্টীয় চেতনার কিছু পটভূমি রয়েছে, এমনি এমনি আসেনি। কিছু কারণে ইউরোপ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল চার্চের ওপর—

১. একের পর এক ক্রুসেড :[৭৭]

ক্যাথলিক চার্চের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধনে ২০০ বছরের মাঝে ১০টা ক্রুসেড লড়াই হয় মুসলিম সভ্যতার বিরুদ্ধে। যা খোদ ইউরোপের জন্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। ক্রুসেডের নামে একটা ব্যাপক সামাজিক অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল। কখনও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে একের পর এক পরাজয়, কখনও আরেক ফেরকার খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ ও লুটতরাজ, কখনও শিশুদের নিয়ে বাহিনী গঠন (শিশুদের ক্রুসেড ১২১২)। এক নজরে একটু দেখে নিই চলুন:

- **১ম ক্রুসেড** : ১০৯৫-১০৯৯ (Pope Urban II এর আহ্বানে ফরাসি সেনাপতি Godfrey of Bouillon পরিচালিত, **মুসলিমরা পরাজিত**, জেরুসালেম খ্রিষ্টানবাহিনীর দখলে)
- **২য় ক্রুসেড** : ১১৪৭-১১৪৯ (ফরাসি সামন্তরাজা Bernard of Clairvaux এর আহ্বানে ফ্রান্সের রাজা ৭ম লুইস ও জার্মানীর রাজা ৩য় কনরাডের নেতৃত্বে পরিচালিত, জেরুসালেমের আশপাশ দখলের জন্য, নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহিমাহুল্লাহ)-এর হাতে **খ্রিষ্টান বাহিনীর ব্যাপক পরাজয়**) ১১৮৭ সালে সালাহুদ্দীন আইয়ূবি (রহিমাহুল্লাহ) জেরুসালেম পুনর্দখল করেন।
- **৩য় ক্রুসেড** : ১১৮৯-১১৯২ (ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড বা Richard The Lionhearted এর নেতৃত্বে জেরুসালেম পুনরুদ্ধার অভিযান, **ব্যর্থ**)
- **৪র্থ ক্রুসেড** : ১২০৩-১২০৪ (এটা **মুসলিমদের সাথে নয়**, ক্রুসেডারদের সাথে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের যুদ্ধ, বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল দখল ও লুটতরাজ)
- **৫ম ক্রুসেড** : ১২১৬-১২২১(Pope Innocent III এর আহ্বানে মিসর আক্রমণ

---

[৭৭] http://www.history.com/topics/crusades

এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ)

- ৬ষ্ঠ ক্রুসেড : ১২২৮-১২২৯ (সম্রাট Frederick II এর সাথে এক চুক্তিতে ১০ বছরের জন্য জেরুসালেম খ্রিষ্টানদের শাসনে চলে যায়, চুক্তির মেয়াদ শেষে মুসলিমরা পুনর্দখল করে নেয়)
- ৭ম ক্রুসেড : ১২৩৯-১২৪১ (Thibault IV of Champagne এর নেতৃত্বে জেরুসালেম আংশিক দখলে সমর্থ হয় খ্রিষ্টানবাহিনী, ১২৪৪ সালে আবার তা মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে যায়)
- ৮ম ক্রুসেড : ১২৪৯-১২৫০ (ফ্রান্সের রাজা Louis IX মিসরের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠান, পরাজিত হন)
- ৯ম ক্রুসেড : ১২৮৯ (মামলুক সুলতান কালাওয়ান ক্রুসেডার রাষ্ট্র ত্রিপোলি দখল করেন)
- ১০ম ও শেষ ক্রুসেড : ১২৯০-১২৯১ (ভেনিস ও আরাগন থেকে নৌবহর পাঠানো হয় শেষ ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো রক্ষার জন্য। পরের বছর মামলুক সুলতান আশরাফ খলীল শেষ খ্রিষ্টান রাষ্ট্র Acre দখল করে নেন)

২. চার্চের সাথে রাষ্ট্রশক্তির দ্বন্দ্ব:

শুরু থেকেই চার্চ চাচ্ছিল বিভিন্ন খ্রিষ্টান দেশের রাজা-জমিদারদের ওপর প্রভাব খাটাতে। আবার ওদিকে উলটো এরাও নানান ধর্মীয় বিষয়-আশয়ে প্রভাব খাটাতে চাচ্ছিল।

- রোমান সম্রাট ৪র্থ হেনরির নিযুক্ত বিশপকে বহিষ্কার করেন পোপ ৭ম গ্রেগরি। সম্রাট পোপকে সরিয়ে দিতে চান, উলটো পোপই সম্রাটকে ১০৭৬ সালে ধর্ম থেকে বহিষ্কার ঘোষণা করে। সম্রাট তাওবা করে ফেরত আসেন। ১০৮০ সালে পোপ আবার তাঁকে বহিষ্কার করেন। ১০৮৪ সালে সম্রাটই পোপকে সরিয়ে দেন। কী একটা বিদিকিচ্ছি অবস্থা।
- বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের নিয়োগ নিয়ে জার্মান সম্রাট ও পোপের মধ্যে ৫০ বছর ধরে-চলা বিবাদ শেষ হয় ১১২২ সালে Concordat of Worms এর দ্বারা।
- আর্চবিশপ নিয়োগ দেওয়া নিয়ে ইংল্যান্ডে রাজা জন ও পোপের মাঝে দ্বন্দ্ব। ৭ বছর ইউরোপকে ধর্মীয়ভাবে বয়কটে (interdict) রাখা। ১২১৫ সালে ম্যাগনাকার্টা দলীলের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে চার্চ-রাষ্ট্র সম্পর্ক সীমিত করা হয়।
- পোপ বোনিফেস দাবি করে বসেন: নাজাতের জন্য প্রত্যেককে রোমান চার্চের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। আধ্যাত্মিক প্রধানের পাশাপাশি পোপ পার্থিব বিষয়াদিরও প্রধান। এ নিয়ে ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ ফিলিপের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষে ফিলিপ ১৩০৩ পোপকে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করে।
- ইউরোপ সাধে কি সেক্যুলারিজমের দিকে ঝুঁকেছে? মানবরচিত খ্রিষ্টবাদের সাথে

ইউরোপের হাজার বছরের সংসার। মোটামুটি ১৩৫০ সালের আগে এসব ঘটনা এবং গ্রীক-মুসলিম জ্ঞান-দর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত-চিন্তক অ-যাজক সম্প্রদায় গড়ে ওঠা ইউরোপে নবজন্মের একটা পটভূমি দাঁড় করায় ১৪ শতকের শুরুতে।

অর্থাৎ রেনেসাঁর আগের বছরগুলোতে চার্চের ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েই কিছুটা বিরক্ত। চার্চের এই বাগপাশ থেকে মুক্তির আকুতি ছিল এই রেনেসাঁ। ১৪শ শতাব্দীর শুরুতে আরও কিছু বিষয় এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে বেগবান করে—

১. বুবোনিক প্লেগ

১৩৪৭-১৩৫২ সালের বুবোনিক প্লেগ মহামারি শুরু হয়। ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া মিলে মারা যায় বহু মানুষ, কেউ বলে ৭ কোটি, কেউ বলেন ২০ কোটি। পোপতন্ত্রের ক্ষমতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ জন্মে, এদের দিয়ে না রোগ থামছে, আর না মৃত্যু। আবার হম্বিতম্বি কিন্তু থেমে নেই।

২. Western Schism

১৩৭৮ থেকে ১৪১৭ সাল পর্যন্ত চলে আরেক নাটক। ৩ জন ব্যক্তি নিজেকে 'আসল পোপ' দাবি করতে থাকে। ১৪২৯ সাল পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে থাকে ক্যাথলিক চার্চ।

৩. শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

১৩৩৭-১৪৫৩ সালব্যাপী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে চলতে থাকে যুদ্ধ। জমিদারতন্ত্র আর পোপতন্ত্রের যাঁতাকলে ইউরোপের আসলেই শোচনীয় দশা।

১৫শ শতকে রেনেসাঁ আরও বেগবান হয়—

১. ছাপাখানা আবিষ্কার

১৪৩৬ সালের দিকে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন ছাপাখানা। যার ফলে রেনেসাঁর চেতনা ছড়িয়ে যায়। নাটক-সাহিত্য-কবিতা-চিত্রকর্মের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করে। বাইবেলের ব্যাপক মুদ্রণের ফলে হাতে হাতে পৌঁছে যায়। একসময় চার্চই বাইবেল ব্যাখ্যার অধিকার রাখত। এখন সবাই নিজ মত প্রকাশে লেগে গেল। যাকে পরবর্তীতে আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন হিসেবে দেখব।

২. কনস্টান্টিনোপলের পতন

১৪৫৩ সালে উসমানি খলীফা মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে পতন ঘটে খ্রিষ্টবাদের অন্যতম ঘাঁটি কনস্টান্টিনোপলের। এর ওপর আবার এসব এলাকা থেকে অনেক গ্রীক

পণ্ডিত ইতালি চলে আসেন, যাদের হাত ধরে আসে হারিয়ে যাওয়া গ্রীক-রোমান রচনা। ইতালিতে গ্রীক ভাষা, মূল গ্রিক বাইবেল চর্চা, রোমান দার্শনিকদের (Cicero, Lucretius, Livy, Seneca) দর্শনচর্চা বেড়ে চলে। ফ্লোরেন্সে আবার গড়ে ওঠে সেই নিও-প্লেটোনিক স্কুল।

১৬শ শতকে রেনেসাঁ (১৫০০-১৫৯৯)

আগের শতকের শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে মুসলিমদের সম্পূর্ণ বিতাড়ন করা হয়েছে। ১৪৯৪ সালে গ্রানাডার পতনের মাধ্যমে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে এসেছেন। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা আবিষ্কার করেছেন ভারতে আসার জলপথ।

প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে এই শতকে ইউরোপে। উপনিবেশায়ন শুরু হচ্ছে। স্রোতের মতো সম্পদ এসে জমা হচ্ছে। পুঁজিবাদের জন্ম ও শৈশব বলা যায় এই শতাব্দীকে।

এই শতকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেন: পলিম্যাথ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (মৃ. ১৫১৯ খ্রি.), জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (মৃ. ১৫৪৩ খ্রি.), দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তক ম্যাকিয়াভেলি (মৃ. ১৫২৭ খ্রি.)। ইতিহাসবেত্তা Will Durant-এর মতে, কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ (পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে) ছিল খ্রিষ্টবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাধ্য হয়ে কোপার্নিকাস নিজের ভুলের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে মতের পরিমার্জন করে সে যাত্রা রক্ষা পান।

বাকি ইতিহাস এক নজরে

১৭শ শতকের ইউরোপে শুরু হয় 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব'। যদিও হার্ভার্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ Steven Shapin তাঁর *The Scientific Revolution* গ্রন্থের ভূমিকাতেই বলেছেন:

> “There was no such thing as the Scientic Revolution... Many historians are now no longer satised that there was any singular and discrete event, localized in time and space, that can be pointed to as the Scientic Revolution.

অর্থাৎ, *'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বলে আদতে কিছু ঘটেনি...অনেক ঐতিহাসিক এখন আর মনে করেন না যে, 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' নামে একক ও বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে বা স্থানে ঘটেছিল।'*[৭৮]

[৭৮] Steven Shapin, The Scientific Revolution, University of Chicago Press 1996, p1-3

মানে হলো, বিজ্ঞানের যে একচেটিয়া ডিলারশীপ ইউরোপ দাবি করে, তা বিলকুল গলদ। প্রাচীন মিশরীয় ও ভারতীয় সভ্যতায় প্রকৃতিবিজ্ঞানে চর্চা ছিল। যা পূর্ণতা, উন্নতি, সুবিস্তৃতি লাভ করেছে মুসলিমদের হাতে। সেই বিজ্ঞানই ইউরোপ পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে এবং এগিয়ে নিয়েছে। এখানে কারও একচ্ছত্র ঠিকাদারি নেই যে, আমি না করলে কোথায় পেতে?

যদি বলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা, তার সৃষ্টি মুসলিমদের হাতে—

- ➡ ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট: জাবির ইবনু হাইয়্যানের তাজরিবা
- ➡ আগের সিদ্ধান্তের সাথে পরের রেজাল্ট মিলিয়ে নেওয়া: ইবনু হাইসামের ই'তিবার
- ➡ বার বার পরীক্ষা করে ত্রুটি দূর করা (reproducing the hypothesis): আল-বিরুনি
- ➡ তুলনা করার জন্য আলাদা কন্ট্রোল গ্রুপ রাখা: ইমাম রাযি
- ➡ ওষুধের ডোজ মাপা: কিন্দি
- ➡ এক্সপেরিমেন্টে আরোহ পদ্ধতির ব্যবহার: ইবনু সিনা

গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভাষা। সেই ভাষাও মুসলিমদের হাতে গড়া—

- ➡ বীজগণিত, লগারিদম: খাওয়ারিজমী
- ➡ ত্রিকোণমিতি: মারওয়াযি
- ➡ শূন্য: একটা মত অনুসারে আরবরাই শূন্যের উদ্ভাবক। [৭৯]
- ➡ ক্যালকুলাস: খাওয়ারিজমীর 'হিসাব আল-খাতা'আইন' (calculus of two errors) আধুনিক ক্যালকুলাসের derivation-এর কাছাকাছি।
- ➡ চলমান জ্যামিতিক চিত্রের হিসাব (গতিবিদ্যা): বানূ মূসা
- ➡ স্থিতিবিদ্যা: সাবিত ইবনু কুররাকে জনক বলা হয়।

ইউরোপের হাতে যা বদলেছে, তা হলো বিজ্ঞানের দর্শন। কী থেকে কী হয়ে গেল বিজ্ঞান, শুনবেন? শোনেন সেই কাহিনি। বিজ্ঞানের ইউরোপীয় ভার্সনের পুরোধা হলেন ৩ জন—ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্ত ও গ্যালিলিও। বেকন ও দেকার্ত বললেন:

> 'বস্তুগত দুনিয়া কীভাবে কাজ করে (law of nature), সেটা জেনে ফেললেই আমরা প্রকৃতির মালিক ও প্রভু বনে যাবো (possessor and master of nature).'[৮০]

যদিও ঠিক সেটাই হয়েছে, কৃষিতে রাজত্ব করে মানুষ ক্ষুধাকে জয় করেছে, চিকিৎসায় উন্নতি করে রোগকে জয় করেছে, শিল্প-প্রযুক্তিতে ব্যবহার জীবনমানকে নিয়ে গেছে

---

[৭৯] প্রাচ্যবিদ Bernard Carra de Vaux, ঐতিহাসিক স্মিথ ও কারপিনস্কি এই মত লালন করেন। তবে সংখ্যা হিসেবে এর বহুল ব্যবহার আরবদের হাতে, এতে সন্দেহ নেই। আরবদের হয়েই ইউরোপে গেছে। ইউরোপে প্রচলিত রোমান সংখ্যায় শূন্য ছিল না।

[৮০] Rene Descartes, Discourse on Method

আশ্চর্য এক পর্যায়ে। কিন্তু এর ফলে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে প্রকৃতিকে। আগের শতকে জন্ম নেওয়া নতুন অর্থনীতি পুঁজিবাদের হাতে পড়েছে বিজ্ঞান। যার খেসারত হিসেবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, পরমাণু বোমা ও নিত্যনতুন মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা, পরিবেশ দূষণ, রোগব্যাধির আধিক্য থেকে নিয়ে হাজারো সমস্যার জন্ম হয়েছে এবং হচ্ছে। পুঁজিবাদ ও বিজ্ঞানের এই মানিকজোড় নিয়ে আলাপ অন্যদিনের জন্য তোলা থাক। শুধু লর্ড মেকোলের [৮১] কথাটুকু শুনে রাখি। তিনি লিখেছেন:

> ‘ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যান্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ।...শিল্পবিপ্লব, যার ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা কোনো লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা না হলে স্টীম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের।’

উপনিবেশের সম্পদের প্রবাহে বিজ্ঞানকে পেলেপুষে আজকের পর্যায়ে এনেছে ইউরোপ। ব্রিটেনের সকল যুদ্ধব্যয়, সকল বিজ্ঞানের ফান্ডিং, সকল প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণের পুঁজি সরবরাহ করেছে ভারত। ভারতকে নিংড়ে ব্রিটেন আজ বিজ্ঞান-দর্পী। একই ইতিহাস সবগুলো ইউরোপীয় শক্তির ক্ষেত্রেই খাটে। পর্তুগাল ব্রাজিলে, স্পেন বাকি ল্যাটিন আমেরিকায়, ফ্রান্স পূর্ব-উত্তর আফ্রিকায়, ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায়, ইটালি লিবিয়াতে একই কাজ করেছে। বিজ্ঞান গবেষণার পিছনে বিপুল অর্থ তারা ঢালতে পেরেছে উপনিবেশিক আমলে লুটপাট থেকে। সামরিক আগ্রাসনের বদৌলতে। আজকের বিজ্ঞানমুগ্ধ দুনিয়া ইতিহাস ছাড়াই বিজ্ঞান পাঠ করে, যা প্রকারান্তরে আত্মপ্রতারণা।

১৮শ শতকের মূল ঘটনা হলো উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বাণিজ্যিকীকরণ। ১৯ শতকে এসে অগাস্ট কোঁৎ-এর হাত ধরে জন্ম নিল—'পজিটিভিজম'। যার সারকথা হলো: যা ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝা যাবে, তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য তথ্য। অতীন্দ্রিয় বা মেটাফিজিক্যাল কোনোকিছু গ্রহণযোগ্যই না। তাঁর law of three stage অনুসারে, জ্ঞানের প্রতিটি শাখা ৩টি স্তর অতিক্রম করে। প্রথমে থাকে কল্পনা বা ধর্মীয় ব্যাখ্যার স্তরে, এরপর আসে মেটাফিজিক্যাল বা যুক্তির স্তরে, এরপর আসে বৈজ্ঞানিক বা পজিটিভ স্তরে। তিনি বিশ্বাস করতেন: মানুষের জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে একসময় ধর্ম হারিয়ে যাবে; দর্শন ও অপরাপর মানবিক জ্ঞান ক্রমেই বস্তুবাদী হয়ে উঠবে; এবং পুরো মানবজ্ঞানই বিজ্ঞানের অধীনে চলে আসবে।

[৮১] Unhappy India, Lala Lajpat Rai, 1928

বিজ্ঞানীদের কাজ হবে দুটো—

১.এটা দেখানো যে, সকল ঘটনা (মানুষের আচার-আচরণও) অপরিবর্তনশীল কোনো-না-কোনো 'প্রকৃতির নিয়ম'-এর অধীন।

২. প্রকৃতির নিয়মগুলোকে সংক্ষিপ্ত সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা এবং শেষমেশ ফিজিক্সের ল'-এর অধীনে একীভূত করে দেওয়া।

বিংশ শতকে এসে পজিটিভিজম আরেকটু চাঁছা-ছোলা হলো, নাম হলো 'লজিক্যাল পজিটিভিজম। Vienna circle গোষ্ঠী বলল: ২ ধরনের কথার অর্থ হয়—যুক্তি-বিশ্লেষণ (analytical statement) আর পর্যবেক্ষণলব্ধ (empirical statement); এই ছকের বাইরে বাকি সব অনর্থক। তাদের কথা হলো, বিজ্ঞান পুরোপুরি সত্যের ওপর দাঁড়ানো, বিজ্ঞানই জ্ঞানের অবিসংবাদিত ভিত্তি। অনেক ফরাসি দার্শনিক এ দাবিও করেছেন যে, বিজ্ঞান-ই ধর্মের বিকল্প। এমনকি ফরাসি বিপ্লবের সময় বহু ক্যাথলিক চার্চকে আধা-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'যুক্তির মন্দির' বানানো হয়েছিল। [৮২]

সমস্যা ২: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ-পশ্চিমা বিজ্ঞানের রেললাইন
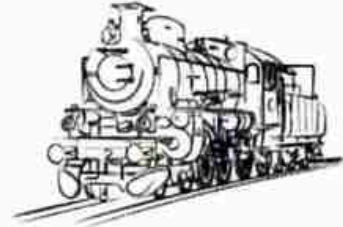
সমস্যাটা কোথায় বোঝা যাচ্ছে তো? সিদ্ধান্ত দেবার সময় 'পশ্চিমা বিজ্ঞান' একটা দর্শন ফলো করে—পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ। [৮৩] মূল 'প্রকৃতিবাদ' বিষয়টার স্পষ্ট ডেফিনেশন পাওয়া যায় না। কেন সেটা আলোচনাটার শেষে বলছি। আগে এর দুটো ধারা জেনে নিই।

১. দার্শনিক প্রকৃতিবাদ (philosophical/ ontological naturalism)

২. পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ (methodological naturalism)

---

[৮২] Ozouf, mona [1988]. Festivals and the French revolution. Harvard university press.

[৮৩] বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ হচ্ছে এরকম একটা দর্শন যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাই প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই সরাসরি বা ইনডিরেক্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, এমনকি মনোজগৎও। এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।[ব্রিটানিকা]

দার্শনিক প্রকৃতিবাদ হলো এই বিশ্বাস যে—

- প্রকৃতিই সবকিছু। প্রকৃতি একমাত্র বাস্তবতা। এর বাইরে কিছু নেই। এই বস্তুগত দুনিয়াই একমাত্র বাস্তব জগৎ। একে জানা বা ব্যাখ্যা করার জন্য অ-প্রাকৃতিক কিছুর প্রয়োজন নেই।
- মহাবিশ্বের সবকিছুই প্রাকৃতিক (natural) বা বস্তুগত। অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই।
- বস্তুই সত্য, বস্তুই পরম বাস্তব। সকল অবস্তু (আত্মা, মন ইত্যাদি) অবাস্তব।
- সবকিছু প্রকৃতি থেকে আসে, আবার প্রকৃতিতেই ফিরে যায়।

আর পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ হলো—

- আমাদের চারপাশে যা ঘটে তার বস্তুগত বা জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট।
- প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় অ-প্রাকৃতিক কিছু টেনে আনা যাবে না। অ-প্রাকৃতিক কিছুর ব্যাপারে আমরা নীরব।

এখানে দুটোর পার্থক্য খুব বোঝার আছে। নয়তো, যারা দুটোকে এক করে আরেক ধর্ম বানিয়ে ফেলেছে, আমরাও একই ভুল করব। বিজ্ঞানের প্রতি না-ইনসাফি হয়ে যাবে।

দার্শনিক প্রকৃতিবাদ	পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ
১. ব্যবহার করে 'নাস্তিকতা'।	১. ব্যবহার করে 'বিজ্ঞান'।
২. অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই।	২. আছে না নেই জানি না। আমি অতিপ্রাকৃতিক কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা দেবো না, জাগতিক ব্যাখ্যাটাই বের করার চেষ্টা করব।
৩. অতিপ্রাকৃতিক সবকিছু কুসংস্কার, অবাস্তব।	৩. আমার কাজই জাগতিক নিয়ে। অতএব আমি অতিপ্রাকৃতিক নিয়ে কোনো মন্তব্যই করব না। প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে ধর্ম ঠিক না বেঠিক, এটা সিদ্ধান্ত দেবার দরকার পড়ে না।

সুতরাং দুটোর ভেতর একটা পার্থক্য কিন্তু বোঝা যায়। বিজ্ঞান যে দর্শন ফলো করে, তা স্রষ্টা-ধর্ম-আত্মা ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত বিষয়কে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'র ভেতর আনে না, আনার প্রয়োজন মনে করে না। আবার এগুলোকে অস্বীকারও করে না, যেমনটা করে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ। ফলে ধার্মিক ও নাস্তিক দুজনেই 'বিজ্ঞান' চর্চা করতে পারে (Draper, 2005)। স্রষ্টা আছে কি নেই, ধর্ম ঠিক না ভুল—এসব সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিজ্ঞান নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। আধুনিক বিজ্ঞান, মাইন্ড ইট।

এখন ধর্মবিশ্বাসী আর নাস্তিক—দুটো গ্রুপই এই দুটো বিষয়কে গুলিয়ে ফেলি আমরা। নাস্তিকরা মনে করে বিজ্ঞান তাদের 'দার্শনিক প্রকৃতিবাদ' সাপোর্ট করে। বিজ্ঞান তাদের 'সহমত ভাই', যেটা পুরোপুরি ভুল। তারা দুটোকে মিলিয়ে ভাবে, যেহেতু প্রকৃতিই সব, আর এর বাইরেও কিছু নেই। আর বিজ্ঞান প্রকৃতি নিয়েই কাজ করে। অতএব, বিজ্ঞান ছাড়া আর কোনো উপায়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব না, আর সব কুসংস্কার। অতএব ধর্মীয় জ্ঞান মিথ্যা। তাদের 'দার্শনিক প্রকৃতিবাদ ধর্মবিশ্বাস'-এর সাথে বিজ্ঞানকে নিজ সম্পত্তি দাবি করে একটা অন্ধবিশ্বাস দাঁড় করিয়েছে। দুটোকে মিলিয়ে আরেকটা ধর্ম তারা তৈরি করেছে যার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' (scientism)। এটা নিয়ে সামনে 'সমস্যা ৩'-এ আলোচনা করছি।

আর আমরা ধার্মিকরা দুই গ্রুপ হয়েছি। দুই গ্রুপই ওদের দাবি মেনে নিচ্ছি। একগ্রুপ ভাবছি, বিজ্ঞান ওদেরই সম্পত্তি। বিজ্ঞান মানেই নাস্তিকতা। আরেক গ্রুপ ভাবছি, বিজ্ঞানই নিশ্চিত ও বাস্তব জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম। অতএব, কুরআন-হাদীসকে অবশ্যই এই বাস্তব জ্ঞানের পক্ষে থাকতে হবে। কুরআন-হাদীসকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে উতরে আসতে হবে, বা ইসলামের প্রতিটি বিধান 'বৈজ্ঞানিকভাবে' প্রমাণিত হতে হবে, বা হবেই হবে। আমরা দুই গ্রুপই নাস্তিকদের একচেটিয়া দাবির সাথে একমত হয়ে যাচ্ছি।

আধুনিক বিজ্ঞান রেলগাড়ির মতো, রেললাইন ছাড়া চলতে পারবে না। রাস্তাটা বুঝতে হবে। সব তথ্যপ্রমাণ যদি অতিপ্রাকৃত কিছুর দিকে ইঙ্গিত করেও, তবু বিজ্ঞান সেটা স্বীকার করতে পারবে না। যেমনটি Kansas State University-র ইমিউনোলজিস্ট Dr Scott Todd বলেছেন:

> 'জরুরি হলো, ক্লাসরুমে এটা ক্লিয়ার করে দেওয়া যে, বিজ্ঞান (বিবর্তনবাদসহ) সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বাতিল করতে পারে না, কেননা তার তো এ সম্পর্কে ভাবনারই সুযোগ নেই। যদি সকল তথ্য-উপাত্ত কোনো এক বুদ্ধিমান শিল্পীর দিকে ইঙ্গিতও করে, তবু এই ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের বাইরেই রাখা হবে, যেহেতু এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী নয়।'[৮৮]

হয় প্রাকৃতিক একটা সম্ভাবনার কথা বলবে, নয়তো চুপ করে থাকবে। কারণ বিজ্ঞান এটা শুরুতেই ঠিক করে নিয়েছে রেললাইন হিসেবে, নিজের মূলনীতি হিসেবে যে—'প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রকৃতি দিয়ে দেবো, এর বাইরে কিছু স্বীকারও করব না, অস্বীকারও করব না'। চাই সে ব্যাখ্যা যতই হাস্যকর শোনাক। আমেরিকান evolutionary

[৮৮] Todd, S.C., correspondence to Nature 401(6752):423, 30 Sept. 1999.

biologist ও জিনবিজ্ঞানী Richard Lewontin-এর সরল স্বীকারোক্তি:

> “ ‘আমরা সর্বদা বিজ্ঞানের পক্ষ নিই, যদিও বিজ্ঞানের কিছু কিছু দাবি হাস্যকর; যদিও বিজ্ঞানীমহল মেনে নিয়েছেন কিছু ছেলেভুলানো গালগল্প, যার প্রমাণ নেই। কারণ আমরা আগে থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রকৃতিবাদের কাছে। ব্যাপারটা এমন না যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কোনোভাবে বাধ্য করে জাগতিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে। বরং আগে থেকেই (*a priori* adherence) বস্তুগত কারণ খোঁজার ওয়াদা আমাদেরকে ঠেলে দেয় এমন কিছু উপকরণ ও ধারণা তৈরির দিকে– যা শুধু বস্তুগত ব্যাখ্যাই উৎপাদন করবে। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হোক, আমজনতার কাছে যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক। আর যেহেতু আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেবো না, সুতরাং বস্তুবাদ-ই শেষকথা।’[৮৫]

যেহেতু কেন্দ্রেই রয়েছে ‘স্রষ্টা বলে কিছুর অস্তিত্ব বোঝা গেলেও স্বীকার করা যাবে না’, সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এমন দর্শন জোড়া হয়েছে, যার সাথে মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞানের গোড়াতেই সংঘর্ষ। কে মুক্তমনা আর কে বদ্ধমনা, বোঝা যাচ্ছে তো? বিজ্ঞানের কাজ ‘চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছানো’ নয়। এর কাজ সব ঘটনার একটা দুনিয়াবি ব্যাখ্যা দেওয়া, যা দ্বারা ঘটনাটাকে বোঝা যায়। যদি কেউ এই বিজ্ঞানের দ্বারা চূড়ান্ত সত্যে যেতে চায়, তাকে আগেই বিশ্বাস করতে হবে ‘এই বস্তুগত জগতের বাইরে কোনো সত্য থাকতে পারে না’। এই অন্ধবিশ্বাস আগে করে নিয়ে এরপর বিজ্ঞানের ফলাফলকে সে চূড়ান্ত সত্য ভাবতে পারে। সুতরাং বর্তমান পশ্চিমা বিজ্ঞান চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছোবার রাস্তা নয়।

সমস্যা ৩: বিজ্ঞানবাদ

এই অংশটা আমাদের খুব বুঝে পড়ার দরকার আছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের। আমরা বিজ্ঞান পড়ি, কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখি না, শুধু পড়েই চলি।

বিজ্ঞান কী আর বিজ্ঞানবাদ কী? King's University College-এর মনোবিজ্ঞানের প্রোফেসর Imants Baruŝs-এর মতে:

বিজ্ঞান	বিজ্ঞানবাদ
open-ended exploration of reality, based on logical thinking about empirical observations. বাস্তবতার অনুসন্ধানে অন্তহীন যাত্রা, যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের ওপর যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাভাবনা।	বাস্তবতার 'বস্তুবাদী ভার্সন'টার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা, যা অনুসন্ধানকে আটকে দেয় কেবল ঐ সকল বিষয়ের ভেতরেই যেগুলো বস্তুবাদ অনুমোদন করে।

[৮৫] Richard C. Lewontin (1997), Billions and Billions of Demons (a review of Carl sagan's *The Demon-Haunted World*), The New York Review

বিজ্ঞান হলো একটা চলমান অনুসন্ধানী কার্যক্রম, বিজ্ঞানবাদ হলো একটা দার্শনিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি (worldview)। গবেষণা করার মতো প্রকৃতিতে অনেক কিছু থাকলেও, বিজ্ঞানবাদের মূল কার্যক্রম 'মানুষের বিশ্বাস ও আচরণ' নিয়ে। স্পষ্ট সীমা ও পদ্ধতি নিয়ে কাজ করার বদলে, সে পুরো ক্ষেত্রটাকে অস্পষ্ট করে ফেলে, জ্ঞানের আর সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে। যার দরুন আপনি এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রায়ই শুনবেন: শুধুমাত্র, কেবলমাত্র, স্রেফ, কেবল এটাই—শব্দ সহযোগে। এই দর্শনগত অবস্থান 'বিজ্ঞানবাদিতা' নিজেই বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইযোগ্য না, সুতরাং এটা নিজেই অবৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞান দার্শনিক Susan Haack বিজ্ঞানবাদের কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেছেন।[৮৬] চলুন দেখে আসা যাক। সাথে একটি করে উদাহরণ দিলে কেমন হয়?

In the name of Science, most Authentic, most Truthful

- প্রথমতঃ 'বিজ্ঞান' ও 'বৈজ্ঞানিক' শব্দগুলো যখন প্রশংসাসূচক ও সম্মানজনক কিছু বোঝাতে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হবে। 'বিজ্ঞান' শব্দটা শুনলেই হয়েছে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানের মোড়কে যাই দেওয়া হবে সব বিনাপ্রশ্নে মেনে নেবে। যেমন ধরুন জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখকের বইয়ে আছে:

> ‘মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায়, যদি ভরসা না করে, তাহলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার ওপর ভরসা করবে?’ [ড. জাফর ইকবাল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, পৃ ৪৯]

- দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও টার্মগুলো দরকার হোক বা না হোক, উপকার থাক বা না থাক, দেদারসে ব্যবহার করবে।

- তৃতীয়তঃ এই রোগে আক্রান্ত লোকেরা বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের পার্থক্য করা নিয়ে খ্যাপাটে-রকম বাতিকগ্রস্ত। কথায় কথায় 'অপবিজ্ঞান' 'কুবিজ্ঞান' শব্দগুলো প্রয়োগ করবে।
- চতুর্থতঃ একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই বিজ্ঞান-অবিজ্ঞানের পার্থক্যকারী ঠাওরানো। যেন বিজ্ঞানের ছাড়পত্র না পেলে ও কোনো জ্ঞানই না। পদার্থবিদ Ian Hutchinson-এর মতে, বিজ্ঞানবাদ হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানকেই সত্য জ্ঞানের একমাত্র

[৮৬] Massimo Pigliucci [Professor of Philosophy at the City College of New York], The Problem with Scientism, The Blog of the American Philosophical Association (APA), January 25, 2018

উৎস ভাবা। যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন:

> 'যা জ্ঞান অর্জন সম্ভব, তা কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই করতে হবে। বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারবে না, মানুষ তা কখনও জানতে পারবে না।' [An Introduction to Philosophy of Science]

- পঞ্চমতঃ বিজ্ঞানের আওতার বাইরে, এমন সব প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানকে টেনে আনা। বেস্টসেলার বই 'হোমো-স্যাপিয়েন্স'-এ ইউভাল হারারি দাবি করেন:

> 'মানুষকে যেমন কখনও সৃষ্টি করা হয়নি, ঠিক তেমনি জীববিজ্ঞানের মতে কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, যে কি না মানুষকে কোনো আলাদা সম্মান দিয়ে বানিয়েছে।' [স্যাপিয়েন্স, পৃ ১২৩]

- ষষ্ঠতঃ বিজ্ঞান-বহির্ভূত যত কার্যক্রম, সবকিছুকে হেয় করা, অদরকারি সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা। দার্শনিক Tom Sorell-এর মতে বিজ্ঞানবাদ হলো প্রকৃতিবিজ্ঞানকে অতিমূল্যায়ন এবং জ্ঞান-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাকে ছোটো করা। দেখুন:

> 'শুধু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাই পারবেন আমাদেরকে সত্যিকারের পৃথিবী উপহার দিতে।' [আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ ১৩]

> 'অনেক বইতে সত্যিকথা লেখা থাকে, আবার অনেক বইতে মিথ্যা কথা লেখা থাকে। যেগুলোতে সত্যিকথা লেখা থাকে সেগুলোর পণ্ডিতি নাম হলো 'বৈজ্ঞানিক বই'।' [দেবীপ্রসাদ, যে গল্পের শেষ নেই]

এই বাতিকগ্রস্ততার শুরুও কিন্তু আজকে না। ১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর জন্ম। তখন থেকেই একদল মানুষ ভাবতে থাকেন, নতুন বিজ্ঞান এক বিশ্বদর্শন এনে দেবে, যা ধর্মের বিকল্প হয়ে উঠবে একদিন।[৮৭] পজিটিভিজমের হাত ধরে এর পথচলা। এতক্ষণের আলোচনা যদি স্মরণ করি, দেখুন ইসলামের গর্ভে বিজ্ঞানের জন্ম। ইউরোপকে বিজ্ঞান সম্প্রদান করা হয়েছেও ধর্মেরই হাতে, ক্যাথলিক যাজক-পাদরিরাই তাকে গ্রহণ করেছে। আজ সেই বিজ্ঞানকে বস্তুবাদী ধর্মহীনতা ক্লেইম করছে। বিজ্ঞানের আওতা-বহির্ভূত অতিপ্রত্যাশা এবং বিজ্ঞানের নামে অন্যান্য জ্ঞানকে লাঞ্ছিত করা খোদ বিজ্ঞানের জন্যই ক্ষতিকর। যেমন ক্ষতিকর রাজার জন্য তৈলবাজ চাটুকার মোসাহেবরা। পদার্থবিদ Ian Hutchinson বলেছেন:

> 'বিজ্ঞানবাদ দিয়ে বিজ্ঞানের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হচ্ছে। কমপক্ষে যে ক্ষতিটা বিজ্ঞানবাদ করছে তা হলো, নিজের বেয়াদবি আর উপহাসের বিনিময়ে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক মহল থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। আর নাম খারাপ হচ্ছে বিজ্ঞানের। এঁরা আসলে বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করছেন তা না। বরং প্রত্যাখ্যান করছেন বিজ্ঞানের ঘাড়ে জুড়ে বসা এক বিশ্বদর্শনকে—যার নাম বিজ্ঞানবাদ।'[৮৮]

---

[৮৭] *Pensees* no.72, Pascal's reaction against it.

[৮৮] Hutchinson, Ian. Monopolizing Knowledge: A Scientist Refutes Religion-Denying,

সমস্যা ৪: পুতুলনাচ
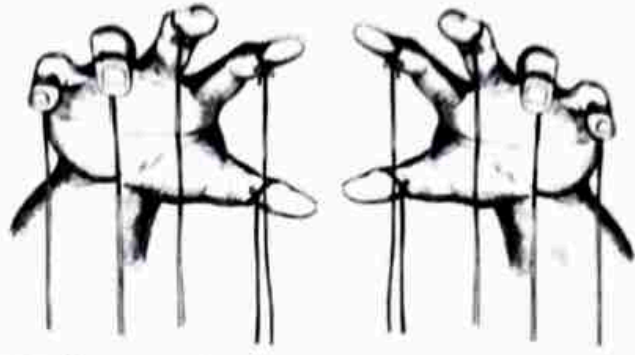
বিজ্ঞান এই সমাজেরই অংশ, সমাজের বাইরে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানও একটা সামাজিক জ্ঞান। সুতরাং এই পশ্চিমা বিজ্ঞান পশ্চিমা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমা কৃত্রিম অ-ফিতরাতি সমাজ-ধারণার বাইরে যায় এমন কোনো গবেষণা, এমন কোনো ফলাফল তারা এলাউ করবে না, যা তাদের সংস্কৃতিকে, তাদের চিন্তাজগৎকে, তাদের অনুভূতিকে আঘাত করে। এমন কোনো রিসার্চ ফান্ডিং পাবে না, জার্নালে আসবে না, পিয়ার রিভিউয়ে টিকবে না, একাডেমিয়ায় ঝড় উঠবে, পশ্চাদপদ-সেকেলে বলে তাকে ডাউন করে দেওয়া হবে। দারুণ একটা কথা বলেছেন City College of NewYork-এর দর্শনের অধ্যাপক Massimo Pigliucci. তিনি বলেন—

> ‘বিজ্ঞান হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক আর সামাজিক প্রচলনের এক বিশেষ পরিপূরণ। পিয়ার রিভিউ নামক কমবেশি ফাঁকফোকরযুক্ত সিস্টেম, ফান্ড মঞ্জুরি এজেন্সি, জার্নালে প্রকাশ, অন্যকে পয়সা দিয়ে দিয়ে কাজ করানো ইত্যাদিসহ-ই একটা প্যাকেজ হলো ‘বিজ্ঞান’। এটা এরিস্টটল বা গ্যালিলিওর বিজ্ঞান থেকে একদম আলাদা। যদিও আধুনিক ধ্বজাধারীদের সাথে ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষদের একটা নিরবিচ্ছিন্নতা তো আছে অবশ্যই।’[৮৯]

আমরা গুটিকয়েক উদাহরণ দেখে নিই চলুন—

ক.

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। Marina Del Rey Marriott Hotel-এ চলছে NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality)-এর কনফারেন্স। প্রায় শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে American Psychological Association (APA)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D. উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য।[৯০]

- সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
- APA তখনই কোনো রিসার্চ পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে।

Reason-Destroying Scientism. Belmont, MA: Fias Publishing, 2011.

[৮৯] Massimo Pigliucci (January 25, 2018). The Problem with Scientism. Blog of the American Philosophical Association (APA)

[৯০] Psych Association Loses Credibility, Say Insiders. Dr. Joseph Nicolosi website.

সম্ভাব্য যে ফলাফল পক্ষে আসবে, তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেওয়া হয়।

- যখন Cummings সাহেব ও আরেক মনোবিদ Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন *Destructive Trends in Mental Health* নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'Gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।
- সমকাম কর্মীদের এজেন্ডার অমত করলেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয় এ কথা বলে যে—'সমকামীদের বিরোধিতা মানে কাপুরুষতা'।
- Cummings সাহেব তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলেন: তৎকালীন APA-র প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার ছিলেন লেসবিয়ান, আমার বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছিলেন, কথাই বলতে দেননি এ কথা বলে যে, আপনি স্ট্রেইট পুরুষ আর আমি লেসবিয়ান নারী। আপনার সাথে আমি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারব না। অথচ পুরো হলের কেউ কোনো কথাই বলল না। এই নারী APA-এর একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বহু অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। পাঠক, তাহলেই বোঝেন কী গবেষণা হয়।
- APA সমকামীদের মনোচিকিৎসা করে তাদের স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরিয়ে আনাকে 'অনৈতিক' ঘোষণা করার দ্বারপ্রান্তে। তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা কি একমুখেই চলবে?

খ.

আরেকজন মনোচিকিৎসক Jeffrey Satinover, M.D. একই অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সমকাম কর্মীদের দ্বারা মানসিক-স্বাস্থ্য সংগঠনগুলো ইউজড হচ্ছে। এরা রিসার্চের রেজাল্টকে নিজেদের স্বার্থে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের এই বিকৃতি এতই ব্যাপক, যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি আরও বলেন, দেখেন, কারা APA-এর প্রতিনিধিত্ব করে। সমকাম মনোবিদ Gregory Herek, Ph.D. লেখেন বিখ্যাত Romer v. Evans কেসের ব্রিফিং APA-এর পক্ষে। আমেরিকার 'জেন্ডার পরিচয়' আইনে এই কেস অন্যতম ভিত্তি। তিনি সেখানে জেন্ডার পরিচয় এক্সপার্ট হিসেবে দুজনের নাম বলেন।

১. John Money, Ph.D. যিনি ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাৎকার দেন: বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে।[৯১] তিনি আরও বলেন :

---

[৯১] 'If it [man-boy sexual contact] is consensual, it can be constructive'.
https://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders

❝ 'আমাকে যদি এমন ঘটনা দেখানো হয়, যেখানে ১০/১১ বছরের বালক ২০/৩০ বছরের পুরুষের প্রতি যৌন-আকর্ষণ বোধ করছে, আর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, সম্পূর্ণ মিউচুয়ালি; তাহলে আমি একে কোনোভাবেই অস্বাভাবিক বলব না।'[৯২]

২. John de Cecco, Ph.D. শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-র একজন সম্পাদক। এবং Journal of Homosexuality-তে বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস (man-boy sexual contact)-কে আখ্যায়িত করেন 'দুই প্রজন্মের কাছে আসা' হিসেবে।

পাঠক, এঁরা আমাদের জন্য বিজ্ঞান বানায়। APA-র আলোচনা এজন্য করা হলো, কারণ সমকাম ও নারীবাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় এবং প্রকাশিত হয় American Psychological Association-এর ব্যানারে। এবং এগুলোকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয় পুরো দুনিয়া। সেখানে অবস্থা এই।

গ.

মানসিক রোগনির্ণয়ে ও শ্রেণিকরণে American Psychiatric Association (APA) কর্তৃক নির্মিত Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-এর বহুল প্রচলন রয়েছে। ১৯৫২ সালে DSM-1 এবং ১৯৬৮ সালের DSM-2 তে সমকামকে যৌনবিকৃতি ও মানসিক রোগ হিসেবে তালিকাভুক্ত রাখা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে DSM-2 এর ৬ষ্ঠ মুদ্রণে গিয়ে সমকামিতাকে রোগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। রিসার্চের ভিত্তিতে? একদমই না।

১৯৬৪ সাল থেকেই সমকামীরা নিজেদের দুরবস্থার কারণ হিসেবে APA যে তাদেরকে রোগী বানিয়ে রেখেছে, এটাকে দায়ী করে আসছিল। ১৯৬৯ থেকে স্টোনওয়াল দাঙ্গার মাধ্যমে সমকামীদের আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। ১৯৭০ সালে সানফ্রান্সিসকোতে APA-এর সম্মেলন চলাকালে সমকামী এক্টিভিস্টরা সম্মেলনকক্ষে ঢুকে পড়ে, বক্তাদের বক্তব্যের মাঝে শোরগোল করতে থাকে, চিৎকার ও টিটকারি করতে থাকে। APA-এর সদস্যগণ ও বিক্ষোভকারীদের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ পর্যন্ত ডাকা লাগে।

১৯৭১ সালে ওয়াশিংটনের সম্মেলনে গে-এক্টিভিস্টদের সাথে আলোচনার জন্য 'গে-প্যানেল' রাখা হয়। সেখানে তাদের নেতা Frank Kameny মাইক্রোফোন ছিনিয়ে

---

[৯২] 'If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual... then I would not call it pathological in any way.'
Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.

নিয়ে চিৎকার করতে থাকেন:

> ‘Psychiatry is the enemy incarnate. Psychiatry has waged a relentless war of extermination against us. You may take this as a declaration of war against you.’

> ‘মনোচিকিৎসা বিভাগই আমাদের নব্য শত্রু। পুরো বিষয়টিই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। আপনারা একে আমাদের পক্ষ থেকে 'যুদ্ধের ঘোষণা' হিসেবে নিতে পারেন।’[১৩]

পরের বছর তারা আবার অংশ নেয় সম্মেলনে। পরের বছর ১৯৭৩ সালে সমকামিতাকে রোগের তালিকা থেকে তড়িঘড়ি করে রিসার্চ ছাড়াই বাদ দেবার সিদ্ধান্ত হয়। প্যানেলে সমকামিদের পক্ষে ওকালতি-কারী Barbara Gittings-ও বলেন: *it was never a medical decision. And it was a political move, that's why i think the decision came so fast'* [94]
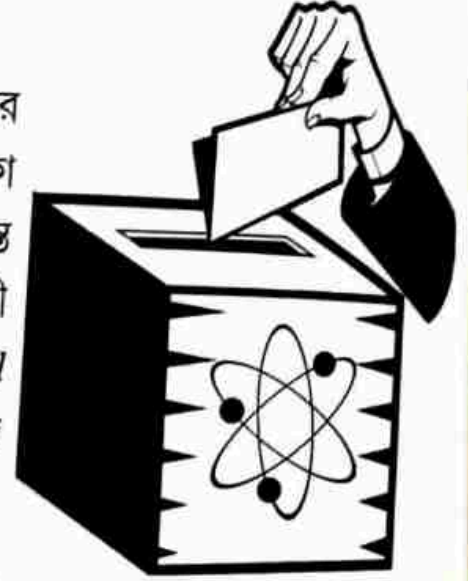
১৯৭৪ সালে ভোট হয়, সমকামিতাকে কি বাদই রাখা হবে, নাকি আবার ঢুকানো হবে লিস্টে। ৫৮% ভোট পড়ে 'বাদ-ই থাকুক' এর পক্ষে। এভাবেই রিসার্চ ছাড়াই ভোটে, হুমকিতে আর প্রেসারে তৈরি হয়ে গেল বিজ্ঞান। যাকে গত ৫০ বছর অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা। [১৫]

ঘ.

ইদানীং আমরা যে IQ টেস্ট করি সেই পদ্ধতিটি ১৯৫০-এর দশকে Dr. D Wechsler-এর বানানো। শুরুতে তিনি পেলেন, ৩০-এরও বেশি টেস্ট নারী-পুরুষের মাঝে ‘একজনের’ পক্ষে ‘বৈষম্য’ করছে। যেন, টেস্টেরই দোষ, সে কেন একই রেজাল্ট দিচ্ছে না। কেন দুই লিঙ্গ দুই রকম পারফর্ম করবে? উভয়ে তো সমান। অতএব, টেস্টই ঠিক নেই। বুইঝেন ব্যাপারটা।

পারফর্মেন্স গ্যাপ যেগুলোতে বেশি, সেই টেস্টগুলো বাদ দিয়ে দিলেন Wechsler সাহেব। ‘সমস্যা’টা সমাধান করা দরকার। এরপরও যখন দুই লিঙ্গকে সমান দেখানো

---

[১৩] Ronald Bayer Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis (1981) Princeton University Press p. 105.

[১৪] Marcus E. (2002), Making Gay History: The Half-century fight for lesbian and gay equal rights, p179

[১৫] Sarah Baughey-Gill, When Gay was not Okay with the APA, Occam's Razor, vol 1 (2011)

যাচ্ছে না, তখন যেটা করা হলো: কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে পুরুষ ভালো করে, নারী খারাপ করে। আর কিছু টেস্ট রাখা হলো, যেগুলোতে নারীরা ভালো করে, পুরুষ খারাপ করে। পুরোটাকে বলা হলো 'IQ টেস্ট'; এবং 'নারী-পুরুষ' আইকিউ সমান। এই হলো পশ্চিমা বিজ্ঞানের অবস্থা। অনেক সময় দেখা যায়, যখন গবেষণার রেজাল্ট আপনার পছন্দ হচ্ছে না, মনমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আপনি প্রাপ্ত ডেটাগুলো এদিক-সেদিক করে নিচ্ছেন। উদাহরণ যেন, অলিম্পিকে কোনো পোলভোল্ট ইভেন্টে কয়েকজন অ্যাথলেটকে আপনি ওজনের বাটখারা বেঁধে দিচ্ছেন। আর কয়েকজনকে পোলের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছেন। যাতে 'সত্য'টা প্রমাণিত হয় যে, শক্তি আর দ্রুততা যাই হোক, সৃষ্টিগতভাবে সব পোলভল্টারই সমান। (all the pole-vaulters, regardless of their prowess and agility, are created equal)[১৬]

ঙ.

বাচ্চার ১ম বছরে যেসব মায়েরা জবে থাকে ফুলটাইম, সেসব বাচ্চার ৩ বছর, ৪ বছর ও গ্রেড-১ এ বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রোথ তুলনামূলক কম। এবং এসব মায়েদের ডিপ্রেশন হবার হার 'বেকার' মায়েদের চেয়ে বেশি। ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে পর পর ৩টি রিসার্চের ফলাফলের ওপর University of London-এর প্রোফেসর Jay Belsky সিদ্ধান্তে আসেন:

> 'মানে হলো: ছোটবয়েস থেকে দীর্ঘসময় বাচ্চাকে মা ছাড়া অন্য কারও কাছে রেখে পাললে (early and extensive nonmaternal care), পরবর্তীতে পিতামাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ভেতরে রাগ-জেদ ইত্যাদি আগ্রাসী স্বভাব বৃদ্ধি পায়। বাচ্চা বয়সে, স্কুলে যাবার আগের বয়সে এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোতে কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (noncompliance)।'

পুঁজিবাদী-নারীবাদী মতের বিরুদ্ধে হওয়ায় এরপর বেচারাকে ধুয়ে দেওয়া হয়। তারপরও ২০০১ সালে Journal of Child Psychiatry and Psychology-তে তিনি নিজ মতের ওপর অটল থাকেন। [১৭]

এই জুয়াচুরির বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা বিজ্ঞান যেহেতু এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে, যেমনটা বিজ্ঞানী Rupert Sheldrake

---

[১৬] Brainsex, page 13, Anne Moir PhD. এবং David Jessel.

[১৭] Belsky J. Emanuel Miller lecture developmental risks (still) associated with early child care. J Child Psychol Psychiatry. 2001 Oct;42(7):845-59.

Brooks-Gunn et. al. 2010, First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years;

তাঁর *Science Set Free 10 Paths To New Discovery* বইয়ে বলেন:

> ...কিন্তু যে চিন্তাধারা আজকের বিজ্ঞানকে পরিচালিত করছে তা স্রেফ বিশ্বাস, যার শেকড় গেঁথে আছে উনবিংশ শতকের ভাবতত্ত্বের (এনলাইটেনমেন্ট) ওপর।

ঠিক সে কাজও করবে তেমনই। বর্তমান পশ্চিমা বিজ্ঞানের কাজই হলো পশ্চিমা লিবারেল দর্শন ও নিত্যনতুন ভোগবাদী ধারণাগুলোকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা। নারীবাদ, সমকামিতা—এগুলোর পায়ের নিচে মাটি এনে দেওয়া। রিসার্চের নামে, জরিপের নামে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এগুলোকে দুনিয়ার সামনে অকাট্য হিসেবে উপস্থাপন করা। মোদ্দাকথা, বিজ্ঞান এখন পুঁজিবাদ-ভোগবাদ-বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার একটা হাতিয়ার, একটা পুতুল [১৮]। MIT-এর প্রোফেসর পদার্থবিদ Evelyn Fox Keller বলেন:

> 'মেইনস্ট্রীম বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে **আধুনিক ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সমাজের** প্রভাব বিস্তারের আদর্শ থেকে উৎসারিত। যা সৃষ্টিই হয়েছে তাদের মানসগঠনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চরিত্র থেকে।'

অর্থাৎ বিজ্ঞানের হাতিয়ারটি বর্তমানে পশ্চিমা সাদা সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাষায়ই কথা বলে। মার্কিন বিজ্ঞান-দার্শনিক Helen Longino তাঁর *Science as Socioal Knowledge* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, বিজ্ঞান কীভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁর যুক্তি হলো, বিজ্ঞানের 'ভেতরের মূল্যবোধ' প্রভাবিত হয় 'বাইরের মূল্যবোধ' দ্বারা। একটু খুলে বলি। বিজ্ঞানের ভেতরের কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে, যেমন: প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাজ যদি হয় প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা, তাহলে কোন ব্যাখ্যাকে 'ভালো ব্যাখ্যা' বলা হবে। কথার কথা, Truth-accuracy-simplicity-predictability-breadth—এই শর্তগুলো পুরা হলে সেটা 'গুড সায়েন্স'। এটাকে তিনি বলছেন বিজ্ঞানের ভেতরগত গাঠনিক মূল্যবোধ (constitutive values)। কিন্তু এই শর্তগুলো পুরা হয়েছে বলা হবে কি না সেটা আবার নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক মূল্যবোধের (contextual values) ওপর। হেলেন বলেন:

> 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, ডেটা থেকে কী বুঝব, আর কী বুঝব না তা নির্দিষ্ট থাকে। এগুলো মেলার ওপর নির্ভর করে গবেষণাটির সফলতা এবং সফলতার মাপার শর্ত। এবং মানব কর্মকাণ্ড হিসেবে এটি সামাজিকভাবেও নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে, যা ঠিক করে দেয় গবেষণার লক্ষ্য ও সাফল্যের শর্ত। আর শেষমেশ, ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতির

[১৮] Science, Capitalism, and the Rise of the "Knowledge Worker": The Changing Structure of Knowledge Production in the United States, Author(s): Daniel Lee Kleinman and Steven P. Vallas. Source: Theory and Society, Vol. 30, No. 4 (Aug., 2001), pp. 451-492

প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় বিজ্ঞান। আর এদের সাথে তার লেনদেন সবসময় চলমান।'[৯৯]

অর্থাৎ বিজ্ঞান চাইলেও নৈর্ব্যক্তিক (objective) হতে পারে না, নিরপেক্ষ (value-free) হতে পারে না। এই সীমাবদ্ধতাটুকু মেনে নিলে বিজ্ঞানের ওপরই স্ট্রেস কমে। এ নিয়ে পশ্চিমা একাডেমিকদের বিতর্ক তিন ধারায় চলমান—

- একদল বলেন, ঠিক আছে বিজ্ঞান প্রভাবিত হয়, তবে যতখানি প্রভাবিত হবে, সেটা ততই 'পচা-বিজ্ঞান'।
- আরেকদল বলছেন, বিজ্ঞানের পদ্ধতিটাই সামাজিক, সুতরাং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত ও সমাজের স্বার্থ দ্বারা তাড়িত।
- তৃতীয় দল বলেন, বিজ্ঞান মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত, ফলে অনিবার্যভাবে তা বিজ্ঞানী ও তাদের সমাজের প্রতিফলন।[১০০]

পশ্চিমা গবেষকেরা বিজ্ঞানের থিওরি এবং দর্শনের এই পারস্পরিকতা নিয়ে কাজ করছেন। যেমন,

- ডারউইনিয়ান বিবর্তনতত্ত্ব এবং ১৯ শতকের পুঁজিবাদের মাঝে সম্পর্ক,
- ১৯ শতকের মগজ পরিমাপ (craniometry) এবং বর্ণবাদের দ্বারা উপনিবেশের জাস্টিফিকেশান।
- গবেষকগোষ্ঠী বা অর্থদাতাগোষ্ঠীর স্বার্থ এবং রিসার্চের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক
- পলিসি তৈরিতে রিসার্চের ভূমিকা, ইত্যাদি। বিশেষত, সরকার ও কর্পোরেট অর্থদাতা গোষ্ঠীর স্বার্থ দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়া তো খুবই স্বাভাবিক।[১০১]

বিশেষ করে আমেরিকার psychology academia-র scientific dishonesty তো পুরো একাডেমিয়াতে মশহুর। হস্তমৈথুন, সমকাম, নারীবাদের অধিকাংশ গবেষণা সাইকোলজিস্টরা করেছে। সাইকোলজিস্টদের এসব 'এসি রুমে বসা' থিওরির সাথে ডাক্তারদের (যারা ফিল্ডে কাজ করে) বহু বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে। অনেক আর্টিকেল পাবেন যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ধুয়ে দিচ্ছে। আমেরিকার সাইকিয়াট্রিস্টদের করা DSM-5 ব্রিটিশ সাইকিয়াট্রিস্টরা বয়কট করেছিল এই অভিযোগে যে, তারা কর্পোরেট ফার্মা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'অসুখ নয়' এমন জিনিসকে অসুখ প্রমাণ করেছে, যাতে ওষুধের বিক্রি বাড়ে।[১০২] চিন্তা করেন?

---

[৯৯] Helen Longino, Science as Socioal Knowledge, p17

[১০০] *ibid*, p7

[১০১] *ibid*, p3

[১০২] Watts G. Critics attack DSM-5 for overmedicalising normal human behaviour BMJ 2012; 344 :e1020

শুধু কি তা-ই। গবেষণায় প্রাপ্ত ডেটা থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা হবে, সে ব্যাপারেও বিজ্ঞান পুরোপুরি স্বাধীন না। বিখ্যাত আধুনিক দার্শনিক W.O. Quine তাঁর বিখ্যাত 'two dogmas of empiricism'-এ বলেন: ... *observations themselves are partly shaped by theory [theory-laden].*

অর্থাৎ, প্রাপ্ত ডেটা যা-ই আসুক, তাকে টেনেটুনে প্রচলিত ডোমিনেন্ট থিওরির অধীনে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা অবচেতনেই কাজ করে বিজ্ঞানীদের। উপরে প্রোফেসর Jay Belsky-র মতো তোপের মুখে পড়তে কে চায় বলুন? সবাই তো আর পাগল না, ক্যারিয়ার হারানোর চেয়ে স্রোতে গা ভাসানোই সেইফ।

তাহলে বুঝলেন তো, যে সর্ষের ভেতরে-বাইরে খালি ভূত আর ভূত, সেটা দিয়ে ভূত তাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পশ্চিমা বিজ্ঞানকে পরম কষ্টিপাথর ধরে নেবার সুযোগ নেই। আর সেই কষ্টিপাথরে আল্লাহর বিধানকে পরীক্ষা করা? উহুঁ।

বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে কী হবে?

কুরআনের উদ্দেশ্য আমাদের সতর্ক করা, কিন্তু আমাদের সতর্ককারী বিষয়ের মধ্যেই এমন মু'জিযা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের excellence-কে চ্যালেঞ্জ করবে, তাদের expert-দেরকে হয়রান করবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আল্লাহ তাআলা সূরা আনআমে বলেছেন:

> "অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন - খুবই সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যেন মনে হয় সে আকাশে আরোহণ করছে (يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ কলুষময় করে থাকেন।"[১০৩]

এই আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন, হিদায়াত ও গোমরাহির মালিক আল্লাহ। যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে লাঞ্ছিত করেন। আহলুস সুন্নাহর আকীদা হলো: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 'ইনসাফের ভিত্তিতে' পথহারা ও বিপদগ্রস্ত করে পরীক্ষায় ফেলেন। [১০৪] আয়াতের মূল মেসেজ কোনো বিজ্ঞান পেশ করা নয়, একটা সতর্কবাণী দেওয়া। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এই আয়াত প্রথমবার পড়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি। বুক সংকুচিত করে দেন, যেমন আকাশে আরোহণ করলে লাগে। ঘটনা হলো, সমুদ্র-

[১০৩] সূরা আনআম, ৬ : ১২৫, অনুবাদ: মুজিবুর রহমান।

[১০৪] ইমাম ত্বহাবী, আকীদাতুত ত্বহাবীয়া, পয়েন্ট ২৪

লেভেলে বাতাসে অক্সিজেন বেশি থাকে। যত উচ্চতা বাড়ে বাতাস তত পাতলা হয়, অক্সিজেনের ঘনত্ব তত কমে আসে। ১৪,০০০ ফুট উঠলে ১৫% সুস্থ লোকের ফুসফুসে পানি জমে যেতে পারে (High-altitude pulmonary edema, HAPE)। কমার্শিয়াল ফ্লাইটগুলোতে ৬৪০০ ফুটের লেভেলের প্রেসার ও অক্সিজেন ঘনত্ব বজায় রাখা হয় বলে যত ওপরেই উঠুক, খারাপ লাগে না। [১০৫] আর উঁচু এলাকাগুলোতে যারা বসবাস করে তাদের দেহ বিশেষভাবে মানিয়ে নেয়, রক্তকণিকা বেশি থাকে, অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা বেশি থাকে। তাদেরও সমস্যা হয় না। পাহাড়ে উঠারও নিয়মকানুন আছে, প্রতি ১০০০ ফুট উঠার পর একরাত থেকে নিতে হয়, ইত্যাদি। সেসময় লোকে পাহাড়ে উঠত, কিন্তু এখানে তো আকাশে ওঠার আলাপ। কিন্তু কথা হলো, ১৪০০ বছর আগে কে আকাশে আরোহণ করে এসে জানিয়েছে যে আকাশে উঠলে (নট পাহাড়ে উঠলে) বুক এঁটে আসে? আর ৮০০০ ফুট (২.৪৮ কিমি) ওঠার আগে উচ্চতা-ঘটিত শ্বাসকষ্ট টেরও পাওয়া যায় না।

যদিও এই আয়াতের মাকসাদ এটা না, কিন্তু এটা কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ করে। সতর্ককারী বিষয়ের মধ্যেই এমন অনেক কথা রয়েছে, যা বর্তমানে বিজ্ঞানের কারণে আমরা জানতে পারছি। নবিজির যুগে যা জানা **একদমই অসম্ভব ছিল। এখানেই কুরআনের মু'জিযা।** যে কুরআন সে যুগের কবিদের জন্যও মু'জিযা ছিল, যদিও কুরআন কোনো কবিতার বই না। এ যুগেও বিজ্ঞানীদের জন্য মু'জিযা, যদিও এটা বিজ্ঞানের বই না। কিয়ামাত তক মানবজাতি যে যেই বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করবে, কুরআন সেই বিষয়ে নিজের মু'জিযা প্রকাশ করবে।

বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের 'সত্যতা'র সম্পর্ক নেই, এসব expert-রা সবাই যোগসাজশ করে কুরআনকে 'ভুল' বললেও কুরআন ভুল হয়ে যাবে না। কিন্তু এটাও আল্লাহই করবেন, যুগে যুগে কিছু এক্সপার্টদেরকে দিয়ে তাঁর কালামের মু'জিযা প্রকাশ করে দেবেন। কিয়ামাত তক করবেন। **বিজ্ঞান কুরআনকে প্রমাণ করে না, জাস্ট অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ করে।**

মনে রাখার বিষয় এতটুকুই—বিজ্ঞান স্রেফ 'পর্যবেক্ষণ', বিজ্ঞান একটা হাতিয়ার (Tool)। **এই Tool-টাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, যা পশ্চিমা সমাজ-সভ্যতা করছে, পশ্চিমা অর্থনীতি করছে। তাই এটা ঈমানের ভিত্তি নয়।** আমরা বিশ্বাস করি গায়েবে, **বিজ্ঞানে না। তবে কুরআনের মু'জিযা প্রকাশ মুমিনকে তৃপ্তি দেয়, এই তৃপ্তি আল্লাহরই নিয়ামাত,** যেমনটি তিনি বাবা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে দিয়েছিলেন। যার

[১০৫] Into thin air: Medical problems at new heights, March, 2014 , health.harvard.edu

Altitude Sickness: What Is It? December, 2018, health.harvard.edu

কারণে প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর হুকুমের প্রজ্ঞা, আল্লাহর নিদর্শন এই পশ্চিমা বিজ্ঞানের দ্বারা বোঝা সম্ভব না। মুসলিমদের এই মেথডোলজি ঠিক রেখে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-কাঠামো, পৃথক বিজ্ঞান-দর্শন তৈরি করতে হবে। মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞান এক্ষেত্রে সামনে রাখা যায়। তারা গবেষণা করেই আল্লাহর পরিচয় দৃঢ়ভাবে পেতেন।

তবে এখন পশ্চিমা বিজ্ঞান থেকে আমরা কিছুই নেবো না? হ্যাঁ, নেবো। যা তাদের সমাজ-প্রভাবিত না, পুঁজিবাদকে পুষ্টিদাতা না, ফিতরাত-বিধ্বংসী না, সেগুলো। বুঝবেন কীভাবে কোনগুলো? আচ্ছা। প্রথমত, সমসাময়িক বিজ্ঞান-গবেষণাগুলো মোটাদাগে দুই প্রকার—

১. অপারেশনাল বা ফাংশনাল বা মেকানিস্টিক সায়েন্স

২. হিস্টোরিকাল বা নন-ফাংশনাল সায়েন্স

অপারেশনাল সায়েন্স হলো, আগের ঠিক কোন ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে এই ঘটনা ঘটল, সেটা বোঝার চেষ্টা করা। কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার ঠিক আগের কারণ (proximate causation) বা সম্পর্ক (association) ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা। যেমন ধরুন, ভাইরাস কীভাবে মিউটেশন করে, কোষের ভেতরে কীভাবে কার্যক্রম চলে, ক্যান্সার কেন হয়। এটা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করে বিভিন্ন মাত্রায় পর্যবেক্ষণ করা যায়। আর হিস্টোরিকাল বা নন-ফাংশনাল সায়েন্স হলো: সুদূর অতীতে কী ঘটেছিল, তা বর্তমানের আলামত দেখে অনুমান করার চেষ্টা করা। যেমন—মহাবিশ্ব কিংবা প্রাণের উৎপত্তি। ডারউইনবাদী বিজ্ঞানী Ernst Mayr বলেছেন: *ইতিহাস-কেন্দ্রিক জীববিদ্যা 'সম্ভাবনামূলক চিত্রকল্প' নির্মাণ করে।* যেহেতু সুদূর অতীতে গিয়ে আমাদের পক্ষে দেখে আসা সম্ভব না আসলেই কী ঘটেছিল, তাই বর্তমানে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া দেখে অতীতের সম্ভাব্য চিত্র আঁকা হয়। আর এই অংশটাকেই পশ্চিমা বস্তুবাদী মহল ব্যাপকভাবে ধর্মকে বাতিল সাব্যস্তকরণে ব্যবহার করে। স্রষ্টার অস্তিত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে অপব্যবহার করে। আর দাবি করে, বিবর্তন মিথ্যা হলে বাকি পুরো জীববিদ্যাই মিথ্যা হয়ে যাবে। অথচ হিস্টোরিক্যাল বিজ্ঞানের সাথে অপারেশনাল বিজ্ঞানের কোনো সাধ নেই। বিবর্তনতত্ত্ব ভুল হলেও ভাইরাস মিউটেশন করেই যাবে, সিগারেটের সাথে ক্যান্সারের সম্পর্ক রয়েই যাবে।[১০৬]

পশ্চিমের অপারেশনাল সায়েন্স আমরা গ্রহণ করতে পারি। আবার বলছি: 'মাপকাঠি হিসেবে নয়'। কেননা বিজ্ঞানের এই যাত্রা অন্তহীন। পক্ষেও রিসার্চ পাবেন, বিপক্ষেও পাবেন। মুসলিম হিসেবে আপনি কোনটা নেবেন? আপনি তো শুরু থেকেই দেখবেন ওহির চোখে। ওহি আপনি কিন্তু বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানেননি। ওহিকে মেনেছেন

[১০৬] Ernst Mayr (2004), What Makes Biology Unique [সম্পাদক]

সীরাত আর মু'জিযার বুনিয়াদে (শুরুর আলোচনা)। রাইট? এখন শক্তিবর্ধক হিসেবে empirical evidence আপনি সেগুলোই পশ্চিম থেকে নেবেন যে গবেষণাগুলো আমাদের ওহির সাথে যায়, আমরা শুধু সেগুলোকেই সঠিক বলে নেবো। কেননা, ওহি নির্ভুল। পশ্চিমা বিজ্ঞান vulnerable, ওহি তা না। ওহি সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ম্যানুয়াল, আর পশ্চিমা বিজ্ঞান পুঁজিপতিদের মুখাপেক্ষী। এটুকু মাথায় রেখে পশ্চিমাবিজ্ঞান চর্চা, আল্লাহর হুকুমের হিকমাহ বোঝার জন্য উল্লেখ করা যেতেই পারে। হুকুম মানা হবে বিনা প্রশ্নে, দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণলব্ধ বিজ্ঞান।

এটা কি প্রতারণার মাধ্যমে দ্বীনপ্রচার? জি না, এটা প্রতারণা না। যেহেতু পশ্চিমা বিজ্ঞানের মাপকাঠি আমাদের মাপকাঠি না। ওদের মাপকাঠিকে যদি ইউনিভার্সাল মেনে নিতাম, এরপর যদি কিছু মানতাম কিছু মানতাম না, তাহলে হতো প্রতারণা। আমাদের মাপকাঠি আমাদের শারীআ। সাংঘর্ষিক ক্ষেত্রে শারীআর সাথে যেটুকু মিলবে, সেটুকুই ঠিক আছে বলে গণ্য হবে ও পশ্চিমা বিজ্ঞানের সেইটুকু আমাদের মাঝে চর্চিত হবে ঈমান বৃদ্ধির জন্য। বাকিটুকু হবে না। পশ্চিমা গবেষণা যা আমাদের ওহির সাথে মেলে, ওহির সামনে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে। সেগুলো উল্লেখ করতেও কোনো সমস্যা নেই। এবং আমার মতে করা উচিত। এর ফলে দুটো জিনিস হবে—

ক.

পশ্চিমা সভ্যতা যা প্রচার করে, সেটাই যে অবিসংবাদিত সত্য না, সেটা উঠে আসবে। তারা অনেক রিসার্চ ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের সমাজ-চিন্তার পক্ষেরটুকুই প্রচার করে, বাকিটুকু করে না যা ওহিকে সত্যায়ন করে। যদিও পশ্চিমা গবেষণায় ওহির সত্যায়ন হলো কি হলো না, তা আমাদের ধর্তব্য না। কিন্তু পশ্চিমকে ধোয়া-তুলসী পাতা মনে করা মুসলিমরা সচেতন হবে। বিজ্ঞানকে যে তারা নিজেদের পশ্চিমা লিবারেল ধর্ম প্রমাণে ব্যবহার করে চলেছে, তা প্রচার হবে।

খ.

কাফির-ফাসিকের আনা সংবাদ (রিসার্চ) যদি মুসলিম রিসার্চার 'ওকে' বলে দেয়, সেক্ষেত্রে সেটাও মুসলিমের আনা সংবাদের মতোই মেনে নেওয়া চলে। তাও মুসলিমের করা রিসার্চের মতোই আমরা ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি, পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যা ইয়াকীন বাড়াতে করেছিলেন।

যেমন ধরুন, হালাল জিনিসই বেশি, হারাম জিনিস হাতে-গোনা। ফিকহের উসূল হলো, আমভাবে সব জায়িয, যদি না হারাম করা হয়। আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে

একটা জীবন-বিধান দিচ্ছেন, তাই এটাই যুক্তির দাবি যে, জীবনযাপনের জন্য ক্ষতিকর জিনিসই তিনি নিষেধ করবেন। নির্দোষ বা কল্যাণকর কিছু তিনি অহেতুক আমাদের নিষেধ করবেন, এটা তাঁর শানের সাথে যায় না। অনেকে বলবেন, কই, মিথ্যা বলে তো কোনো ক্ষতি হয় না। মিথ্যা বললে যদি ক্ষতি না হয়, আর কীসে ক্ষতি? পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ক্ষতি কি হয় না মিথ্যায়? মিথ্যাবাদী নিজেও তো বেইজ্জতির মধ্যে পড়ে যায় মিথ্যার কারণে, আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়। হারাম সবকিছুই আবশ্যিকভাবে ক্ষতিকর, কোনো-না-কোনোভাবে, ব্যক্তিক বা সামষ্টিক। **বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা এই ক্ষতি বুঝতে পারা আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার ব্যাপারে আমাদের ঈমানকে বাড়ায়। তবে সবই বুঝে ফেলব তা কিন্তু নয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন:**

> “তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।” [সুরা বাকারা ২ : ২১৬]

সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে যারা মানদণ্ড হিসেবে পশ্চিমও নেয়, আবার ইসলামও নেয়। এই বেচারারা আছে মহাজ্বালায়। কী করবে, কী বলবে, এটা না ওটা। ইউরোপ ইউনিভার্সালি বলছে হস্তমৈথুন খারাপ না, নরমাল। আবার এদিকে দ্বীন বলছে হারাম। বেচারারা আছে দোটানায়। অনেকটা মধ্যযুগের খ্রিষ্টবাদীদের মতো। ব্রেন বলছে ‘একে তিন, তিনে এক’ হওয়া অসম্ভব। ওদিকে মানতে হচ্ছে চোখ বুজে।। আগে মানদণ্ড ঠিক করতে হবে—ওহি না পশ্চিমা-দর্শন। দুটোই সত্য হতে পারে না। আর আমাদের দ্বীন দুর্বোধ্যও না। আলহামদুলিল্লাহ।

হুকুম মানা হবে বিনা প্রশ্নে, দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণলব্ধ বিজ্ঞান। তাহলে চলুন কিছু নমুনা দেখি কীভাবে পশ্চিমা বিজ্ঞানের 'এক্সপেরিমেন্টাল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান'-কে আমরা ব্যবহার করতে পারি। কষ্টিপাথর-১ বইয়ে বেশকিছু আলোচনা ছিল। এবার আরও কিছু বিষয়ে আলাপ সেরে নিই, নাকি?

তবে হ্যাঁ, মাথায় রাখতে হবে এগুলোর সবগুলোতেই ক্লিয়ার-কাট রিসার্চ বা empirical evidence নেই। আমাদের হাতে ফিলহাল যে অভিজ্ঞতা রয়েছে আর দেহ নর্মালি যেভাবে কাজ করে (Basic Physiology) তা মিলিয়ে একটা ইঙ্গিত হিসেবে এগুলো আমরা পড়ব। অমুসলিম বিজ্ঞানীরা আমাদের কাজ কতখানি এগিয়ে দিয়েছেন। সুন্নাহকে সামনে রেখে রিসার্চ ডিজাইন তো স্বাভাবিকভাবেই ওনারা করবেন না। একাজ তো আমাদেরই করার কথা। এমনকি বিপরীত রেজাল্ট এসেছে, এমন রিসার্চেরও অভাব নেই। বিজ্ঞান এভাবেই কাজ করে।

পর্ব ২

গোড়া কেটে আগায় পানি
শয়নে-স্বপনে
মধু
কালোজিরা
সুরমা
আর্লি বেড আর্লি রাইজ
রেশমের কাপড়
খৎনা
নারীর খৎনা
হিজামা (cupping)

এখন করণীয় কী?
বিজ্ঞানী তৈরি করাই কি সমাধান?

গোড়া কেটে আগায় পানি

শতভাগ বাঙালির এই অভ্যেস। খাওয়ার পর ঢক ঢক করে দুয়েক গেলাস জল মেরে না দিলে মনেই হয় না পেটটা ভরেছে। এজন্য বাঙালির বদহজমও যায় না। শুধু বাংলাদেশের মার্কেটে সবচেয়ে বেশি বেচাবিক্রি হয় কোন ওষুধের বলেন? গ্যাসের ওষুধ। বাচ্চা-বুড়ো-গ্যাদা কেউ বাদ নেই। নিচের ছবিটা দেখেন। ঘটনাটা কী ঘটে।

প্রথম ঘটনা যেটা ঘটে, খাবার থাকে নিচে, পানি থাকে ওপরে। ছবির মতন। এই পানিটা পুরোটাই হয়ে যাবে এসিডিক। ফলে আপনি বলবেন আমার বুক জ্বলে, গলা জ্বলে। গ্যাস তৈরি হবে। পেট ফেঁপে থাকবে। Dietitian Nutritionist Erin Peisach-ও সেটাই জানাচ্ছেন।[১০৭] বিশেষত যেসব রোগীদের GERD (Gastro-esophageal reflux deisease) থাকে, তাঁদের এই ওয়ান-ওয়ে গেটটা থাকে দুর্বল, ফলে এসিডিক কন্টেন্ট ওপরে উঠে আসে সহজেই। তাদের ক্ষেত্রেও ডাক্তাররা এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন, খাবার পর সাথে সাথেই পানি খাবেন না। ঘন্টাখানেক পরে খাবেন। কেননা এর ফলে পাকস্থলীর আয়তন বাড়ে, উর্ধ্বমুখী চাপ বাড়ে। কেন ভাই, রোগী হয়ে পড়ার আগেই তো নিয়মটা মানা যায়, নাকি?
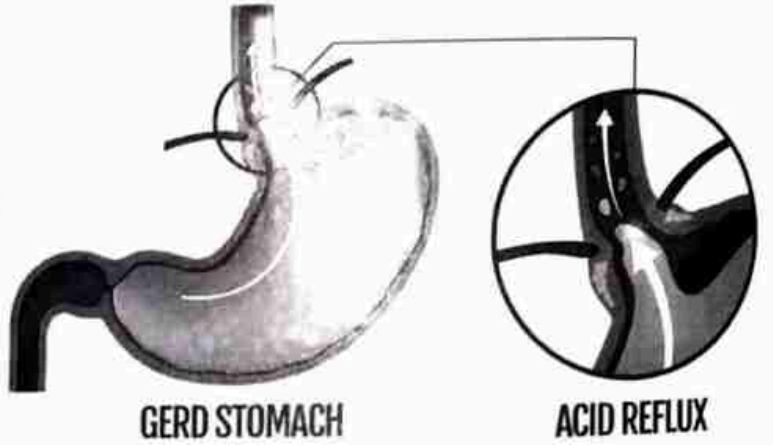
দ্বিতীয় ঘটনাটা হলো, আমাদের পাকস্থলীতে শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) বেরোয়। খাবার ঢুকলে সেও সিগন্যাল পেয়ে বেরোতে থাকে। খাবারটার সাথে মিশে যত জীবাণুটিবাণু যা আছে সব গলিয়ে মথিয়ে একেবারে কেল্লাফতে করে দেয়। আপনি খাওয়ার পর বেশি পানি খেলে এসিডটা পাতলা হয়ে গেল। খাবারের সাথে মিশে

---

[১০৭] Erin Peisach (March 15, 2017) Acid Reflux Mythbusters: Drinking Water Dilutes Stomach Acid

যা যা করার ছিল, পুরোটা করতে পারল না। এসিডিটি থাকার কথা ছিল pH লেভেল 2 তে, সেখানে এক গ্লাস পানি করে দিল ৪ এর বেশি (Karamanolis, 2008)। কিছু জীবাণু বা জীবাণুর ডিম (স্পোর), কৃমির ডিম রয়ে যেতেও পারে। ফলে প্রায়ই আপনি পেট মোচড়ানো নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন। আর বলবেন, ডাক্তার বাবু, বাথরুমের সাথে আম পড়ে, কাঁঠাল পড়ে।

এজন্য খাওয়ার শেষে কোনো পানি নয়। খাওয়ার শুরুতে পানি খাবেন। সেটা পাকস্থলীর 'লেসার কার্ভেচার' দিয়ে নিচে নেবে যাবে একেবারে, বেরিয়ে চলে যাবে ৫ মিনিটের ভেতর (Péronnet, 2012)।[১০৮] আর খাওয়ার মাঝে মাঝে গলা ক্লিয়ার করার জন্য কয়েক চুমুক পানি, ব্যস। দু'গ্লাস খাবেন, ঠিক খাওয়ার ১/২ ঘণ্টা পর। যখন এসিডের কাজ এসিড করে ফেলেছে। খাবারও পাকস্থলী থেকে বিদায় নিল নিল ভাব।

খাওয়ার সাথে সাথেই ভরপেট পানি না খাওয়া। মুখের ভেতর খাবার লেগে অস্বস্তি লাগে, তাই তো? কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিলেন। পানি খেয়ে নয়। এটাই করতেন আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

> 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল না খাওয়ার পরপরই পানি খাওয়ার।'[১০৯]

> ইয়াহ্ইয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি বুশাইরকে সুওয়াইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে খাইবারের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন সাহ্বা নামক জায়গায় পৌছলাম—ইয়াহ্ইয়া বলেন, এ স্থানটি খাইবার থেকে এক মনযিল দূরে—তিনি খাবার নিয়ে আসতে বললেন। কিন্তু ছাতু ব্যতীত অন্য কিছু আনা হলো না। আমরা তাই মুখে দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেলাম। তিনি পানি আনতে বললেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন কিন্তু ওজু করলেন না।'[১১০]

---

[১০৮] Péronnet F, Mignault D, du Souich P, Vergne S, Le Bellego L, Jimenez L, Rabasa-Lhoret R. Pharmacokinetic analysis of absorption, distribution and disappearance of ingested water labeled with D_2O in humans. Eur J Appl Physiol. 2012 Jun;112(6):2213-22.

Karamanolis G, Theofanidou I, Yiasemidou M, Giannoulis E, Triantafyllou K, Ladas SD. A glass of water immediately increases gastric pH in healthy subjects. Dig Dis Sci. 2008 Dec;53(12):3128-32.

[১০৯] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/১১৪, দারুত তাকওয়া।
https://islamqa.org/hanafi/efiqh/22011
لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ أَنْ يَشْرَبَ عَلَى طَعَامِهِ فَيُفْسِدَهُ

[১১০] বুখারি, ৫৪৫৪, ৫৪৫৫ (iHadis)

২০১৮ সালে বাংলাদেশের ওষুধের মার্কেট ছিল ২০৫০০ কোটি টাকা[১১১], যা ১৪.৬% হারে বাড়ছে প্রতি বছর। ২০২৩ সালে হবে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। যার ৯৫.৪%-ই দেশের লোকে খায়। এই টোটাল মার্কেটের ৪০%-ই গ্যাসের বড়ি। এই ছোট্ট সুন্নাহটা জাতীয় খরচ কত কমাতে পারত। পুঁজিবাদী কর্পোরেট বিগফার্মার হাত থেকে বাঁচাতে পারত আমাদের। নবিজিকে ভালোবেসে তাঁকে পদে পদে অনুসরণ আমাকে বাঁচাবে পুঁজিবাদের শিকার হওয়া থেকে, অসুখবিসুখ থেকে। এগুলো পাবো বোনাস হিসেবে, আর নবিপ্রেমের মূল্য তো মূল বেতন। চাকরি কি বেতনের জন্য করবেন, নাকি শুধু বোনাসটুকু হলেই সই?

শয়নে-স্বপনে

উপুড় হয়ে শোয়া

অনেকের দেখি উপুড় হয়ে না শুলে ঘুমই আসে না। ডানকাতে শুলে যে লাভগুলো হতো সেগুলো তো পেলেনই না। উলটা সমস্যার শেষ নেই। প্রথম সমস্যা হলো, এভাবে শুলে আমাদের মেরুদণ্ডে চাপ পড়ে। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা জিনিস না। ঘাড়ের কাছে কিছুটা বাঁকা (cervical curvature), আর কোমরের কাছে বাঁকা (lumber curvature)। উপুড় হয়ে ঘুমালে প্রথমত কোমরের কাছে মেরুদণ্ড সাপোর্টবিহীন থাকে। দীর্ঘদিনের অভ্যেসে কোমর ব্যথা তৈরি হতে পারে। ঘুমের মাঝে ব্যাকপেইন হয়ে ঘুমের কোয়ালিটি কমিয়ে দিতে পারে ইত্যাদি। মেরুদণ্ডের স্ট্রেস শরীরের অন্যান্য অঙ্গ

[১১১] Pharmaceutical Industry of Bangladesh, 3rd Edition

প্রত্যঙ্গের ওপরও চাপ তৈরি করে। মেরুদণ্ড দিয়েই নামে মেরুরজ্জু, যা আপনার সারা শরীরের নার্ভ-সাপ্লাই দেয়। ফলে শরীরের যেকোনো স্থানেই ব্যথা অনুভূত হতে পারে।[১১২]

আর দ্বিতীয়ত, উপুড় হয়ে শুলে আমরা মুখ বালিশে গুঁজে তো ঘুমোতে পারি না, মাথা একদিকে কাত করে রাখি। ফলে ঘাড়ের কাছটা একটা মোচড় খায়। মানে কোমর আর ঘাড় দুই জায়গাই স্বাভাবিক বিন্যাসে (alignment) থাকে না। ড্যামেজ একদিনে টের পাওয়া যায় না, ওভার টাইম ঘাড়ে ব্যথা তৈরি হয়। সমস্যা ভয়ানক হয় যদি herniated disk হয়ে যায়। মানে দুটো পাশাপাশি হাড়ের মাঝে জেলি জাতীয় পদার্থ থাকে, দীর্ঘদিন ঘাড় মুচড়ে থাকার কারণে সেটা বেরিয়ে এলে শুরু হয় আসল মজা। ঐ গ্যাপটা দিয়ে বেরিয়ে আসা নার্ভটা চাপ খায়, এবার ঘাড়সহ কাঁধ-হাত সবই ব্যথা হতে পারে। এজন্য স্পাইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উপুড় হয়ে শুলেও তলপেটের নিচে যেন একটা বালিশ থাকে, কিন্তু ঘাড়ের মোচড় কীভাবে ঠিক হবে, এব্যাপারে অবশ্যি কিছু বলেননি। এখন বিজ্ঞানীরা ঘাড়ের মোচড় না হবার একটা পদ্ধতি বাইর করুক, ততদিন ওভাবেই শো'ন, নাকি?
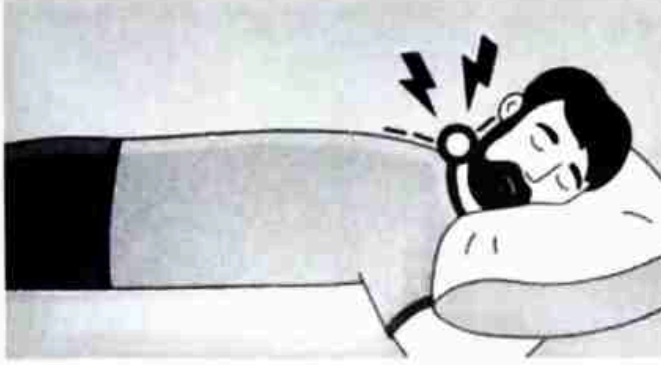
আমাদের বাপু অত হ্যাপা নেই। আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১৪০০ বছর আগে বলে গেছেন 'এটা জাহান্নামিদের শোয়া'। আমরা অমনধারা শুইও না, আমাদের এত ঝক্কিও নেই। প্রিভেন্টিভ মেডিসিন।

> ইয়াঈশ ইবনু তিখফা গিফারি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, একদা আমি মাসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে নড়িয়ে বলল, ''এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।' তিনি বলেন, 'আমি তাকিয়ে দেখলাম তো তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন।' [১১৩]

> আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে নিজ পায়ের দ্বারা আঘাত করে বললেন, "ওঠো, এটা তো জাহান্নামিদের শোয়া।"[১১৪]

[১১২] Is It Bad to Sleep on Your Stomach? September 29, 2018, Medically reviewed by Suzanne Falck, M.D., FACP (www.healthline.com)

[১১৩] আবূ দাউদ ৫০৪০; ইবনু মাজাহ ৩৭২৩; তিরমিযি, ২৭৬৮। (iHadis app)

[১১৪] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২০০; ইবনু মাজাহ, ৩৭২৫।

"আবু যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা মেরে বললেন, "হে জুনাইদিব ! এটা তো জাহান্নামবাসীদের শয়ন।"[১১৫]

ছেলেদের আরও বিরাট একটা ভয় আছে এভাবে শুলে। অণ্ডকোষ দুটো যে ওর সাথে লাগানো স্পার্মাটিক কর্ড। মানে শুক্রাণু আসার নালী। হাত দিলেই পাবেন। ও বস্তু পেঁচিয়ে গেলে 'আব্বা গো, আম্মা গো' টাইপ ব্যাথা হয়। টেস্টিকুলার টর্শন বলি আমরা। এমনকি প্যাঁচ খেয়ে রক্ত সাপ্লাই বন্ধ হয়ে স্থায়ী ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ হলো Improper sleeping position [১১৬] যার কারণে একটা বড় অংশই ঘটে ঘুমের ভেতর। বুইঝেন।
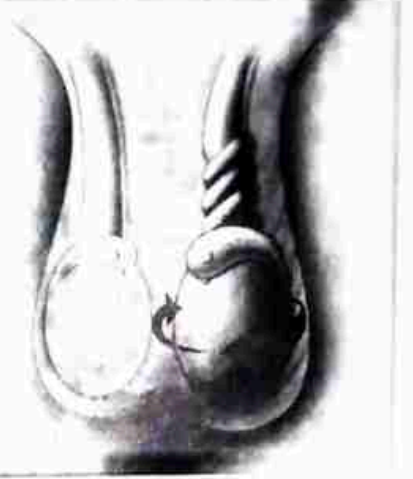
আল্লাহ পছন্দ করেন না, জাহান্নামিদের আলামত, নবিজির নিষেধ—এগুলো যে মেনেছে, সে ব্যাথা-বেদনা থেকেও বেঁচেছে। যদি ক্ষতি না-ও থাকত, ক্ষতি বোঝা না-ও যেত, সে কি বাঁচত না। আল্লাহর নারাজি থেকে বাঁচত। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী? ডানকাতে আমরা শুই স্বাস্থ্য-বেনিফিটের জন্য নয়, আল্লাহর আদেশের জন্য: *'রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো।' 'তোমাদের জন্য রাসূলের মাঝে আছে উত্তম আদর্শ (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)'।* সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুন্নাহ মেনে চলার জন্য আমাদের প্রমাণ লাগে না।

[১১৫] ইবনু মাজাহ, ৩৭২৪।

[১১৬] Dr. Sumit Sharma, MCH-Urology, M.S. (General Surgery) , MBBS, Urologist, Gurgaon

মধু

সেই প্রাচীনকাল থেকেই মধু একটা ওষুধ। শরীরে মধুর কী কী বেনিফিট আছে, এটা নিয়ে লেখাজোখা কম হয়নি। দৈনিক খালিপেটে একটু মধু খেলে যে খুব উপকার, এটা নিয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। যে প্রশ্নটা ওঠে সেইটে নিয়ে কিছু কথা বলি। প্রশ্নটা হলো, ডায়বেটিস রোগীর তো মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাওয়া নিষেধ, তাহলে মধু কীভাবে খাবে।

একটু ডাক্তারি না কপচালে চলছে না। সোজা বাংলায়, রক্তে গ্লুকোজ যতটুকু থাকার কথা তার চেয়ে বেশি হাই হয়ে থাকাকে ডায়বেটিস বলে। খাদ্যশস্য, চাল, আটা, আলু, মিষ্টিফল, চিনি, মধু—এরা সবাই পেটে হজম হয়ে রক্তে গ্লুকোজ হিসেবে যায়। এই গ্লুকোজটার ঘুরে বেড়ানোর কথা না রক্তে। সে প্রতি কোষে কোষে যাবে, সেখানে জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে। এটা ছিল তার কাজ। অতিরিক্ত রয়ে গেলে স্টোরে (লিভার কোষ-পেশিতে) গিয়ে জমা থাকবে। আরও যদি উদ্বৃত্ত থাকে সেটাকে চর্বি আকারে চামড়ার নিচে, পেটে এসব জায়গা বেজায়গায় জমা রাখা হবে। গ্লুকোজ যেন নিয়মকানুন মেনে চলে সেজন্য একজন পুলিশ আবার সেট করা আছে, তার নাম ইনসুলিন। রক্তে গ্লুকোজের বান ডেকেছে টের পেলেই পাতার মতন একটা অঙ্গ (অগ্ন্যাশয়) থেকে সে বের হবে লাঠি হাতে। এরপর গ্লুকোজকে পিটিয়ে কোষের ভেতর, বা যেখানে যেখানে যাবার কথা সেখানে ঢুকিয়ে দেবে। এবার ভাবেন কখন গ্লুকোজ নিয়ম মানছে না, রক্তে রক্তে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক. যদি ব্যারাকে পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকে। মানে কোনো কারণে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না (Type 1)।

আর দুই. ইনসুলিন পর্যাপ্ত আছে, কিন্তু কামের না। পুলিশের কথায় কোষের দরজা খুলে দেবার কথা ছিল, কিন্তু কোষ আর পুলিশের কথা শুনছে না, চিনছে না পুলিশকে (Type 2)।

ফলে যেটা হচ্ছে, বখাটে গ্লুকোজেরা রক্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে। প্রস্রাবের সাথেও বেরোচ্ছে। ইনফেকশানের জন্য উর্বর ভূমি হিসেবে কাজ করছে। ফলে কিডনি

ও চোখ হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে। ইনফেকশান হলে সহজে সারছে না।

এইজন্য ডাক্তারেরা মিষ্টি খেতে নিষেধ করেন। কারণ ভাত-রুটি আপনাকে খেতেই হচ্ছে, মিষ্টিটা হয়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত। এখন হলো আসল কাহিনি। 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' (GI) বলে একটা কথা আছে। যার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি, সে রক্তে গ্লুকোজ দেয় বেশি, মানে সে ডায়বেটিস বাড়ায়। নিচের চার্টটা দেখেন। হার্ভার্ড-এর চার্ট। [১১৭]

খাবার	GI (গ্লুকোজকে ১০০ ধরে)
সাদা আটা	৭৫ (±২)
লাল আটা	৭৪ (±২)
সাদা ভাত	৭৩ (±৪)
লাল চালের ভাত	৬৮ (±৪)
আলু সেদ্ধ	৭৮ (±৪)
আলু ভর্তা	৮৭ (±৩)
চিনি (সুক্রোজ)	৬৫ (±৪)
মধু	৬১ (±৩)[৩২-৮৫] গড়ে ৫৫(±৫)[১]
খেজুর	৪৬-৫৫ (±৭)[২]

[১] Bogdanov S et al. (Swiss Bee Research Centre, Bern, Switzerland) "Honey for nutrition and health: a review." Journal of the American College of Nutrition, 2008 Dec; 27(6):677-89.

[২] Alkaabi, Juma M et al. "Glycemic indices of five varieties of dates in healthy and diabetic subjects." Nutrition journal vol. 10 59. 28 May. 2011

মানে মধু গড়ে ভাত-রুটি-আলু-চিনির চেয়ে নিরাপদ, ডায়বেটিস রোগীর জন্য। এখন ৩২-৮৫, এত ভ্যারিয়েশান কেন? মধুর উৎসের ওপর (কোন ফুলের) নির্ভর করে। মধুর প্রধান উপাদান গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ। যার ফ্রুক্টোজ বেশি, তার GI কম। যেমন বাবলা ফুলের মধুর ৩২, আবার এক কমার্শিয়াল মধুর ৭২, অজানা এক মধুর ৮৭। এখন কমার্শিয়াল আর অজানা স্যাম্পলে গুড়-চিনি মিশিয়ে দিলে (যেমনটা আমাদের দেশে হয়) সেটা তো আর মধুর দোষ না। মূলত এক ফুলের (unifloral) মধুতে GI কম। তাহলে বোঝা গেল, মধু ভালো জিনিস। ডায়বেটিস রোগী, যে ভাত খায়, রুটি খায়, সে নিশ্চিন্তে মধু খেতে পারবে।

বিশেষ করে যার টাইপ জানা যায় না (Bejan 1978) ও টাইপ-২ এমন ডায়বেটিসের রোগীদের দেহে মধু বেশ স্যুট করে (Bornet 1985, Katsilambros 1988, Samanta

[১১৭] American Diabetes Association এর অনুমতিক্রমে "International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008" by Fiona S. Atkinson, Kaye Foster-Powell, and Jennie C. Brand-Miller in the December 2008 issue of Diabetes Care, Vol. 31, number 12, pages 2281-2283.সূত্রে Glycemic index for 60+ foods.

1985)। শুধু তাই না, একজন ডায়বেটিস রোগীর মধু খাওয়াই উচিত। কেননা মধু তার ডায়বেটিস রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটায়।

- ৩টা রিসার্চে দেখা যাচ্ছে, ডায়বেটিস রোগীকে প্রাকৃতিক মধু খাওয়ালে তার রক্তে ভেসে বেড়ানো গ্লুকোজ ব্যাপকভাবে কমে (al-Waili 2003, Peretti 1994)
- সুস্থ মানুষকেও মধু সেবন করালে তার রক্তে গ্লুকোজের লেভেল কমে চিনির চেয়ে (shanbaugh 1990), ডায়বেটিসের ঝুঁকি কমে।
- আবার যাদের ইনসুলিন কম প্রোডাকশান হয়, তাদের ক্ষেত্রেও চিনির চেয়ে মধু বেশি ইনসুলিন লেভেল বাড়ায়। খাবার ৩০ মিনিট পর, ২ ঘন্টা পর এবং ৩ ঘণ্টা পর। (Al-Waili 2004, (Sharafetdinov 2002)
- non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)-এর রোগীদের (যাদের ইনসুলিন কাজ করে না) রক্তে গ্লুকোজ লেভেল কমাতে সাহায্য করে মধু। (Ionescu-Tirgoviste et al. 1983)

বাংলাদেশি মধুর ওপর একটা রিসার্চ করেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর আর রাজশাহী ভার্সিটির Biochemistry and Molecular Biology-র তিন প্রোফেসর। সেখানেও তারা পরামর্শ দিয়েছেন, ডায়বেটিস রোগীর চিনি না খেয়ে মধু খাবার ব্যাপারে। (Ibrahim Khalil, 2006)

এবার মধুর বাকি গুণকীর্তনও শেষ করি, শুরু যেহেতু করেইছি। সুইজারল্যাণ্ডের সরকারি প্রতিষ্ঠান Swiss Bee Research Centre-এর গবেষক জনাব Stefan Bogdanov PhD প্রায় ১৭০টি রিসার্চ পেপার ঘেঁটে একটা রিভিউ লিখেছেন, যেটা আবার ছেপেছে American College of Nutrition তাদের জার্নালে। ওজন আছে।

এন্টি-অক্সিডেন্ট

আমাদের কোষে কোষে জানেনই তো হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে চলেছে প্রতি সেকেণ্ডে। একটা কারখানার মত একেকটা কোষ। একই সাথে একই মুহূর্তে হাজারো বিক্রিয়া ঘটে চলেছে। কিন্তু এতই সাজানো যে, এক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। এজন্যই আমি সবখানে বলি, এত জটিল এই মানবদেহ যে, সুস্থ যে আছি, এটাই আল্লাহর কুদরত। প্যাঁচগোচ লেগে অসুস্থ হওয়াই বরং স্বাভাবিক। সে গল্প আরেকদিন। তো যেকোনো বিক্রিয়ায় বর্জ্য তো তৈরি হয়ই জানেন, এদের কিছু অকেজো, আর কিছু আবার বিষাক্ত। বিষাক্ত বর্জ্যগুলোর মধ্যে একটা হলো—ফ্রী র‍্যাডিক্যাল। মানে হলো,
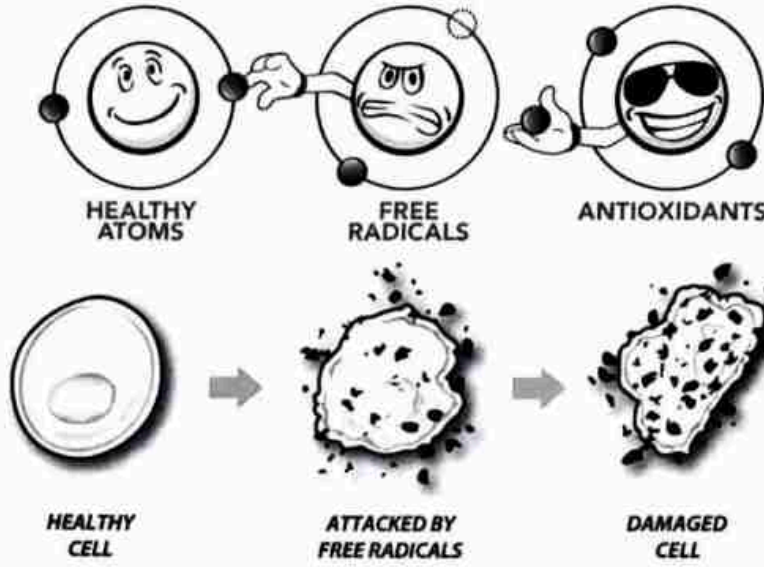
এমন কিছু অণু যাদের একটা বেজোড় ইলেক্ট্রন থাকে। এই বেজোড় ইলেকট্রনটা ভয়ংকর। কোষের যত মেশিনপত্র আছে, প্রায় সবই লিপিডের (চর্বি)। এই ইলেকট্রন সরাসরি মেশিনপত্র ধ্বংস করা শুরু করে। এদের বলে 'অক্সিডেন্ট'। তো এদের নিউট্রালাইজ মানে অফ করে দেওয়ার জিনিসও বডিতে দেওয়াই আছে। তাদেরকে বলে 'এন্টি-অক্সিডেন্ট'। কাজ খুব সোজা, জাস্ট আবিয়াইত্তা ইলেক্ট্রনটাকে বিবাহ দিয়ে দিতে হবে, মানে জোড়া করে দিতে হবে। যেমন- ভিটামিন এ-সি-ই এদের অফ করে, এরকম আরও আছে। এই বদগুলোকে যদি অফ করে দেওয়া না হয়, তাহলে বিভিন্ন ক্রনিক (দীর্ঘ-ভোগান্তি) রোগ দেখা দেয়। তো Bogdanov সাহেব ১০টা রিসার্চ থেকে দেখান—

- মধু এর glucose oxidase, catalase, ascorbic acid, flavonoids, phenolic acids, carotenoid derivatives, organic acids, Maillard reaction products, amino acids and proteins-সহযোগে ব্যাপক এন্টি-অক্সিডেন্ট তৎপরতা দেখায়।
- বিশেষ করে মধুর polyphenols যে অক্সিডেন্টদের নিষ্ক্রিয় করে, এটা তো ল্যাবে মাপা-ই যায়। (Gheldof, 2003)
- মধু দেহের অন্যান্য এন্টি-অক্সিডেন্ট যারা আছে, তাদের পরিমাণও বাড়ায়। রক্তে vitamin C বাড়ায় ৪৭%, β-carotene ৩%, uric acid ১২%, glutathione reductase ৭%।(Al-Waili, 2003)

টিউমার-রোধী

টিউমার কীভাবে হয়, এটা একটু বলে নিতে হবে। আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত কোষ বিভাজন চলছে। একটা কোষ থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে। প্রতিনিয়ত একদিকে কোষ মরছে, আরেকদিকে নতুন তৈরি হচ্ছে। বিল্ডিং-এর যেমন প্ল্যান থাকে, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন থাকে, রাজমিস্ত্রীরা সে মোতাবেক কাজ করে। নতুন নতুন
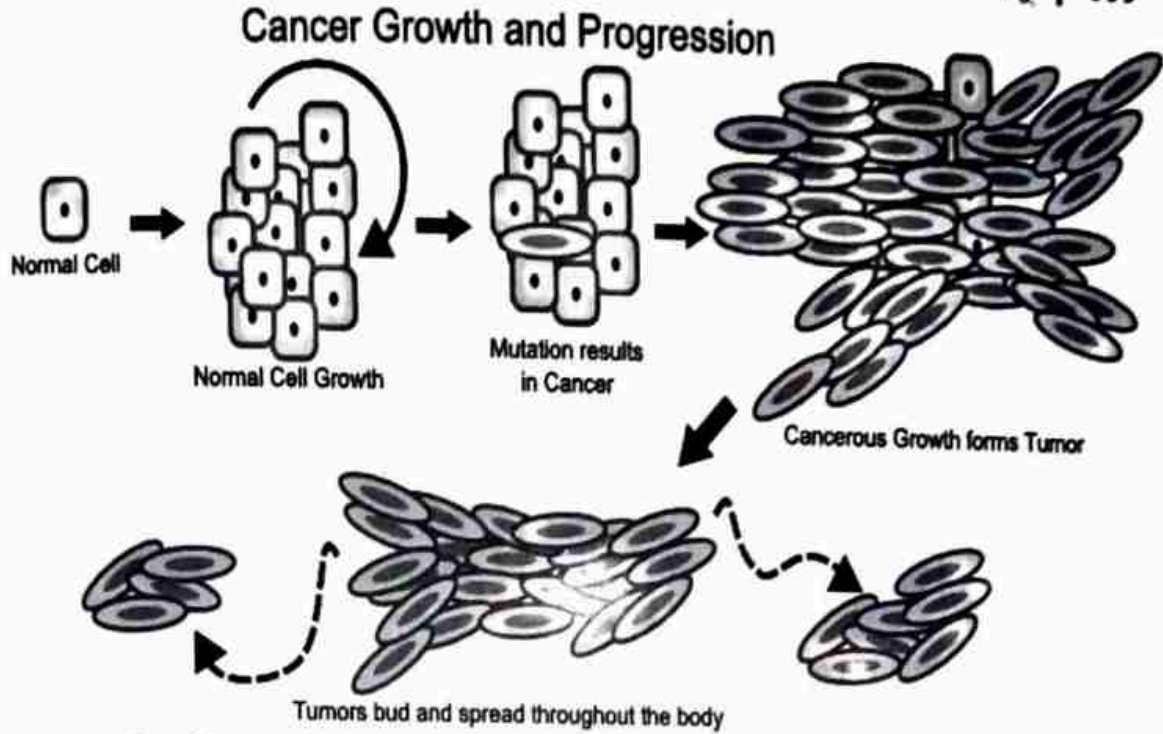
কোষে কী কী থাকবে, সেই নকশা থাকে পুরোন কোষের নিউক্লিয়াস সিন্দুকের ভেতরে ক্রোমোজোমের দলীলে। সেই দলীলে নকশা ফটোকপি করে নিয়ে আসে m-RNA (ট্রান্সক্রিপশান)। সেটা নিয়ে সে দেয় কারখানায় (রাইবোজোম)। কারখানায় তখন সেই নকশা মোতাবেক জিনিসপত্র উৎপাদন শুরু হয়, যেগুলো নতুন কোষে লাগবে (ট্রান্সলেশান)। ভুলভাল জিনিস বানালে সেটা আবার প্রুফরিডিং করা হয়, বাতিল করা হয়। নতুন কোষ কয়টা হবে, না হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মূল দলীলও দুই কপি হয়। জিনিসপত্র বানানো হলে কোষ ভাগ হয়ে যন্ত্রাংশগুলো অ্যাসেম্বল করা হয়। এখন কোনো কারণে যদি কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ হয় যে আদেশবলে, সেই আদেশটা মুছে যায়। আদেশের নকশাটা কেউ ধ্বংস করে দেয় বা লুকিয়ে রাখে, তখন কোষ বিভাজন হতেই থাকে হতেই থাকে। যখন থামার কথা ছিল, তখন থামে না। কারখানার প্রোডাকশন থামে না। এই নকশা চেঞ্জ করাকে বলে মিউটেশান।
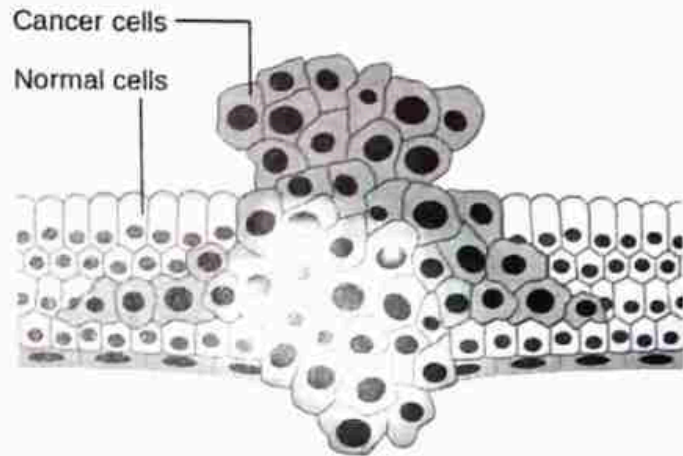
- যেমন একটা হলো, ভাজাপোড়া খাবারে উৎপন্ন হয় Trp-p-1 (একটা heterocyclic amine)। সব ধরনের মধুই এই শয়তানটাকে থামায় (Wang, 2002)।

- ইঁদুরের স্তন ক্যান্সার এবং কোলন ক্যান্সারে মধু প্রয়োগ করে দেখা গেল, ক্যান্সার ছড়াচ্ছে কম (anti-metastatic effect)। ইঁদুরে টিউমার কোষ ঢুকানোর আগে দিনে একবার ১-২ গ্রাম/কেজি ডোজে ১০ দিন মধু খাওয়ানো হলো। দেখা গেল, টিউমার ছড়াচ্ছে বেশ দেরিতে। (Orsolic, 2003)
- ইঁদুরের মূত্রথলির ক্যান্সারেও মধু মুখে খাইয়ে ও সরাসরি টিউমারে লাগিয়ে এন্টি-টিউমার ইফেক্ট এসেছে। দেহের ভেতরেও, দেহের বাইরে পেট্রিডিশেও।

প্রদাহ-রোধী

প্রদাহ (inflammation) আমাদের দেহেরই একটা প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া। ৪টা জিনিসকে একসাথে 'প্রদাহ' বলে। যে জায়গায় প্রদাহ হবে, সেখানে—

➡ তাপমাত্রা বেড়ে যাবে (calor)
➡ রক্ত চলাচল বেড়ে যাবে। গিয়ে লাল হবে (rubor)
➡ ব্যথা হবে (dolor)
➡ ফুলবে (tumor)

জীবাণুর বিরুদ্ধে এটা আমাদের দেহের মিলিটারি কৌশল। একটা ফোড়ার কথা ভাবেন। ফোলে, লাল হয়, গরম গরম লাগে, টনটন করে। জীবাণু যেখানে থাকে সেখানে রক্তনালী প্রচুর তরল জমা করে (ফোলে), যাতে সেনাগুলো (শ্বেতকণিকা) চলাচল করতে পারে অনায়াসে। জায়গাটাকে গরম করে রাখে, যাতে জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঠেকানো যায়। রক্ত চলাচল বাড়ায়, যাতে সেই রক্তের মাধ্যমে দ্রুত প্রচুর সেনা পৌঁছানো যায় অকুস্থলে। আর ব্যথা হয়, যাতে আক্রান্ত অঙ্গ রেস্ট পায়।

কিন্তু সমস্যা হলো, কখনও কখনও নিজের দেহের কোনো কোনো কোষকেই এই সেনারা জীবাণু ঠাউরে নেয়। জীবাণুর সাথে গঠনগত কোনো মিল হয়তো পায়, পেয়ে আক্রমণ করে বসে। প্রদাহ শুরু হয়। এগুলোকে আত্মসংগ্রামী রোগ (autoimmune) বলে। তখন আমরা সাধারণত বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে এই মাথাগরম সেনাগুলোকে ঠাণ্ডা রাখি, বা যেসব পাড়াবেড়ানি কুটনী বুড়ি জীবাণুর গুজব রটিয়ে সেনাদের ডেকে আনে (নানা কেমিক্যাল inflammatory mediators), সেগুলোকে লকডাউন করে রাখি। এসব দুষ্ট বুড়িদের মধ্যে আছে thromboxane, PG, PGE, PGF, TNF, VIP.

- গবেষণায় (Al-Waili, 2003) এসেছে ৭০ গ্রাম মধু খাইয়ে দেবার পর রক্তে এই দুষ্ট বুড়িদের পরিমাণ বিস্ময়কর ভাবে কমে গেছে (!)।
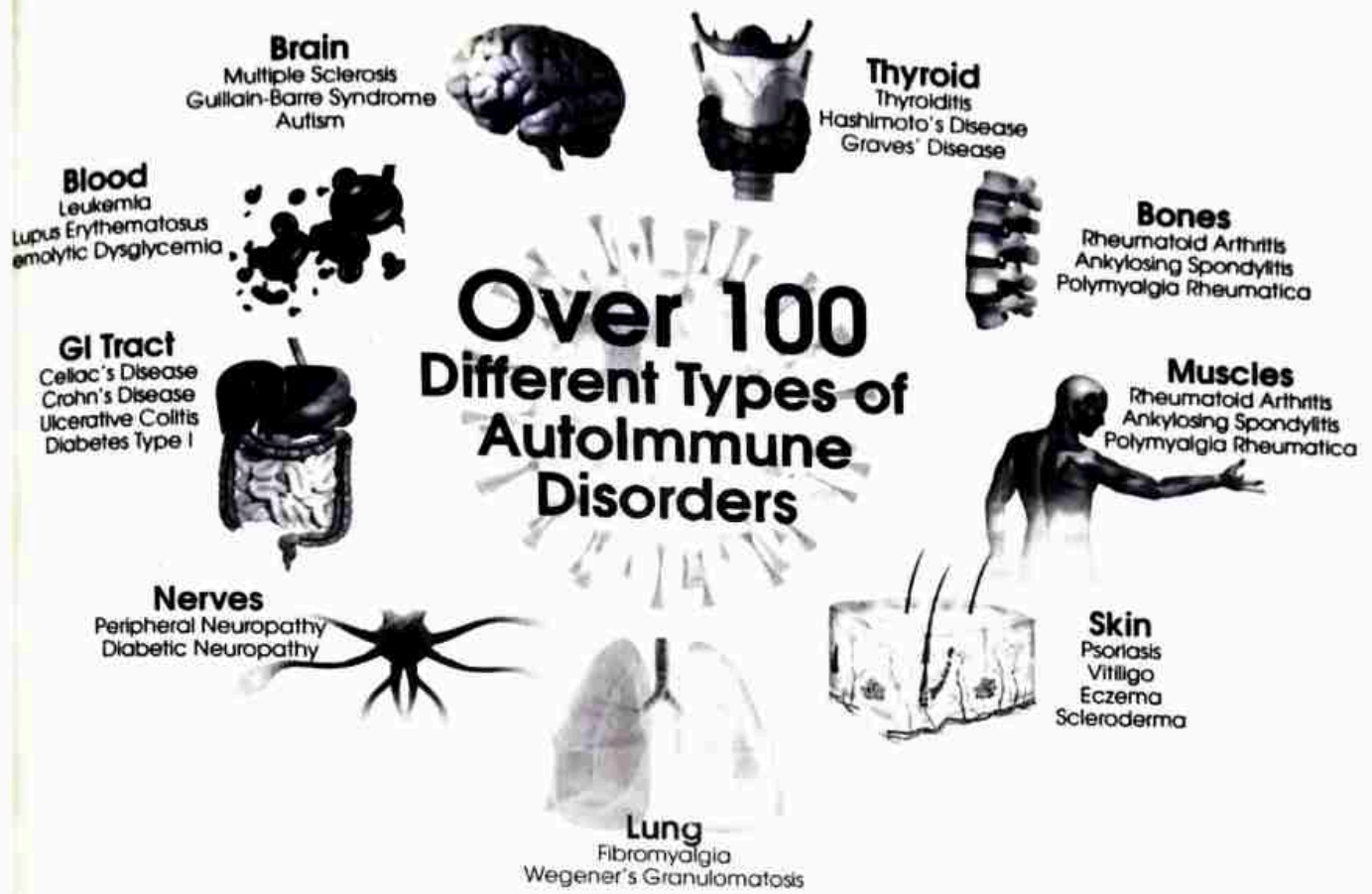
দুষ্টবুড়ি	১ ঘন্টা পর কমেছে	২ ঘণ্টা পর	৩ ঘণ্টা পর	১৫ দিন পর
thromboxane B_2	৭%	৩৪%	৩৫%	৪৮%
PGE_2	১৪%	১০%	১৯%	৬৩%
PGF_{2a}		৩১%	১৪%	৫০%

- এরকম পেটের একটা অসুখ আছে। inflammatory bowel disease বলি আমরা (IBD)। এর দুটা সাবটাইপ আছে—crohn's disease (CD) আর ulcerative colitis (UC)। ইঁদুরে মধু এই প্রদাহ কমিয়েছে। এমনকি UC যেটা, সেটাতে prednisolone-এর সমান কার্যকারিতা শো করেছে। (Bilsel, 2002)
- কীভাবে মধু এই প্রদাহ কমিয়ে থাকে, সেটা নিয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। কেউ বলছেন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে প্রদাহ কমায়, কেউ বলছেন অক্সিডেন্ট প্রশমন করে প্রদাহ কমায়। কিন্তু রিসার্চ বলছে (Munn 2001, International Bee Research Association), যে প্রদাহে কোনো ব্যাকটেরিয়া নেই, সেই প্রদাহও মধু কমিয়েছে। মানে স্টেরয়েড, NSAID-এর মত হলো মধুর সরাসরি প্রদাহ-রোধী অ্যাকশান আছে।

আমার জাতভাই ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা। একটা সময় ডাক্তারেরা ওষুধের সাথে 'পথ্য' দিত। পথ্য হচ্ছে ওষুধের ক্ষমতা বাড়ায়, এমন খাবার। ছাগলের দুধ থেকে নিয়ে বিশেষ কোনো ফল, কচু, কাঁচকলা, পেঁপেসেদ্ধ। আগের যুগের সব অ্যালোপ্যাথি

ডাক্তাররাই দিতেন। আজ এই পুঁজিবাদী মেডিসিন ব্যবস্থার ক্রীড়নক হয়ে গেছি আমরা। আপনি কচুর কথা বলে দিলে, আয়রন ট্যাবলেটের ব্যবসা একটু কমে যাবে। এরকম বহু পথ্য আছে, যা রোগীর জন্য ওষুধের চেয়ে affordable ও feasible. বহু পথ্য আছে যা আপনার ওষুধের কার্যকারিতা বাড়াবে। বহু পথ্য আছে, যা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার মেয়াদ কমিয়ে দেবে। যেটা পুঁজিবাদের জন্য লোকসান। এজন্য পথ্য-কে আনস্মার্ট বানানো হয়েছে। কাউকে মধু-কালোজিরা খেতে বললে মুসলিম ডাক্তারদের অনেকেই এমন চেহারা বানান, যেন মনে হয় আমি পাগলা-গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছি। পথ্যকে আমাদের মেইনস্ট্রীমে আনা দরকার। থার্ড ওয়ার্ল্ডের গরিব দেশের জন্য শুধু বড়লোকের চিকিৎসার দিকে চেয়ে থাকা বিলাসিতা। ওপরে মধুর ব্যাপারে যে আলোচনা করলাম, যদিও এগুলো প্রাথমিক রিসার্চ বা এনিম্যাল রিসার্চ। তারপরও এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, কেননা এগুলো ড্রাগ না, এগুলো পথ্য। মধুর anti-inflammatory property অবশ্যই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। arthritis, nephrotic syndrome, rheumatic fever ইত্যাদি সব ধরনের অটো-ইমিউন রোগে পথ্য হিসেবে মধু আমাদের নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা উচিত।

আরও কিছু অসুখ-বিসুখে দ্রুত কিছু আলাপ সেরে নিই।

- দাঁতক্ষয়: দাঁত ও মাড়ির ইনফেকশন প্রতিরোধে ও নিরাময়ে মধু কাজ করে। চিনির চেয়ে মধু দাঁত-বান্ধব।
- উদরাময়:

➡ Bogdanov সাহেব তাঁর রিভিউয়ে পূর্ব ইউরোপের ৭টা আর আরবের ১টা রিসার্চ উল্লেখ করেন, যেখানে গ্যাস্টিকের সমস্যা (peptic ulcers, gastritis) এবং ডায়রিয়া-বমিতে (gastroenteritis) মধুর কার্যকারিতা উঠে এসেছে।

➡ ডায়রিয়াতে আমরা যে প্রোবায়োটিক দিই ভালো ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর জন্য (goodgut/probio), ৩টা রিসার্চে এসেছে, মধু bifidobacteria আর lactobacilli-র কলোনি তৈরি করে। মানুষ ও ইঁদুরে পাওয়া গেছে।

➡ একটা ক্লিনিক্যাল স্টাডিতে (Haffejee 1985, BMJ) এসেছে, মধু বাচ্চাদের ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়ার সময় কমিয়ে আনে (আমরা enterogermina ব্যবহার করে যে কাজটা করি)। আর 'ব্যাকটেরিয়া ছাড়া ডায়রিয়া'তেও দিন বাড়তে দেয় না।

➡ পাকস্থলীর আলসার সৃষ্টিকারী Helicobacter pylori জীবাণুর শক্তিশালী প্রতিরোধক মধু। (৩টা রিসার্চ)

➡ এমনকি ব্যথার বড়ি (NSAID induced) ও এলকোহলের কারণে যে আলসার হয়, ইঁদুরে পাওয়া গেছে যে মধু সেটাও রোধ করে। (৪টা রিসার্চ)

➡ মধু খেলে পাকস্থলীর রসের এসিডিটি ৫৬% পর্যন্ত কমে, যেটা আমরা সেকলো-সারজেল

খেয়ে কমাই। (Baltuskevicius, 2001)

➡ আবার একটু বেশি ডোজে মধু খেলে (৫০-১০০ গ্রাম) তার আবার সামান্য জোলাপের (laxative) ক্রিয়া আছে। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে কোষ্ঠকাঠিন্যে মধু ব্যবহৃত হয়।

- Journal of Medicinal Food-এ ২০০৪ এ একটা রিসার্চ প্রকাশিত হয়। রিসার্চ পরিচালনা করেন New York Medical Care for Nephrology-র Noori S Al-Waili, MD , PhD, FACP , FASN, CWSP. বিভিন্ন জার্নালে ১৪০টা পাবলিকেশন রয়েছে ভদ্রলোকের। তিনি ৭৫ গ্রাম মধু আর ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ-ফ্রুক্টজ মিশ্রণ খাইয়ে দেখেন রক্তে বিভিন্ন উপাদানের কী অবস্থা।

উপাদান	মধু	গ্লুকোজ-ফ্রুক্টোজ দ্রবণ
টোটাল কোলেস্টেরল	↓	↑
LDL- কোলেস্টেরল (খারাপ)	↓	↑
HDL- কোলেস্টেরল (ভালো)	↑	↓
ট্রাইগ্লিসারাইড	↓	↑
রক্তে গ্লুকোজ	↓	↑
ইনসুলিন	↓	↑
CRP	↓	↑

শেষে একটা মজার গল্প বলে যাই। বাচ্চার মায়েরা তালীম করছে, সাপ্তাহিক তালীম। আমি বাচ্চা নিয়ে বাইরে হাঁটাচলা করছি। যে বাসায় তালীমটা হয়, সে বাসার মালিক আবূ বকর ভাইয়ের আবার মধুর ব্যবসা। বাসার সামনে এমনি এমনি দুটো মৌচাক করা, কাঠের। আমি, বাচ্চা আর আবূ বকর ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৌমাছিদের আনাগোনা খেয়াল করছিলাম। নিচে একটা ছোট্ট গেট, আর পুরো কাঠের কাঠামোতে কোনো প্রবেশপথ নেই। আর প্রবেশ পথের দুই পাশে প্রহরীর মত দুই-চারটা মৌমাছি দাঁড়ানো। কেউ ঢুকার আগে এক সেকেণ্ড চেক করছে, এরপর ঢুকতে দিচ্ছে। যে মাছিটা মধু নিয়ে এসেছে তার চিহ্ন হলো, পেছনের পায়ে রেণু মাখা থাকে। কেউ কেউ খালি 'পায়ে' ফেরত আসছে, তাকেও চেক করে ঢুকতে দিচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর সে দৃশ্য। এমন সময় আবূ বকর ভাই হেভি একটা তথ্য দিলেন: যদি কোনো মাছি ভুল করে কোনো পচা ময়লার ওপর বসে, এই প্রহরীরা টের পেয়ে তাকে গেটেই মেরে ফেলে। লাশ পড়ে থাকে চাকের নিচে। সাথে সাথে কুরআনের আয়াত মনে পড়ে গেল। সূরা মুহাম্মাদের ১৫ নম্বর আয়াত। মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে থাকবে নির্মল পানির ঝরনা, দুধের ঝরনা যার স্বাদ বদলাবে না, সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিচ্ছন্ন শোধিত মধুর ঝরনা। 'عَسَلٍ مُّصَفًّى'। সাফ মধু। এক বিন্দু কোনো ময়লা দূষণ নেই। একদম সাফসুতরা। দুনিয়াতেও আল্লাহ মৌচাকে এভাবেই মধুকে সাফ রাখেন। এক বিন্দু দূষণ হতে দেন না। প্রাণের বিনিময়ে পরিচ্ছন্ন রাখা হয় চাকের

মধুকে। শোধন করা হয় জীবনের ফিল্টারে। সুবহানাল্লাহ।

> আল্লাহ তাআলা বলেন: ... "তার উদর হতে নির্গত হয় নানা রঙের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। "[সূরা নাহল, ১৬ : ৬৯]

> এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: 'আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে।'
>
> তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাকে মধু পান করাও।"
> এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার আসলে তিনি আবার বললেন: "তাকে মধু পান করাও।"
> সে তৃতীয়বার আসলে তিনি আবারও বললেন: "তাকে মধু পান করাও।"
> এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল: 'আমি অনুরূপই করেছি।' (তাও সারছে না)
> তখন নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও।"
> সে তাকে আবার মধু পান করালো। এবার সে আরোগ্য লাভ করল।[১১৮]

> ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তিন জিনিসে রোগমুক্তি নিহিত—মধুপানে, রক্তমোক্ষণে (হিজামা) এবং তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করতে বারণ করেছি। [১১৯]

> আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দুই আরোগ্য দানকারী বস্তুকে অবশ্যই তোমাদের গ্রহণ করা উচিত—মধু ও কুরআন মাজীদ।"[১২০]

> আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরবেলা মধু চেটে চেটে খেলে সে মারাত্মক কোনো বিপদে আক্রান্ত হবে না।"[১২১]

তবে কথা আছে। চিনির শিরা খেয়ে যদি আপনি বলেন 'নবিজির হাদীস ভুল', তাহলে কার কী করার আছে? কিচ্ছু করার নাই। হাদীস বলেছে মধু খেতে, চিনি নিয়ে তো কোনো ওয়াদা নাই।

---

[১১৮] বুখারি, ৫৬৮৪, ৫৭১৬ (iHadis)

[১১৯] ইবনু মাজাহ, ৩৪৯১, আলবানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে সহীহ।

[১২০] ইবনু মাজাহ, ৩৪৫২, আলবানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে দুর্বল তবে মাওকূফ সূত্রে সহীহ।
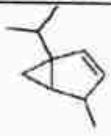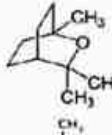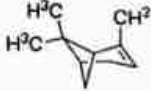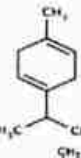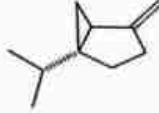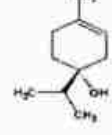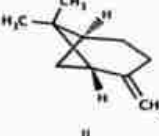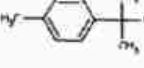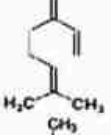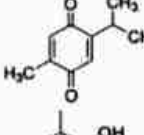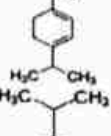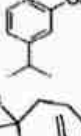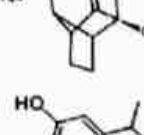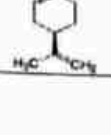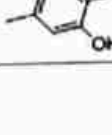
[১২১] ইবনু মাজাহ, ৩৪৫০, আলবানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে দুর্বল।

কালোজিরা

প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয় চিকিৎসকেরা নানান অসুখে কালোজিরা ব্যবহার করতেন। যেমন—মাথাব্যথা, নাক-বন্ধ, দাঁতব্যথা, কৃমি, মাসিক স্বাভাবিক করা, স্তনে দুধ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

কালোজিরাতে রাসায়নিক উপাদান কী কী আছে প্রথমে একটু দেখে নেন (Ainane, 2014)। Thymoquinone কালোজিরার অধিকাংশ ঔষধি গুণের (pharmacological properties) জন্য দায়ী। কিন্তু মূলত সবগুলো কেমিক্যাল মিলেই সমন্বিতভাবে (synergistically) নিরাময়ে অংশ নেয়।

Compd.	Structure	Percentage	Compd.	Structure	Percentage
1		α-Thujen 6.9%	9		1,8-Cineol 0.1%
2		α-Pinen 1.7%	10		γ-Terpinen 3.5%
3		Sabinen 0.9%	11		Terpinen-4-ol 2.1%
4		β-Pinen 2.4%	12		p-Cymen-8-ol 0.2%
5		Myrcen 0.1%	13		Thymoquinon 3.0%
6		α-Terpinen 1.0%	14		Carvacrol 2.4%
7		p-Cymen 60.5%	15		Longifolen 0.9%
8		Limonen 1.4%	16		Thymohydroq-uinon 0.4%

ইরানের ৩ জন গবেষক [১২২] কালোজিরার (*Nigella sativa*) ওপর এ যাবৎ যত গবেষণা হয়েছে, এমন ১৯৯টি রিসার্চ পেপারের ওপর একটি রিভিউ লেখেন। যা ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় International Journal of Pharmacognosy-তে। আগ্রহীরা দেখতে পারেন। (Sara Darakhshan et al, 2015)

এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে

ইতিমধ্যে আপনারা জেনে ফেলেছেন অক্সিডেন্ট, এন্টি-অক্সিডেন্ট কারা। তারা কী করে আমাদের দেহে। মনে না থাকলে আরেকবার দেখে আসতে পারেন।

- এক স্টাডিতে এসেছে, কালোজিরার thymoquinone, carvacrol, t-anethole, আর 4-terpineol যে বীরত্বের সাথে ফ্রী র‍্যাডিকেল দমন করে, তা সম্মানের দাবিদার (Burits, 2000)। তারা আরও দেখিয়েছেন, আলাদাভাবে শুধু Thymoquinone (TQ) এর চেয়ে পুরো কালোজিরা তেলটার এই গুণ বেশি। মানে কেবল TQ-ই একমাত্র কার্যকর উপাদান না, বাকি আরও যা যা আছে, সবাই মিলেই সমন্বিতভাবে ঔষধি কার্যক্রম দেখায়।
- এছাড়াও বিভিন্ন ওষুধের কারণে বিশেষ করে ক্যান্সার কেমোথেরাপির কড়া ওষুধে এবং রেডিওথেরাপিতে প্রচুর অক্সিডেন্ট উৎপন্ন হয়। এজন্য আমরা কেমোর রোগীকে Rex নামে (এন্টি-অক্সিডেন্ট) একটা ওষুধ দিয়ে থাকি। কালোজিরা ওষুধের এই সাইড-ইফেক্ট (toxicity) কমায়।
  - ➡ ইঁদুরে cisplatin ও cyclosporine ওষুধের কড়াত্ব কমিয়েছে।
  - ➡ রেডিয়েশনের ফলে ইনজুরি তো কমায়ই। ইঁদুরের প্লীহার কোষকে কালোজিরার তেল ও ইথানলের মিশ্রণে কয়েকদিন রেখে এরপর রেডিয়েশন দিয়ে দেখা গেছে অক্সিডেন্ট উৎপাদনকে কমিয়ে দিয়েছে (lipid-peroxides আর oxygen species ROS)
  - ➡ রেডিয়েশনের ফলে কোষের নিউক্লিয়াসের ড্যামেজ রোধ করেছে।
  - ➡ এছাড়া কিডনির ওপর এন্টিবায়োটিক gentamicin-এর সাইড-ইফেক্ট (nephrotoxicity) কমিয়েছে।
- এছাড়াও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বর্জ্য আমাদের দেহে তৈরি হয়, খাবারের সাথে শ্বাসের সাথে বহু ক্ষতিকর কেমিক্যাল ঢোকে, ত্বকের সংস্পর্শে ক্ষতিকর কেমিক্যাল কোষের

---

[১২২] Sara Darakhshan (Department of Biology, Razi University), Reza Tahvilian (Department of Pharmaceutics, Kermanshah University of Medical Sciences) and Abasalt Hosseinzadeh Colagar (Department of Molecular and Cell Biology, University of Mazandaran)

আসে, সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকে লাগে। এরা সবাই অক্সিডেন্ট তৈরি করে যা দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সার থেকে নিয়ে বহু রোগ সৃষ্টি করে থাকে আমাদের দেহে। ফলে সুস্থ লোকদেরও খাওয়া উচিত কালোজিরা।

- ➡ CCl_4-এর ক্ষতি থেকে লিভারকে প্রটেকশন দেয়।
- ➡ benzo(a)pyrene-এর ক্ষতিকর প্রভাব কমায়।
- ➡ ferric-nitriloacetate ও potassium bromate ($KBrO_3$) দ্বারা কিডনির ক্ষতি হতে দেয় না, ফলে কিডনির ক্যান্সার থেকে বাঁচায়।
- ➡ ইঁদুরের কিডনিতে lipid peroxidation, gamma-glutamyl transpeptidase (GGT), H_2O_2 ও xanthine oxidase-এর লেভেল কমিয়ে রাখে। এই বদরাই অক্সিডেন্ট তৈরি করে বেশি বেশি।
- ➡ Propoxur এর দ্বারা ব্রেইনের ক্ষতি ব্যাপকভাবে কমিয়ে রাখে।
- ➡ SOD, catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX), glutathione-S-transferase (GST), adenosine deaminase (ADA) and myeloperoxidase (MPO) এরা হলো ভালো লোক। এরা দেহে এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কালোজিরা প্রয়োগে এদের লেভেল বেড়ে যায় শরীরে।

প্রদাহ-রোধী কার্যক্রম

- অকারণ প্রদাহ তৈরিকারী 'স্টার জলসা'র দুষ্ট কুটনী বুড়িদের কথা মনে আছে তো? এদের দমন করে কালোজিরা। এই সব বেদ্দপ বুড়িরা ৩টা রাস্তায় আসে। $COX_{1,2}$ রাস্তা আর 5-lipooxygenase রাস্তা। কালোজিরার Thymol বন্ধ করে COX_1 রাস্তা। আর COX_2 রাস্তা বন্ধ করে thymohydroquinone আর TQ. এছাড়া ৩ নম্বর রাস্তার কুটনী 5-HETE কেও আটকায়।
- অ্যাজমা বা হাঁপানির সমস্যাটাও প্রদাহ-টাইপ অসুখ। শ্বাসনালীতে একটা অহেতুক সাজ সাজ রব (hyper-responsive) তৈরি হয়। গেল গেল সব গেল, সব শেষ হয়ে গেল। ব্যাটার বউটা আমার ছেলেটার মাথা চিবিয়ে খেল। আসলে তেমন কিছুই হয়নি। ঠাণ্ডা-ধোঁয়া-ধুলা-বিশেষ কিছু খাবার (একসাথে allergen বলে), এগুলোর প্রতি অহেতুক সাড়া; আর কিছু না। এক ধরনের প্রতিরক্ষা কোষ আছে, বেসোফিল। আরেক নাম মাস্ট কোষ। এদের ভেতরে থাকে হিস্টামিন নামক এক কেমিক্যাল।

অ্যাজমা, এলার্জিক সর্দি, এলার্জিক চুলকানি—এগুলোর পিছনে এই মাস্ট কোষের অতিরিক্ত হাউকাউ দায়ী। এসব রোগীদের দেহে allergen-এর বিপরীতে প্রচুর IgE
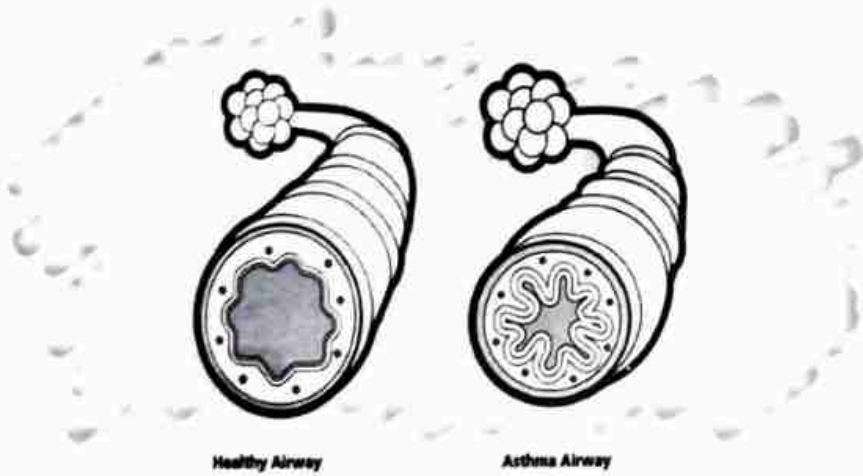
এন্টিবডি তৈরি হয়। আবার allergen ঢুকেছে টের পেলে আগে থেকেই রেডি এসব মাতুব্বররা দৌড়ে গিয়ে মাস্টকোষকে খবর দেয়। মাস্টকোষ নগদে ভুরি ভুরি হিস্টামিন বের করে দেয়। হিস্টামিন গিয়ে শ্বাসনালীর চিকন চিকন শাখা-প্রশাখার পেশি খিঁচুনি শুরু করে (শ্বাসকষ্ট, হাঁচি, চুলকানি), বেশি বেশি পানি নিঃসরণ করে (সর্দি, ত্বক ফুলা)। হিস্টাসিন, অ্যালাট্রল, ফেক্সো—এসব ওষুধ দিয়ে এই শোরগোল থামানো হয়।

কালোজিরা তেলও এই হিস্টামিনদের চিল্লাপাল্লা থামায়। কিন্তু মূল কুটনী IgE কিন্তু বেশি। মুখে ৮ সপ্তাহ কালোজিরা তেল খাওয়ানোর (৪০-৮০ mg/kg/day) পর দেখা গেল, IgE-ও কমেছে, আর তার ফ্যাক্টরি eosinophil কোষের সংখ্যাও কমে গেছে (Kalus, 2003)। গিনিপিগের ফুসফুসে দেখা গেল, leukotriene নামের আরেক চেঁচামেচিকেও কালজিরা থামায়, যেটা থামাতে আমরা montelukast ব্যবহার করি (El-Dakhakhny, 1965)।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে

টিউমার কীভাবে হয় আমরা জেনেছি। টিউমার ২ প্রকার: ভালো (benign), খারাপ (malignant) । খারাপ টিউমারকেই বলে ক্যান্সার। ক্যান্সার-কোষ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। শেষমেশ ছড়িয়ে পড়ে দেহের বিভিন্ন সুস্থ অঙ্গেও। তো ক্যান্সারের মূল চিকিৎসাই হলো, ক্যান্সার-কোষকে মেরে ফেলতে হবে। এজন্য ক্যান্সারের ওষুধকে বলে cytotoxic ওষুধ। এই ওষুধগুলো যে যে কোষকে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করতে দেখে সবগুলোকেই মেরে ফেলে। ভালো কোষও
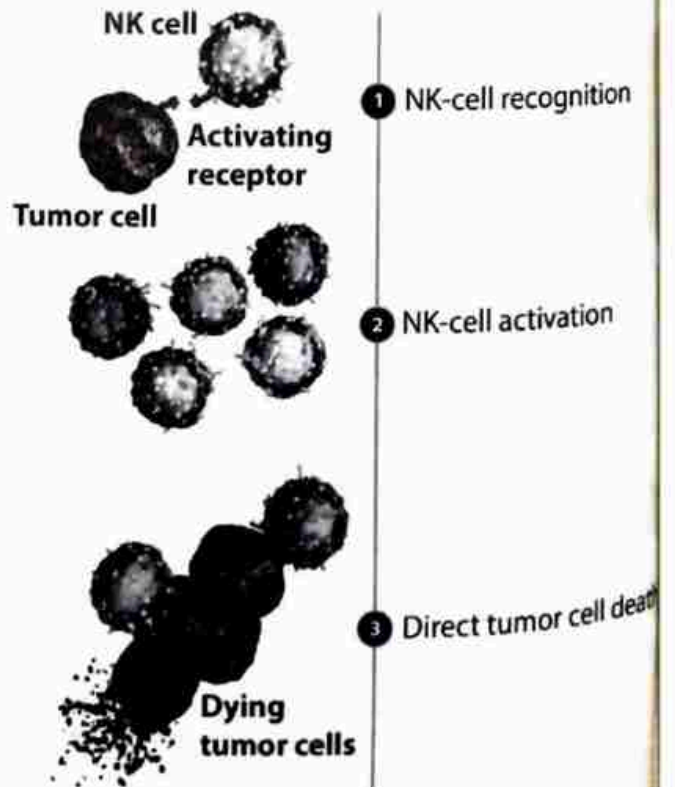
মারা পড়ে। এজন্য দেখবেন কেমোর রোগীর মুখে ঘা হয়, পাতলা পায়খানা হয়, বার বার রক্ত দেওয়া লাগে।

- আমাদের দেহেও কিছু পুলিশ-র‌্যাব কোষ আছে, যারা টিউমার কোষকে এনকাউন্টার-ক্রসফায়ার দেয়। এদের বলে natural killer কোষ (NK cell)। একসপ্তাহ কালোজিরা নির্যাস খাইয়ে দেখা গেছে, না খাইয়ে যা ছিল, তার চেয়ে কয়েকগুণ NK cell-এর সংখ্যাও বেড়েছে, তাদের ক্রসফায়ারও বেড়েছে।
- ক্যান্সারের আরেক ধরনের ওষুধ আছে যারা ডিএনএ ফটোকপি হবার হার কমায়। ডিএনএ ফটোকপি যত কম হবে, নতুন কোষের সংখ্যা বাড়তে পারবে না। ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ হবে। ইঁদুরে দেখা গেছে, (৫০-১০০ mg/kg body weight) ডোজে কালোজিরা নির্যাস খাইয়ে নতুন ডিএনএ তৈরি ব্যাপক হ্রাস ঘটানো গেছে।

ডায়াবেটিস

এক রিসার্চে এসেছে, কালোজিরার তেল রক্তে শুগার লেভেল কমিয়েছে (Houcher, 2007)। **মুখে লাগাতার কালোজিরা খেয়ে গেলে তা** metformin-**এর মতোই দারুণ কাজ করে।** কালোজিরার জলীয় দ্রবন ১০ দিন খাওয়ানোর পর ব্যাপক কমে এসেছে ব্লাড শুগার। কীভাবে কমায় কালোজিরা?

- আরেক রিসার্চে (Sankaranarayanan, 2009), ইঁদুরের অন্ত্রে (jejunum) গ্লুকোজ পরিবহন করে রক্তে নেওয়ার যে সিস্টেম, সেটাকে সরাসরি কমিয়ে দেয় কালোজিরার জলীয় দ্রবণ (০.১ pg/ml to ১০০ ng/ml)।
- প্রোটিন ও ফ্যাট থেকে নতুন করে গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে লিভার। কালোজিরা এটাকে বাধা দেয়। নতুন গ্লুকোজ তৈরি হয়ে রক্তে আসে না। (সেবনের ১ম সপ্তাহে)
- যেখানে ইনসুলিন তৈরি হয় (pancreatic beta-cells), তাদেরকে উদ্দীপিত করে ইনসুলিন প্রোডাকশান বাড়ায়। (সেবনের ৪র্থ সপ্তাহে)
- দুটো এনজাইমের মাধ্যমে ইনসুলিন তার কার্যসাধন করে (গ্লুকোজের মাত্রা স্থির রাখে রক্তে)—MAPK ও PKB. প্রাণিদেহে কালোজিরা দুটোর কর্মক্ষমতা বাড়িয়েছে।

WebMD খুবই জনপ্রিয় একটা মেডিকেল ওয়েবসাইট। সেখান থেকে সরাসরি তুলে দিচ্ছি। [১২৩] কালোজিরার সম্ভাব্য ইফেক্ট রয়েছে:

[১২৩] Vitamins & Supplements, BLACK SEED, WebMD

- **অ্যাজমা বা হাঁপানি:** প্রচলিত ওষুধের সাথে কালোজিরা খেলে কারও কারও কাশি-শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের ক্ষমতা বেড়েছে বলে রিসার্চে জানা গেছে। যাদের ফুসফুসের ক্ষমতা খুব কম তাদের ক্ষেত্রেই রেজাল্ট এসেছে। অবশ্য theophylline বা salbutamol ওষুধের মতো অতটা নয়।

- **ডায়বেটিস:** প্রাথমিক রিসার্চে এসেছে, ডায়বেটিস রোগীদের রক্তে শুগার ও কোলেস্টেরল লেভেল দুটোই কমিয়ে রাখে কালোজিরার গুঁড়ো সেবন। দিনে ২ গ্রাম পরিমাণ খেতে হবে উপকার পেতে হলে।

- **প্রেসার:** রিসার্চ বলছে, রক্তচাপ কিছুটা কমায় কালোজিরা।

- **পুরুষের বন্ধ্যাত্ব:** কালোজিরার তেল খেলে পুরুষের শুক্রাণুর সংখ্যা ও গতি দুটোই বাড়ে বলে গবেষণায় এসেছে।

- **স্তন প্রদাহ** (Mastalgia): যেসব নারীদের মাসিকের সময় স্তন-ব্যথা হয়, কালোজিরার তেলযুক্ত মলম দিলে ব্যথা কমে বলে জানা গেছে রিসার্চে।

যে সব ক্ষেত্রে কিছু প্রমাণ মিলেছে, যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি:

- **হে-ফীভার** (Hay fever): প্রাথমিক গবেষণায় এসেছে প্রতিদিন কালোজিরার তেল খেলে এলার্জি লক্ষণগুলো কমে।

- **এলার্জি-জনিত চুলকানি** (Eczema /atopic dermatitis): প্রাথমিক রিসার্চে এসেছে, চুলকানি ও ত্বকের প্রদাহ কমে কালোজিরার তেল খেলে। আর তেল-যুক্ত মলম দিলে খুব একটা উন্নতি হয় না।

- **থাইরয়েড সমস্যা** (autoimmune thyroiditis): কালোজিরায় থাইরয়েড ফাংশনের সবগুলো প্যারামিটারে উন্নতি হয়, তা না। বিশেষ করে Hashimoto's thyroiditis-এ।

- ক্যান্সার কেমো-তে আমাদের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার কিছু ক্ষতি হয়, শ্বেত রক্তকণিকারা মারা যায় (neutropenia)। রোজকার খাবারের সাথে কালোজিরা খেলে বাচ্চাদের বিশেষ করে, যাদের কেমো চলছে। তাদের ইনফেকশনের কারণে জ্বর আসাটাকে কমিয়ে দেয়।

- **স্মৃতি ও চিন্তার দক্ষতা** (cognitive function): স্মৃতি ও মনোযোগের সবগুলো না, কিছু লেভেল বাড়াতে কাজ করে কালোজিরা। তাও ছেলেদের। মেয়েদের ক্ষেত্রে কাজ করে কি না, তা জানা যায়নি।

- **বদহজম** (dyspepsia): কালোজিরার তেল, মধু ও পানি একসাথে খেলে পেট

ফাঁপাফাঁপি কমে। এখন এটা কালোজিরার কারণে কমলো, নাকি অন্যকিছুর কারণে তা জানা যায়নি।

- **খিঁচুনি/ মৃগী** (epilepsy): প্রাথমিক রিসার্চে এসেছে, মৃগীরোগের বাচ্চাদের খিঁচুনির ঘটনা কমে এসেছে কালোজিরার নির্যাস খেয়ে।
- **পাকস্থলীর আলসার জীবাণু** (Helicobacter pylori) **ইনফেকশান:** কিছু রিসার্চ বলছে, omeprazole-এর সাথে কালোজিরার গুঁড়া খেলে এই ব্যাকটেরিয়া নির্মূল হয়েছে। ডোজ নির্ধারণ করা যায়নি। সব ডোজেই যে কাজ হয়েছে তা নয়।
- **হেপাটাইটিস-সি:** প্রাথমিক রিসার্চ বলছে, Hepatitis C আক্রান্ত রোগীদের ভাইরাসের পরিমাণ (viral load) কমেছে ৩ মাস প্রতিদিন কালোজিরার তেল খেয়ে। পা ফোলাও কমেছে। কিন্তু লিভারের কর্মক্ষমতার খুব একটা উন্নতি হয়নি।
- **রক্তে কোলেস্টেরল:** কিছু প্রাথমিক রিসার্চ জানিয়েছে, যাদের বর্ডারলাইন হাই, তাদের ভাল কোলেস্টেরল (HDL) বাড়িয়েছে কালোজিরার গুঁড়ো। আর কমিয়েছে টোটাল ও বাজে কোলেস্টেরল (LDL) এবং ট্রাইগ্লিসারাইড। অন্য আরেক রিসার্চ জানাচ্ছে, শুধু রক্তে চর্বি কমানোর ওষুধ (simvastatin)-এর তুলনায় 'ওষুধের সাথে কালোজিরার গুঁড়া ও রসুনের তেল'-একসাথে বেশি কার্যকর ফল দিয়েছে। অবশ্য সব রিসার্চ একই কথা বলে না।
- **রক্তের ক্যান্সার** (leukemia): এক ধরনের লিউকেমিয়াতে (ALL) কেমো শেষ হবার পর আবারও ক্যান্সার ফিরে আসার চান্স কমিয়েছে কালোজিরা। অবশ্য সামগ্রিক আরোগ্য ও আয়ু বৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকা পাওয়া যায়নি।
- Methotrexate একটা ওষুধ যা ক্যান্সার কেমো-তে (বাচ্চাদের লিউকেমিয়া বিশেষ করে) আর DMARD হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেটা খাওয়ার সময় প্রতি ৩ মাসে একবার আমরা লিভার টেস্ট করাই, কেননা এটা লিভার ড্যামেজ করতে পারে। উলটাপালটা দেখলে ডোজ কমানো হয়। তো। কিছু প্রাথমিক রিসার্চে এসেছে, কালোজিরা এসব রোগীদের লিভারের ক্ষতি কমাতে পারে।
- Methotrexate গ্রহণকারী Rheumatoid arthritis-এর রোগীদের গিরাব্যাথা ও জড়তা (stiffness) দুটোই দ্রুত কমে এসেছে কালোজিরার তেল সেবনকারীদের। প্রাথমিক গবেষণায় এসেছে।
- Nonalcoholic Fatty Liver Disease-এ প্রতিদিন ৩ মাস কালোজিরার তেল সেবনে লিভারের কিছু ফাংশানে উন্নতি পাওয়া গেছে প্রাথমিক গবেষণায়।
- কিছু মোটা লোকদের ওজন কমাতে কালোজিরার তেল বা গুঁড়া ফল দিয়েছে। কিছু রিসার্চে এসেছে, আর কিছু রিসার্চে তেমন কোনো উন্নতি আসেনি। গবেষণাগুলো

তেমন মানসম্পন্ন নয়। আরও রিসার্চ প্রয়োজন।

- প্রাথমিক কিছু রিসার্চে এসেছে, দিনে ৩ বার করে ১২ দিন কালোজিরা নির্যাস সেবনের ফলে হিরোইন, মরফিন জাতীর ড্রাগের উইথড্রয়াল ইফেক্ট (opioid withdrawal) কমে গেছে।
- **গিরা-প্রদাহ** (Osteoarthritis): প্রাথমিক গবেষণায় এসেছে, হাঁটুতে কালোজিরার তেল ৩-৪ সপ্তাহ দিয়ে ব্যথা বেশ কমে এসেছে।
- **গলা-প্রদাহ** (tonsillopharyngitis): যাদের টনসিলের সমস্যা, ভুঁই আমলা ও কালোজিরা ৭ দিন খেয়ে ব্যথা কমে এসেছে, প্রাথমিক রিসার্চ।
- Inflammatory Bowel Disease (Ulcerative Colitis) প্রতিদিন ৬ সপ্তাহ কালোজিরা খেয়ে তেমন কোনো উন্নতি প্রাথমিক রিসার্চে পাওয়া যায়নি।

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

> “তোমরা এই কালোজিরা ব্যবহার করবে। কেননা, এতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।”[১২৪]

প্রসিদ্ধ এই হাদীসে 'সব রোগের প্রতিষেধক' শব্দাবলী দ্বারা উদ্দেশ্য কি প্রতিটি রোগ নাকি অধিকাংশ রোগ (বাকরীতি অনুসারে) তা নিয়ে আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনু হাজার আসকালানি, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনুল খাত্তাবি (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ ২য় মতটি গ্রহণ করেছেন। এবং 'সব রোগ' শব্দগুলোকে এভাবে বুঝেছেন: 'কালোজিরা দ্বারা সারে এমন সব অসুখ' কিংবা 'অন্য চিকিৎসার সাথে কালোজিরা সেবন' ইত্যাদি।[১২৫]

তবে আমি অবাক হয়ে যা ভেবেছি সেটুকু শেয়ার করি। মানবদেহের রোগগুলোকে কয়েক ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় আলোচনার সুবিধার্থে। প্রথমে—সংক্রামক (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী) ও অসংক্রামক রোগ। অসংক্রামক রোগ আবার কয়েক ধরনের—স্ব-বিধ্বংসী (autoimmune), টিউমার (neoplastic), পুষ্টিগত (metabolic), বংশগত (genetic)। মানবদেহে যত প্রকারের রোগ হতে পারে, কালোজিরা **সব ক্যাটাগরির অসুখেই** হয় প্রতিকারমূলক (cure), নয়তো প্রতিরোধমূলক (prevention) ভূমিকা রাখে। যদি না মৃত্যু লেখা হয়ে থাকে ঐ অসুখে

[১২৪] বুখারি, ৫৬৮৮; মুসলিম, ২২১৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২৯৯১।

[১২৫] Are there any guidelines or conditions with regard to using the black seed? [islamqa.com]

(মৃত্যু তো অনিবার্য), তবে অসুখের কষ্ট কালোজিরা সেবনে কমবে। কত ডোজে কতদিন খেলে কমবে, এটা বিজ্ঞানের দায়িত্ব। ততদিন খেতেই থাকুক রোজ।

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কীভাবে তা ব্যবহার করব? তিনি একটি পদ্ধতি বলেও দিয়েছেন:

> "২১টি কালোজিরার ১টি পুটলি তৈরি করে রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখবে এবং সকালে (পুটলির পানির ফোঁটা এ নিয়মে নাসারন্ধ্রে ব্যবহার করবে) "প্রথমবার ডান নাকের ছিদ্রে ২ ফোঁটা এবং বাম নাকের ছিদ্রে ১ ফোঁটা। পরের দিন বাম নাকের ছিদ্রে ২ ফোঁটা এবং ডান নাকের ছিদ্রে ১ ফোঁটা। তৃতীয় দিন ডান নাকের ছিদ্রে ২ ফোঁটা ও বাম নাকের ছিদ্রে ১ ফোঁটা।"[১২৬]

তবে এটাই একমাত্র নয়। বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে: রোগভেদে ব্যবহার প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়। গুঁড়ো করে খেয়ে, পান করে, শ্বাসের সাথে কিংবা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা যায়। আসলে এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত রিসার্চ না থাকায় ক্লিয়ার-কাট মন্তব্য করা যাচ্ছে না। তবে ওপরে বেশ কিছু রিসার্চে কিন্তু ডোজিং এর একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট অসুখে। বাকি কাজ আমাদের মুসলিম গবেষকদের।

[১২৬] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ১০/১৪৪।

সুরমা

> “ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা ইছমিদ (اِكْتَحِلُوْا بِالْإِثْمِدِ) বা সুরমা ব্যবহার করো। কারণ, তা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে ও পরিষ্কার রাখে এবং অধিক পাপড়ি (eye-lash) উৎপন্ন করে।” ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) আরও বলেন, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি সুরমাদানী ছিল। প্রত্যেক রাত্রে (ঘুমানোর পূর্বে) ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন।’[১২৭]

> “রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ‘ইসমিদ’ সুরমা (خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ)। কারণ, তা দৃষ্টি বাড়ায় এবং এর ফলে অধিক পাপড়ি জন্মায় (উদগত হয়)।”[১২৮]

এই হাদীসটা সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। সুরমাকে আরবিতে বলে কুহল (كُحْلٌ)। নবিজি বলছেন, তোমরা যে কুহল-গুলো ব্যবহার কর, তার মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট হলো ইছমিদ-টা। অর্থাৎ সেসময় নানান রকম কুহল/সুরমা ব্যবহৃত হতো। তার ভেতরে নবিজি নিজে ব্যবহার করতেন ও রিকমেন্ড করেছেন ‘ইছমিদ’। অনেকেই সুরমা ইংরেজি করেন Antimony, ব্যাপারটা অনেকটা আমেরিকা আবিষ্কার করে West Indies নামকরণের মতো। খ্রি:পূ: ২৫০০ সালে মিশরীয় সভ্যতায় ‘একটা পদার্থ’-কে বলা হতো mestem বা stim, যেটা চোখের প্রসাধনী ও ওষুধ হিসেবে খুব চলত। ‘ভিন্ন এক বস্তু’কে গ্রীক ভাষায় বলা হতো stimmi বা stibi (ল্যাটিন *stibium*= ইংরেজি antimony). কিন্তু শুনতে একই রকম শোনায় বলে গ্রীক stimmi (Stibnite/Antimony sulfide, Sb_2S_3) আর মিশরীয় stim-কে কোনো কোনো রিসার্চার একই ধরে নিয়েছেন। কী ছিল এই মিশরীয় stim? ভুলটা ধরা পড়ে Professor V. X. Fischer-এর রিসার্চ আর্টিকেলে (Fischer, 1892)। তিনি প্রাচীন মিশরীয় ৩০টি সুরমার স্যাম্পল নিয়ে দেখলেন, এগুলো গ্রীসের Stibnite নয়, বরং এদের অধিকাংশই Lead sulfide (PbS), যার নাম Galena। ফরাসি বিজ্ঞানীদের আরেকটা গবেষণায় খ্রি:পূ: ২০০০-১২০০ সালের ৫২টা স্যাম্পল দেখা হয়, সেখানেও এন্টিমনি নয়, বরং সীসার লবণই পাওয়া গেল, যেমন Galena (PbS), কিছুটা cerussite ($PbCO_3$), laurionite (PbOHCl),

---

[১২৭] তিরমিযি, আশ-শামাইল, ৪১, ৪২, ৪৩; বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৮৫১৬।

[১২৮] আবূ দাউদ, ৪০৬১; ইবনু মাজাহ, ৩৪৯৭; ইবনু হিব্বান, ৬০৭৩; হাকিম, আল- মুস্তাদরাক, ৮২৪৮।

phosgenite ($Pb_2Cl_2CO_3$) ইত্যাদি (Walter, 1999)।

এবং খুব সম্ভব, এই Galena-ই নবিজির হাদীসের সেই 'ইছমিদ' সুরমা, Stibnite নয়। কেননা আরবের নিকটস্থ Stibnite খনি আছে বহুদূরে মেসিডোনিয়া, তুরস্ক ও আর্মেনিয়ায়। আর গ্যালেনার দুটো বিশাল খনি ছিল হাতের কাছে মিশরেই। আরব ও মিশর দিয়েই এর ট্রেড-রুট। আজকের দিনেও মধ্যপ্রাচ্যে eyeliner জাতীয় কসমেটিক্স তৈরি হয় গ্যালেনা দিয়েই। 'মধ্যপ্রাচ্যের' সুরমার ক্ষতি নিয়ে যে গবেষণাগুলো হয়েছে, সেগুলোও এতে থাকা সীসার ক্ষতিকেই তুলে ধরেছে, এন্টিমনি নয় (Karim, 2005)। উসমানি খিলাফতেও চোখের নানান অসুখে গ্যালেনা ব্যবহৃত হতো বলে জানা গেছে। নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইছমিদ ব্যবহারের উপকারিতাও বলেছেন একই হাদীসে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে, পরিষ্কার রাখে এবং অধিক পাপড়ি (eye-lash) উৎপন্ন করে। সুতরাং ঔষধি গুণ-সম্পন্ন নবিজির এই 'ইছমিদ' সুরমা তৎকালে ওষুধ হিসেবে বহুল প্রচলিত এবং নিকটলভ্য গ্যালেনা হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

এখন মানবদেহে এই সীসার ব্যবহার স্বাস্থ্যকর কি না—এই প্রসঙ্গে গবেষকগণ দুটো মতে বিভক্ত। একদল বলেন, যেহেতু সীসা বিষাক্ত এবং মানবদেহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, সুতরাং শুধু চোখের জন্যই হোক আর জৈব-অজৈব যাই হোক, যেকোনো তরিকায়ই সীসা ব্যবহার ক্ষতিকর। এর স্বপক্ষে বহু রিসার্চ রয়েছে। আবার আরেকদল বলছেন, কেবল জৈব সীসা (টেট্রা-ইথাইল লেড বা টেট্রামিথাইল লেড) আর কিছু পানিতে দ্রবণীয় অজৈব সীসা বিষাক্ত। তাদের মতে, ঔষধি গুণের কারণে হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসা গ্যালেনা একটি অজৈব অদ্রবণীয় সীসা। ফলে সুরমা হিসেবে চোখে ব্যবহার বিষাক্ত নয়। মানুষ ও প্রাণীর ওপর বেশ কিছু কন্ট্রোলড ট্রায়ালে এসেছে—সুরমা না রক্তে সীসার লেভেল বাড়ায়, আর না কোনো বিষাক্ততা তৈরি করে। বরং বেশ কিছু উপকারিতা উঠে এসেছে ইছমিদের।

ক.

চোখের নানান অসুখের জন্য দায়ী এই সূর্যরশ্মির অতি-ঔজ্জ্বল্য ও UV-রশ্মি। গ্যালেনা/ ইছমিদের 'কালো' 'চকচকে' দানা সূর্যরশ্মির তীব্রতা ও ঔজ্জ্বল্য থেকে চোখকে রক্ষা করে। কিছু নেয় শুষে, কিছু দেয় প্রতিফলিত করে। একাধিক ধারাবাহিক রিসার্চে এসেছে, লেড সালফাইডের পাতলা স্তর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে উচ্চমাত্রায় শোষণ করে এবং নিম্ন মাত্রায় পরিবহন করে (higher absorption and lower transmittance in the UV light band) (Pop, 1997)। American Academy of Ophthalmology জানাচ্ছে, দীর্ঘসময় প্রচণ্ড রোদে সুরক্ষা ছাড়া যারা কাজ করে তারা

এসব অসুখের ঝুঁকিতে রয়েছে[১২৯]—

➡ চোখের ক্যান্সার
➡ ছোখের ছানি
➡ চোখে মাংস বৃদ্ধি (pterygium): কৃষক-জেলে যারা দুপুর রোদে কাজ করেন।
➡ Snow blindness: তাৎক্ষণিক অন্ধত্ব যা বরফ, বালি, পানির ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলনের দরুন হয়ে থাকে।

সুরমা হিসেবে লেড সালফাইডের পাতলা স্তর মরুভূমির তীব্র আভা থেকে এবং ক্ষতিকর অতিবেগুণী রশ্মি (UV) থেকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছে হাজার বছর ধরে। ওপরের সূর্যালোক থেকে বড় পাগড়ি, আর নিচের প্রতিফলিত আভা থেকে সুরমা। আর UV-রশ্মি তো মেঘও ভেদ করে চলে আসে, হ্যাট দিয়েও ঠেকানো যায় না। সরাসরি রশ্মি দরকার নেই, আলোর সাথেই থাকে। লম্বা জামা, দ্বিস্তর জামা, মাথা ঢাকা নিয়ে কষ্টিপাথর-১ এ আলোচনা ছিল। আজ জানলাম সূর্যরশ্মি শোষণ ও UV-রশ্মি শোষণের জন্য সুরমার ভূমিকা।

খ.

আমাদের দেহে নাইট্রিক অক্সাইড (NO)-এর অনেক ভূমিকা রয়েছে।

➡ রক্তনালীকে প্রশস্ত করে
➡ প্লাটিলেটদের ভিড় করতে দেয় না, ফলে নালির ভেতর রক্ত জমাট বেঁধে যায় না।
➡ প্রতিরক্ষা বাহিনী দ্বারা NO উৎপন্ন হয়, যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে (anti-microbial)। সব ধরনের ব্যাকটেরিয়া (গ্রাম পজেটিভ-নেগেটিভ) এমনকি প্রচণ্ড একগুঁয়ে রেজিস্ট্যান্ট MRSA জীবাণুকেও ধ্বংস করে।
➡ নার্ভ থেকে নার্ভে তথ্য বহনকারী সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে।
➡ টিউমার ও ক্যান্সারবিরোধী কাজ করে (anti-tumour)
➡ প্রদাহ কমায় (anti-inflammatory) ও শরীরের অতি-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে (immunosuppressive)

নাইট্রিক অক্সাইডের অভাবে হৃদরোগ, ডায়বেটিস (Type 2), পুরুষত্বহীনতা (ED), রক্তনালী শক্ত হয়ে যাওয়া (arteriosclerosis) ইত্যাদি হতে পারে। এজন্য এসব অসুখে অনেক সময় নাইট্রিক অক্সাইড সাপ্লিমেন্ট হিসেবে L-citrulline, L-arginine

---

[১২৯] David Turbert (Jun. 11, 2020).The Sun, UV Light and Your Eyes. American Academy of Ophthalmology

এসব ব্যবহার করা হয়।[১৩০] মজার ব্যাপার হলো, অল্প ডোজে সীসা প্রিপারেশন এই নাইট্রিক অক্সাইড বাড়িয়ে দেয় (Tapsoba, 2010)। হাজার বছর ধরে চোখের অসুখে গ্যালেনা ব্যবহারের মেকানিজম হলো—

এক. চোখের ইনফেকশনে NO বাড়িয়ে জীবাণু-বিধ্বংসী ভূমিকা

দুই. গ্লকোমা নামে চোখের একটা অসুখ আছে, যাতে চোখের ভেতরে তরলের প্রেসার যায় বেড়ে। ফলে প্রচণ্ড চোখব্যথা হয়, চিকিৎসা না নিলে অন্ধত্ব পর্যন্ত হতে পারে। NO বাড়ানোর কেমিক্যাল (NO-donors: nitroglycerine, isosorbide dinitrate) প্রয়োগ করে দেখা গেছে, NO বাড়িয়ে দিলে চোখের প্রেসার কমে যায়। (Schuman, 1994)

সীসা না ক্ষতিকর?

ফরাসি গবেষকদের পেপারে বলা হয়েছে (Tapsoba et.al. 2010), সীসার ক্ষতিটা কেমন? দুই যোজনী ক্যাটায়নগুলো (Ca^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}) আমাদের দেহে এখানে-ওখানে কাজ করে নানান বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। সীসা (Pb^{2+}) এদের জায়গাটা দখল করে কোষের বিভিন্ন গেট খোলা-বন্ধ হওয়ার (ion channels), বিভিন্ন ঘটক মিঞাদের (enzymes), এবং মূল কর্মীদের (Proteins) ভুলভাল প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নির্দেশনা দিতে থাকে। বিশেষ করে ক্যালসিয়াম আয়নের সাথে দেহ সীসার আয়নকে গুবলেট করে ফেলে।

অতি-অতি-সামান্য পরিমাণ হলেই (micromolar variations) ক্যালসিয়াম দুইজন ঘটককে ক্রিয়াশীল করে যা দেহের রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত জরুরি। জরুরি সকল বিক্রিয়াতে স্বাভাবিকভাবেই বর্জ্য হিসেবে 'ফ্রী র‍্যাডিকেল' বা অক্সিডেন্ট তৈরি হয়, যা থামাতে দেহে আবার এন্টি-অক্সিডেন্ট আছে, আপনারা মধু-র অধ্যায়ে জেনেছেন। ঘটক দুজন হলো: NADPH-oxidases (বর্জ্য O_2°, যা থেকে জন্মে আরও বড় শয়তান H_2O_2, ONOO-) আর NO-synthases (বর্জ্য NO°, যেটা কাজের জিনিস)। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, সীসাও বোধ হয় ক্যালসিয়ামের মতো micromolar ঘনত্বেই কাজ করে ঝামেলাগুলো পাকায়।

কিন্তু প্রাকৃতিক সীসা-যৌগগুলো দেহের পরিবেশে অদ্রাব্য, মানে দ্রবণীয় না, গুলে যায় না। (solubility constants: $K_s = 7.40 \times 10^{-14}$ for $PbCO_3$; $K_s = 3 \times 10^{-28}$ for PbS)। গ্যালেনার কেবল laurionite (PbOHCl) অংশটা চোখের পানিতে গুলে যায়,

[১৩০] Gavin Van De Walle, MS, RD (April 26, 2018) 5 Ways to Increase Nitric Oxide Naturally, www.healthline.com

তাও কতখানি? সর্বোচ্চ 10^{-4} M (pH ≈ 7, $[Cl^-]$ ≈ 0.1 M), এটুকুও কেবল চোখের সামান্য সুরমা দিয়ে সম্ভব না। দুটো কারণে সুরমার সামান্য দ্রবণীয় সীসা দ্বারা সেই ক্ষতি হয় না, যা আরেকপক্ষ বলছে।

১. যেখানে সুরমা নেওয়া হয়, সেখানে লাগাতার নতুন পানি তৈরি হচ্ছে (constantly renewed liquid film), ফলে ক্ষতি হবার জন্য দরকারি ঘনত্বে যেতে পারে না।

২. পানিতে দ্রবীভূত কার্বনেট আয়নের সাথে মিলে ঝইঝামেলা পাকানোর মতো ঘনত্বে তার যাওয়া সম্ভব না।

তাই যদি হয়, তাহলে ভালো কাজগুলোই বা করে কী করে, যদি এত কম পরিমাণেই চোখের পানিতে মেশে? এবার তাঁরা সেটা বুঝতে sub-micromolar ঘনত্বে সীসা নিয়ে পরীক্ষা করেন। সীসার মতো ভারী ধাতুগুলো শরীরে অতিরিক্ত ফ্রী র‍্যাডিকেল তৈরি করে (oxidative stress), যা দেহের জন্য ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইলেন, sub-micromolar ঘনত্বে সীসা কতটুকু stress করে, ও তা কতটুকু ক্ষতিকর। তাঁরা দেখলেন, সীসার কার্যক্রম sub-micromolar লেভেলেও হয়ে চলেছে। **তবে O_2° শয়তানটা স্বাভাবিক যে হারে তৈরি হতো, তা-ই আছে। কিন্তু উচ্চহারে এবং দীর্ঘসময় ধরে তৈরি হচ্ছে ভালোটা** NO° (240% for 0.2 μM Pb^{2+})। সুবহানাল্লাহ।

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসটা আবার দেখুন। ৩টি কারণ বলেছেন, সুরমা ব্যবহারের উপকারিতা হিসেবে—

১. চোখের দৃষ্টিক্ষমতা বাড়বে। মরুদেশের সূর্যরশ্মি ও UV-রশ্মি থেকে সুরক্ষার মাধ্যমে।

২. চোখ পরিষ্কার থাকবে। NO-এর জীবাণুরোধী ভূমিকা দ্বারা।

৩. চোখের পাপড়ি বাড়বে।

দেহের সমস্ত চুল তৈরি করে Keratinocyte নামক কোষ। কোষগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় যায়, চ্যাপ্টা হয়, মারা যায়। এভাবে গোড়ার দিক থেকে লেয়ারে লেয়ারে কেরাটিন জমে জমে চুল-লোম তৈরি হয়। আমরা জানি NO রক্তনালী প্রশস্ত করে দেয়। এর সিগন্যালে চুলের গোড়ায় রক্ত চলাচল বাড়ে, চুলের সংখ্যা বাড়ে, দৈর্ঘ্য বাড়ে (Improved follicle vascularization promotes hair growth and increases the number of hair follicles and hair size) (Yano, 2001)। NO-এর আধিক্য এই Keratinocyte কোষগুলোর ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়, দ্রুত কোষ বিভাজন হয়, চুল দ্রুত বাড়ে (Wolf, 2003)।

কিছু প্রমাণ করার জন্য না। এমনি বললাম। সুরমা আমরা নবিজির মুহাব্বতেই নিচ্ছিলাম। ভবিষ্যতেও নেবো। দুনিয়ায় যা পেলাম সব 'উপরি'।

আর্লি বেড আর্লি রাইজ

আগে ঘুম কম হলে কী কী হয় একটু দেখে নিই। এখানে অধিকাংশ আলোচনা হবে আমেরিকার Institute of Medicine of the National Academies এর Board of Health Sciences Policy-এর অধীনে গঠিত Committee on Sleep Medicine and Research-এর রিপোর্ট ২০০৬ থেকে। [১৩১] যেখানে রেফারেন্স নেই, ধরে নেবেন সেটা ৪৫০ পৃষ্ঠার এই মাল্টি-ডিসিপ্লিন রিপোর্ট থেকে দিচ্ছি। গড়ে বয়েসী মানুষের প্রতিদিন ন্যূনতম ঘুম প্রয়োজন (basal need) ৭-৮ ঘণ্টা।

৫-৭ কোটি আমেরিকান ঘুমের ক্রনিক সমস্যায় ভুগছেন (NHLBI 2003)। ঘুম নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা-গবেষণার শেষ নেই। ২০০১ সালে ইউএস-এ ১৩০০ ঘুম-ল্যাব ছিল। ২০০৫-এর বসন্তে ৭৮১ জন ঘুম নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাহলে বোঝা গেল, ঘুম-না-হওয়া একটা বেশ বড় সমস্যা।

ঘুম কম হলে যে বহু ধরনের শারীরিক মানসিক সমস্যা হয়, এতে দুনিয়ার কারোর কোনো দ্বিমত নেই। সমস্যাটা হচ্ছে ঘুমের সঠিক সময়টা কখন হওয়া উচিত, এটা নিয়ে। ছোটোবেলা থেকে আমরা যে শিখে এলাম 'Early to bed and early to rise/ Makes a man healthy, wealthy and wise'—এটা ভুল শিখেছি, না ঠিক শিখেছি, এটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

হার্ভার্ডের গবেষকেরা ৬১ জন আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রের ওপর ৩০ দিন গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন: আপনার যখন ইচ্ছে শুতে পারেন, যখন ইচ্ছে উঠলেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু, যেটাই রুটিন বানান, স্থির রাখতে হবে। রোজ একই সময়ে শুতে যাবেন, রাত ৩টা হলে রাত ৩টেতেই, রোজ। জরুরি না যে আগে আগেই শুতে হবে। Brigham and Women's Hospital-এর Sleep and Circadian Disorders Division-এর প্রধান Charles Czeisler, MD বলেছেন CNN-কে:

> 'যদি আপনি রাত দুটোই ঘুমিয়ে সকাল ৯টায় ওঠেন, রোজ সেটাই করবেন। এটাই

---

[১৩১] SLEEP DISORDERS AND SLEEP DEPRIVATION: An Unmet Public Health Problem, Harvey R. Colten and Bruce N Altevogt, Editors, Committee on Sleep Medicine and Research.

ফিক্সড রাখবেন। আগে আগে শুয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করার চেয়ে যখন ঘুম আসবে তখন ঘুমানোই ভালো। অন্যান্য আরও বহুকিছুর মতো, আমাদের এটাকে বদলানোর কিছু নেই।'

ঘুমের অভ্যাসকেও জেনেটিক গঠনের ওপর দিয়ে দায় সেরেছেন অনেক গবেষকই। আসলে কী তাই-ই? নাকি অন্যকিছু?

ঘুমের প্রকার

আমরা আমাদের মতো করে এগোবো। প্রথমে ঘুমপাড়ানি মাসীপিসীরা কীভাবে কাজ করে সেটা একটু জানা দরকার। ঘুম ২ ধরনের:

ঘুম	ধাপ		সময়	ঘুমের কত অংশ	কোয়ালিটি	রাত যত বাড়ে [ক]
NREM (non-rapid eye movement) ঘুম: এসময় চোখের মণি স্থির থাকে। [৭৫-৮০%]	১ম ধাপ		১-১০ মিনিট	২-৫%	একদম পাতলা	
	২য় ধাপ		১০-২৫ মিনিট	৪৫-৫৫%	মোটামুটি গভীর	মোট ঘুমের ৫০%
	Slow Wave Sleep (SWS)	৩য় ধাপ	কয়েক মিনিট	৩-৮%	সবচেয়ে গভীর	রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে বেশি থাকে, ধীরে ধীরে কমে।
		৪র্থ ধাপ	২০-৪০ মিনিট	১০-১৫%		
REM (Rapid eye movement) ঘুম: এসময় চোখের মণি দ্রুত নাড়াচড়া করে।			১০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১ ঘন্টা	২০-২৫%	স্বপ্নময়, কিছুটা পাতলা	মোট ঘুমের ৩০%

ঘুম একটা চক্র। এর শুরু NREM ১ম-২য়-৩য়, এরপর REM। একটা চক্র শেষ। আবার NREM ১ম ধাপ শুরু। এভাবে সারারাতে কমবেশি এরকম ৪-৫টা চক্র পূর্ণ হয়। প্রথম চক্র শেষ হবে ৭০-১০০ মিনিটে, পরেরগুলো ৯০-১২০ মিনিটে (Carskadon and Dement, 2005)। আমাদের আলোচনার বিষয় NREM-এর ৩য়-৪র্থ ধাপ এবং REM ঘুম। অনেকে ৩য় ধাপকে ৪র্থ আরেকটা ধাপে ভাগ করেন, খুব বেশি ফারাক নেই। আমরা আমেরিকার National Institute Of Neurological Disorders and Stroke-এর সাইট থেকে আলোচনা করছি।[১৩২]

NREM-এর ৩য়-৪র্থ ধাপ

এটা হলো আপনার ঘুমের সেই অংশ, যা আপনাকে সকালে সতেজ করবে [খ]।

[১৩২] Brain Basics: Understanding Sleep, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, USA

রাতের প্রথম দিকে ঘুমের এই অংশটা বেশি থাকে [গ]। হার্ট ও শ্বাসের গতি একদম নিচে নেমে আসে। পেশি ঢিলে হয়ে যায়, জাগানো বেশ কঠিন এই অবস্থায়। ব্রেইনের কার্যক্রম স্লো হয়ে যায়। এই সময়ে শরীরে যা যা ঘটে তা হলো [১৩৩]:

- ➡ স্মৃতি শক্তপোক্ত হয়
- ➡ শেখা ও আবেগ সংহত হয়
- ➡ দেহের ক্ষয়পূরণ হয়
- ➡ ব্লাড শুগার ও দেহের ক্রিয়াবিক্রিয়া ব্যালেন্স হয়
- ➡ রোগ প্রতিরোধ বুস্ট হয়
- ➡ ব্রেন থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন হয়

ঘুমের এই অংশটা কম হলে, এই কাজগুলো আপনার দেহে ঠিকমতো হবে না। ফলে 'ঘুম কম'-এর লক্ষণগুলো আপনার দেখা দেবে [ঘ]। প্রধান লক্ষণ হলো দিনে প্রচুর ঘুম ঘুম ভাব। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে মুড খারাপ, মনোযোগ কম কম, স্মৃতি কম রয়েছে (Dinges et al 2005)।

REM ঘুম

ঘুমিয়ে পড়ার ৯০ মিনিট পর এই ঘুম প্রথম আসে। চোখ এপাশ-ওপাশ দ্রুত ঘুরতে থাকে। জেগে থাকলে ব্রেইন যেমন কার্যক্রম দেখাতো, প্রায় তেমনটাই দেখায়। শ্বাস দ্রুত হয়, অনিয়মিত হয়ে যায়। হার্টের গতি ও রক্তচাপ জাগনা অবস্থার কাছাকাছি হয়ে যায়। হাত-পায়ের পেশি কিছু সময়ের জন্য প্যারালাইজড হয়ে যায়। স্বপ্ন শুরু হয়। অবশ্য কিছুটা আগের ধাপেও হতে পারে। শুরুর চক্রগুলোতে REM ঘুম মাত্র ১-৫ মিনিটের হয়। যত রাত বাড়ে, এই অংশটা লম্বা হতে থাকে (Carskadon and dement, 2005)

স্মৃতি পোক্ত হতে NREM-REM দুই ধরনের ঘুমই লাগে। রাত যত বাড়ে ঘুমের ভেতর এই REM আর NREM-2 এর ভাগ বাড়তে থাকে, মানে ঘুম পাতলার দিকে বাড়তে থাকে। এমনকি শেষের দিকে NREM-3,4 নাও থাকতে পারে।

একদম সাম্প্রতিক এক রিসার্চ বলছে, বেশি বেশি REM ঘুমের সাথে ডিপ্রেশনের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। অনিয়মিত চক্র বা কোনো ধাপ বাদ রয়ে যাওয়া 'নিদ্রারোগ'-এর (sleep disorders) কারণ হয়ে দাঁড়ায় (Zepelin, 2005) । যেমন

[১৩৩] How Much Deep, Light, and REM sleep Do You Need? Jennifer Leavitt, MS; Medically reviewed by Alana Biggers, MD; [www.healthline.com]

narcolepsy রোগীরা NREM বাদ দিয়েই সরাসরি REM ঘুমে চলে যায় (Carskadon and Rechtschaffen, 2005)

এবার দেখেন, আমরা কী কী পয়েন্ট পেলাম:

[ক] রাত যত বাড়ে, ঘুম পাতলার দিকে বাড়তে থাকে।

[খ] NREM-এর ৩য়-৪র্থ ধাপটাই পরদিন সতেজ করে তোলে।

[গ] যেটা আবার রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে বেশি থাকে।

[ঘ] এই অংশটা কম হলে সকালে আপনি সতেজ ফীল করবেন না, 'ঘুম কম'-এর লক্ষণগুলো আপনার দেখা দেবে।

যে কেউ বুঝে নিতে পারেন, আপনি যদি চান যে, ঘুম-কম (sleep deprivation)-এর লক্ষণ আপনার না আসুক। যদি চান দীর্ঘদিন ঘুম-কম থেকে আপনার বড় বড় সব অসুখবিসুখ না হোক। যদি চান ঘুমের দ্বারা আপনার আগের দিনের ক্লান্তি দূর হোক, ক্ষয় পূরণ হোক। প্রতিদিন সতেজ হয়ে আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠে কর্মচঞ্চল থাকতে পারেন, সর্বোচ্চ পারফর্মেন্স দিতে পারেন। তাহলে অবশ্যই আপনাকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে ঘুমোতে যেতে হবে। ৬টায় সন্ধ্যা লাগলে, আর ওদিকে ৬টায় সূর্য উঠলে ১২ ঘন্টার রাত যদি হিসেব করেন। তাহলে ১০টার আগে আপনার বিছানায় যেতে হবে। যাতে আপনি পর্যাপ্ত NREM-৩, ৪ ঘুম পান। এটা বুঝতে হার্ভার্ডের বিজ্ঞানী হবার দরকার নেই।

Springer's Cognitive Therapy and Research Journal –তে প্রকাশিত এক রিসার্চে এসেছে, আগে আগে শুতে যাওয়া লোকদের (morning-people) তুলনায় যারা দেরিতে ঘুমোতে যায় (evening-people), তারা বেশি ভোগে নেগেটিভ ও অনাহূত চিন্তা-রোমন্থনে। জাপানি কর্মীদের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেরিতে যারা ঘুমোয়, তাদের ভেতর ডিপ্রেশনের লক্ষণ প্রকট (Sakamoto, 2013)। পিকচার আভি বাকি হ্যায়।

ঘুম কীভাবে আসে

ঘুমের ব্যাপারে Two-Process Model-টা বেশ গ্রহণযোগ্য। এই মডেল অনুসারে দুটো প্রক্রিয়া চলে আমাদের দেহে যারা আমাদের জাগিয়ে রাখে আর ঘুম পাড়ায়। সোনার কাঠি, রুপার কাঠি।

➡ একটাকে বলছি 'process S' যেটা আমাদের 'ঘুমের প্রয়োজন'-কে নির্দেশ করে। সারাদিন একটু একটু করে প্রয়োজন বাড়তে থাকে, ঘুমের আগে সর্বোচ্চ

হয়, আবার সারা রাত ধরে কমে যেতে থাকে।

➡ আরেকটাকে বলছি 'process C', যা আমাদেরকে জাগিয়ে দেয়। process S বাড়লে process C কমে। আবার process S কমলে process C বাড়ে। একে কন্ট্রোল করে আমাদের দেহঘড়ি।

দেহঘড়ি কী—এটা একটু আলাপ না করলে চলছে না। এর কেতাবি নাম Circadian rhythms. আমাদের শরীরের ভেতরের কার্যক্রম এবং বাইরের আচরণ কিছুটা ছন্দের মতো। ছন্দ কী? ছন্দ হলো পুনরাবৃত্তি, রিপিট হওয়া। দিনের ২৪ ঘণ্টাব্যাপী আমাদের ঘুম-জাগরণ চক্র, ক্ষুধা লাগা, দেহতাপ ওঠা-নামা, হার্টের গতি কমা-বাড়া, পেশির টানটান ভাব, হরমোন ক্ষরণ—এগুলো নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনরাবৃত্তি হয়। আমাদের মগজের হাইপোথ্যালামাস নামের জায়গাটা এই দেহঘড়ি (biological clock) হিসেবে রুটিন জানান দেয় রোজ (Dunlap et al., 2004) । তো হাইপোথ্যালামাস কীভাবে বোঝে যে টাইম হয়ে গেছে?

চোখের রেটিনার থেকে কানেকশন গেছে ব্রেইনের SCN (Suprachiasmatic Nucleus) সেন্টারে। আলোর উজ্জ্বলতার ওপর ভিত্তি করে SCN সেন্টার অন-অফ হয়। তার মানে দিন-রাতের আলোক উজ্জ্বলতার সাথে দেহের ঘড়ির সম্পর্ক। SCN জানায় হাইপোথ্যালামাসকে, হাইপোথ্যালামাস তখন সারা দেহে আদেশ জারি করে। (Saper et al., 2005 b, c)। আলো কমে আসছে SCN বুঝলে মেলাটোনিন হরমোন বেশি বেশি বের হতে থাকে। দেহঘড়ি নিয়ন্ত্রণে এই হরমোনেরও ভূমিকা রয়েছে। মোদ্দাকথা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সাথে আমাদের দেহঘড়ির টাইমিং সেট করা। ঘুম বিশেষজ্ঞ Shawn Stevenson এক সাক্ষাৎকারে Yahoo-কে বলেন[১৩৪]: '*আমাদের দেহঘড়ি সৃষ্টিগতভাবে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তকে ফলো করে। তাই ঘুমের কাঙ্ক্ষিত রুটিন হওয়া উচিত রাত ১০টা থেকে নিয়ে সকাল ৬ টা।*'

University of California-র Sleep and Neuroimaging Lab-এর প্রধান Matt Walker, PhD একই মত পোষণ করেছেন Time-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।[১৩৫]। তিনি বলেন:

> 'রাত যত বাড়ে, ঘুমের কোয়ালিটি বদলায়। আমাদের ঘুমের একটা ৯০ মিনিটের চক্র আছে, NREM থেকে REM-এ গিয়ে চক্র পূর্ণ হয়। এভাবে সারা রাতে কয়েকটা চক্র সম্পন্ন হয়। মধ্যরাতের আগের চক্রগুলোতে NREM বেশি থাকে। আর মধ্যরাতের পরের ঘুমে REM অংশ বেশি থাকে। রিসার্চ বলছে, NREM ঘুম বেশি গভীর ও সতেজকারী (restorative),

[১৩৪] Why 10 P.M. Is The Perfect Bedtime, Yahoo Health (February 27, 2015)

[১৩৫] MARKHAM HEID (APRIL 27, 2017), What's the Best Time to Sleep? You Asked, TIME

অন্যদিকে REM ঘুম পাতলা আর স্বপ্নে ঠাসা। যদি ৩টার দিকে ঘুমাতে যান, আপনার বেশিরভাগ ঘুম হবে পাতলা REM-টাইপ, ফলে কাটবে ম্যাজমেজে ভোঁতা ভোঁতা।'

> 'মোটামুটি রাত ৮টা থেকে রাত ১২টা—এই কয়েক ঘণ্টার মাঝে আপনার দেহ-মস্তিষ্ক সুযোগ পায় ঘুমের সব চক্র পুরো করার। যেটা তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন। যারা ক্রমাগত নাইট শিফটে চাকরি করেন, তাদের ব্যাপারে রিসার্চে ভয়ংকর সব ফল এসেছে। মুটিয়ে যাওয়া, হার্ট-এট্যাক, অকাল-মৃত্যুর হার, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, চিন্তার দক্ষতা হ্রাসসহ অনেক সমস্যার জন্য দায়ী ঘুমের এই বায়োলজি-বিরুদ্ধ প্যাটার্ন। আমাদের দেহঘড়ি আমাদের ঘুম-ক্ষুধা এসব নিয়ন্ত্রণ করে। আপনি চাইলেই এটা বদলে যাবে না।'
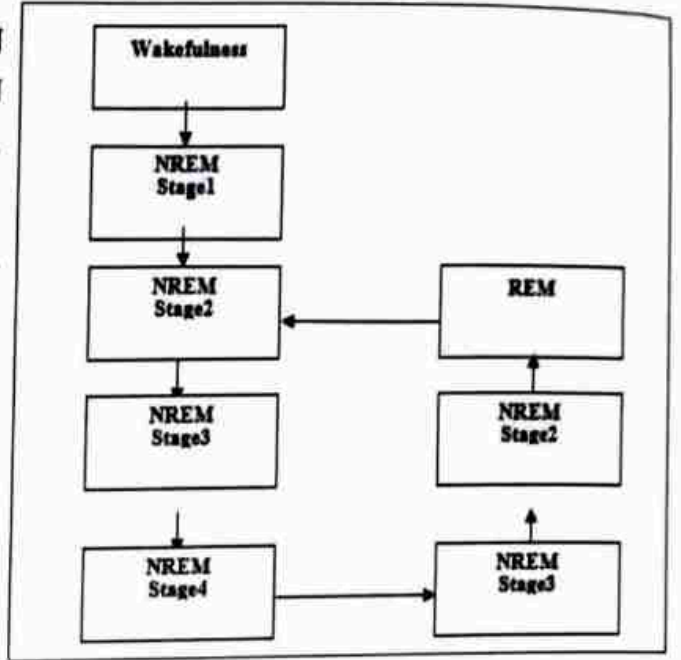
National Sleep Foundation-ও ঘুমের সময় 'যার-যার তার-তার' বললেও বলে দিচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত সময় হলো, রাত ৮টা থেকে রাত ১২টার মধ্যে ঘুম শুরু করা। কেননা সুস্থ থাকতে ৭-৯ ঘন্টা ঘুম আপনার লাগবে। সে আপনি পেঁচা-ই হন, আর চাতক-ই হন। [১৩৬]

Sleep Education and Research Foundation-এর অর্থায়নে psychiatry and behavioral sciences-এর প্রোফেসর Christian Guilleminault, MD-এর নেতৃত্বে এক গবেষণার কথা শোনাবো এখন আপনাদের[১৩৭]। তাহলে 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' হয়ে যাবে। *Sleep Medicine*- জার্নালে এসেছিল রিসার্চটা। ১৮-২৫ বছরের ৮ জন লোককে ল্যাবে রাখা হলো কয়েকদিন। প্রথম ২ রাত তাদেরকে ৮.৫ ঘণ্টা করে ঘুমোতে দেওয়া হলো, দিয়ে দেহের বিভিন্ন বেইসলাইন ডেটা নেওয়া হলো। এবার তাদের ২ গ্রুপ করা হলো। এক গ্রুপকে ঘুমোতে দেওয়া হলো রাত ১০:৩০- ২:৩০ টা। আরেক গ্রুপকে ২:১৫- ৬: ১৫টা পর্যন্ত। এভাবে ৭ দিন। খুব খেয়াল।

তাদের আচরণ ও জাগনা থাকার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, ব্লাডের ম্যালা ধরনের টেস্ট করা হলো। মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুম তো সবাইকেই এফেক্ট করবে, এটাই স্বাভাবিক। মজার ব্যাপার হলো, কম ঘুমে ক্ষতি কেমন হচ্ছে, সেটা দুই গ্রুপে আলাদা আলাদা। যারা

---

[১৩৬] Allyson Hoffman (February 26, 2021), What are the Best Sleep and Wake Up Times for You? [sleep.org]

[১৩৭] MICHELLE L. BRANDT (May 28, 2003), Researchers ID best hours to sleep when time is limited People who rest in the early morning do better than those who sleep late at night, Stanford News.

আগে ঘুমিয়েছে—

- তারা দিনে জেগে থাকতে পারছে বেশি (wakefulness test)। মানে কম ঘুমে তাদের কষ্ট হয়েছে কম।
- তাদের ঘুম হয়েছেও ভালো (sleep efficiency), মানে ঐ চার ঘণ্টার মাঝে সর্বোচ্চ সময়টুকু ঘুমিয়েছে তারা।
- এবং টাস করে ঘুমিয়ে গেছে (sleep latency), বেশি কসরত করতে হয়নি।
- আরেকটা জিনিস হয়েছে দেরিতে ঘুমানেওয়ালাদের, ঘুম কম হবার কারণে leptin নামের হরমোন কমে গেছে। leptin কমার মানে হলো, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া আর মোটা হয়ে যাওয়া।

> আম্মাজান আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশার সালাতের আগে ঘুমাতেন না এবং ইশার পর জেগে থাকতেন না।' [১৩৮]

> আবূ বারযাহ আসলামি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, '... তিনি (নবিজি) ইশার সালাত দেরি করে পড়া পছন্দ করতেন, আর ইশার আগে ঘুমানো এবং ইশার পর কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন...।'[১৩৯]

এখন দেখেন, কেবল নবিজিকে ভালোবেসে যারা এই দুটো হাদীসের ওপর আমল করে এসেছেন প্রজন্মে প্রজন্মে; বিজ্ঞানের আশায় না থেকে; তারা কি শারীরিকভাবে উপকার পেয়েছেন, নাকি ক্ষতি হয়েছে? এভাবেই তারা দুনিয়াতেও বোনাস পেয়েছেন, আর আখিরাতে ভালোবাসার বিনিময় পেতে থাকবেন।

---

[১৩৮] ইবনু মাজাহ, ৭০২, আলবানি (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ বলেছেন।

[১৩৯] বুখারি, ৫৪৭; মুসলিম, ৬৪৭।

রেশমের কাপড়

আগে আপনাদের একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি:

'তিন অক্ষরের নাম তার, জলে বাস করে
মাঝের অক্ষর কেটে দিলে আকাশেতে ওড়ে'

দেখেন, জলে বাস করে শুনেই আমরা মাছের নাম খুঁজতে শুরু করেছি, যার মাঝের অক্ষর কেটে দিলে দুই অক্ষরের কোনো পাখির নাম আসে। মানুষের ব্রেন এভাবেই কাজ করে। সামনে থাকা সমস্যাকে পিছনের অভিজ্ঞতার সাথে মেলায়, বা ব্রেনে সংরক্ষিত তথ্যের সাথে মেলায়। এভাবে কয়েকটা সম্ভাবনা তৈরি করে, শেষে সবচেয়ে উপযুক্ত সম্ভাবনাকে বেছে নেয়। প্রতিটা শর্ত তার অপশনগুলোকে কমিয়ে আনে। ডাক্তারেরাও এভাবে রোগ নির্ণয় করেন। আপনার কমপ্লেন শুনে ডাক্তার সাহেব মনে মনে ৩টা কাছাকাছি রোগ সন্দেহ করেন। ৩টা রোগের মাঝে একটা বাদ পড়বে আপনার রক্তের রিপোর্ট দেখে, একটা বাদ পড়বে আপনার প্রস্রাবের রিপোর্ট দেখে। বাকি রইল একটা, ঐটাই আপনার হয়েছে। আমাদের জানা তথ্য আমাদের একটা দিকে তাড়িয়ে নেয়। চিন্তাশীলের চিন্তাকে একটা দিকে প্রবাহিত করে। ধাঁধার উত্তরটা এবার বলে দিই: চিতল আর চিল।

মিশরের Cairo University-র Department of Surgery and Experimental Research-এর প্রোফেসর A. Shafik সাহেবের ৩টা রিসার্চের কথা উল্লেখ করব। প্রথম রিসার্চ (Shafik, ১৯৯৬), ৫০ জন যৌন সক্ষম পুরুষকে ৫টা গ্রুপে ভাগ করলেন। একেক গ্রুপকে একেক কাপড়ের জাঙ্গিয়া দিলেন:

১০০% পলেস্টার
৫০-৫০ পলেস্টার-কটন মিক্স
১০০% কটন
১০০% উলের আন্ডারওয়্যার।

আর এক গ্রুপকে রাখলেন তুলনা করার জন্য। ৬ মাস ওদেরকে নির্দিষ্ট কাপড়ের আন্ডারওয়্যার পরানো হলো। ৬ মাস পর একবার আর ১২ মাস পর আরেকবার তাদের যৌন আচরণের নানান দিক পরিমাপ করা হলো। electrostatic potentials

(EP) মানে লিঙ্গ ও আশপাশের এলাকার ভোল্টেজ মাপা হলো। আরেকবার পরিমাপ করা হলো নির্দিষ্ট কাপড়ের আন্ডারওয়্যার ত্যাগ করার ৬ মাস পর। পাওয়া গেল—

➡ পলেস্টার ও পলেস্টার মিক্স কাপড় যারা পরেছে তাদের যৌনক্ষমতা কমে গেছে।

➡ দিন যত গেছে তত কমতেই থেকেছে। ৬ মাসে যা কমেছে, ১২ মাস পর আরও কমেছে।

➡ তবে ছেড়ে দেবার ৬ মাস পর আবার আগের ক্ষমতা ফিরে এসেছে।

কারণ হিসেবে গবেষকেরা বললেন: **পলেস্টারের কাপড় মানুষের দেহের সাথে ঘর্ষণে কারেন্ট উৎপন্ন করে। স্থিরবিদ্যুৎ বলে একে। এই স্থির বিদ্যুতের ক্ষেত্র লিঙ্গ ও শুক্রাশয় ভেদ করে এবং পুরুষের যৌনক্ষমতাকে নষ্ট করে।** এর আগে এক স্টাডিতে এসেছিল, শুক্রাণু তৈরিও কমিয়ে দেয় এই ভোল্টেজ (Shafik, 1992। এছাড়া মানুষের যৌনক্ষমতা কমে যায় এটা পাবার আগে, ইঁদুরে পরীক্ষা করেও পুরুষত্বহীনতা মিলেছিল (Shafik, 1993)। এর আগে বিভিন্ন গবেষণায় হাই ভোল্টেজে অল্প কারেন্টেই লোহিতকণিকা ধ্বংস হবার কথা এসেছিল (Riemann 1975, Hamilton 1968, Kinosita 1977)। কিন্তু এটা তো রেশম না, এটা তো পলেস্টার?

এই ঘটনাকে বলে triboelectricity বা ঘর্ষবিদ্যুৎ। ১৭৫৭ সালে Johan Carl Wilcke তার গবেষণায় সর্বপ্রথম triboelectric series প্রকাশ করেন। পাশের ছবিটা একটা triboelectric series. এই তালিকায় নিচে থাকা একটা জিনিসকে যদি ওপরে থাকা কিছুর সাথে স্পর্শ করানো হয়, তাহলে নিচে থাকা বস্তুটা বেশি নেগেটিভ চার্জ বা ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে। এই সিরিজে দুটো বস্তুর মাঝে যত দূরত্ব, তত বেশি চার্জ উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন

POSITIVE (Electron Donor)
- Air
- ◆ Human Hands
- Asbestos
- Rabbit Fur
- Glass
- Mica
- Human Hair
- Nylon
- Wool
- Fur
- Lead
- ◆ Silk
- Aluminum
- Paper
- Cotton
- Steel
- Wood
- Amber
- Sealing Wax
- Hard Rubber
- Noble Metals and Nickel
- Sulfur
- Acetate Rayon
- ◆ Polyester
- Celluloid
- Orlon
- Saran
- Polyurethane
- Polyethylene
- PVC (vinyl)
- KEL F Fabric
- Silicon
- Teflon

NEGATIVE (Electron Acceptor)

বিজ্ঞানী সিন্থেটিক নানা জিনিসকেও এই চার্টে অন্তর্ভুক্ত করে সিরিজটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আরেকটু সহজ করি। ধরেন ওপরে দিকের কোনো বস্তু, যেমন গ্লাসকে যদি নিচের কোনো বস্তু, যেমন PVC দিয়ে ঘষা দিলেন। তাহলে গ্লাস থেকে PVC-তে ইলেক্ট্রন চলে যাবে। ফলে গ্লাস পজেটিভ চার্জ হবে, আর PVC হয়ে যাবে নেগেটিভ চার্জ। আবার পলেস্টার দিয়ে গ্লাসে ঘষা দিলেও একই ঘটনা ঘটবে, কিন্তু এবার চার্জ তৈরি হবে PVC-এর চেয়ে কম। কারণ গ্লাসের সাথে পলেস্টারের যে গ্যাপ, তার চেয়ে গ্লাসের সাথে PVC-এর গ্যাপ বেশি। [১৪০]

Shafik-সাহেবের পরীক্ষায় ঠিক এই জিনিসটাই ঘটেছে। সিরিজে দেখেন human hand বা মানুষের ত্বকের অবস্থান কোথায়? একদম ওপরের দিকে। আর পলেস্টার নিচের দিকে। বেশ দূরত্ব, প্রায় ২১। ফলে electrostatic discharge (ESD) বা স্থিরবিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে, যা যৌনক্ষমতা ও শুক্রাণু তৈরিকে কমিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা, এবার কথা হলো, মেয়েদের ক্ষেত্রে কী রেজাল্ট? A. Shafik সাহেব প্রথম পরীক্ষাটা এবার করলেন ৩৫টা মেয়ে কুকুরের ওপর। ১২ মাস ধরে সেগুলোকে ৪ পদের আন্ডারপ্যান্ট পরিয়ে রাখলেন (Shafik, 2008)। দেখা গেল, ৬ মাসের মাথায় দেখা গেল, পলেস্টার কাপড়ের যেগুলোকে পরানো হয়েছিল, তাদের serum progesterone লেভেল কমে গেছে। যৌনমিলন করিয়ে, এমনকি কৃত্রিমভাবে বীর্য প্রবেশ করিয়েও (insemination) তাদের কনসিভ করানো গেল না। এ থেকে ধারণা হয়, তাদের ডিম্বপাত হয়নি (anovulation), মানে ওভারি থেকে ডিম্বাণু বের হয়নি। কেননা ডিম্বপাত হলে অবশিষ্টাংশ 'কর্পাস লুটিয়াম' হবার কথা, যা থেকে প্রোজেস্টেরন হরমোন প্রচুর ক্ষরণ হবার কথা। এই প্রোজেস্টেরনের কাজ হলো জরায়ুকে ডিম্বাণু গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা। যেহেতু প্রোজেস্টেরন কম, মানে কর্পাস তৈরি হয়নি, মানে ডিম্বপাত হয়নি। এবং এই কুকুরীদের চামড়ায় ঘর্ষণের ফলে তৈরি বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রও (electrostatic field) পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বোঝা গেল, triboelectricity বা ঘর্ষবিদ্যুতের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র নারী প্রাণীর দেহেও বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং গর্ভধারণ বাধাগ্রস্ত করে।

এবার দেখেন তো সিল্ক কোথায়? দূরত্ব ৯। মানে পলেস্টারে যে কারেন্ট উৎপন্ন হয়েছে, সিল্কের সাথে অতটা না হলেও কিছুটা কারেন্ট হবে। যেহেতু এর ওপরে রিসার্চ হয়নি, তাই নিশ্চিত বলা না গেলেও ধারণা করা যাচ্ছে যে, অতটুকু বিদ্যুতের প্রভাব

---

[১৪০] Ryne C. Allen; Triboelectric Generation: Getting Charged; Desco Industries Inc. (DII) November, 2000

নিশ্চয়ই রয়েছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারে সামষ্টিক (cumulative) প্রভাব থাকাটা অসম্ভব নয়। দেখেন গবেষণাগুলো আমাদের চিন্তাকে কোনদিকে নিচ্ছে, ঐ ধাঁধার মতন করে। আরও গবেষণা হলে আরও ধারণাটা একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তের দিকে গড়াবে। আচ্ছা এখানে তো আন্ডারপ্যান্ট পরানো হয়েছে, ঘর্ষণ-ক্ষেত্র কম। যদি বড় পোশাক পরানো হয়? পুরো দেহ জুড়ে, তাহলে?

> “ হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন।'[১৪১]

মানে শুধু পরিধান না, বসাও নিষেধ। মানে অধিক সার্ফেস নিয়ে ঘর্ষণ হতে পারে, এমন পরিমাণ সিল্ক ব্যবহার নিষেধ। তবে কতটুকু ব্যবহার করা যাবে?

> “ উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেশমের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন । তবে দুই বা তিন বা চার আঙুল পরিমাণ কাপড় হলে তা ব্যবহার করতে পারে।'[১৪২]

সামান্য ঘর্ষণ হতে পারে এতটুকু রেশম ক্ষতিকর নয়। কিন্তু নারীদের জন্য যে আবার বৈধ করেছেন।

> “ আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, তিনি ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অতঃপর বললেন, “আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম।”[১৪৩]

> “ আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।”[১৪৪]

বিজ্ঞান কেবল ধারণা দিতে পারে। গবেষণায় দেখলাম পলেস্টার (গ্যাপ ২১) নারী-পুরুষ উভয়ে সমস্যা তৈরি করেছে। সিল্কের সাথে গ্যাপ কম, মাত্র ৯। আবার নারীদের ত্বকের 'ঘর্ষণ-সহগ' (coefficient of friction, μ) পুরুষের ত্বকের চেয়ে বেশি।[১৪৫] মানে হলো, পুরুষের ত্বকে সামান্য ঘষাতেই যে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, নারী-ত্বকে

---

[১৪১] বুখারি, ৫৪২৬, ৫৬২৬ , ৫৬৩২ , ৫৬৩৩, ৫৬৩৭; মুসলিম, ২০৬৭; তিরমিযি, ১৮৮৭।

[১৪২] মুসলিম, ২০৬৯।

[১৪৩] আবূ দাউদ, ৪০৫৭; নাসাঈ, ৫১৪৪; ইবনু মাজাহ, ৩৫৯৫।

[১৪৪] তিরমিযি, ১৭২০; নাসাঈ, ৫১৪৮।

[১৪৫] Bharat Bhushan ; Biophysics of Skin and Its Treatments: Structural, Nanotribological, and Nanomechanical Studies, Page 2 $\left[\mu = \frac{frictional\ force(F)}{normal\ force(N)}\right]$

একই পরিমাণ তৈরি হতে আরও জোরে ঘষা লাগতে হবে। নর্মাল ওঠা-বসায় রেশমের সাথে যে ঘষা ত্বকে লাগবে, তাতে পুরুষে ক্ষতি হবে, নারীদের হবে না। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, **মাত্র ৯ গ্যাপ দিয়ে যে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র তৈরি হবে, তা পুরুষে বিরূপ প্রভাব ফেলবে, নারীদের ফেলবে না।** যেমন অন্যান্য বহু বিষয়ে নারী-পুরুষ শারীরিক পার্থক্য হয়। যেমন:

নারীদের রক্তে হিমোগ্লোবিন কম, মানে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কম, ফলে হাঁপিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি।

বেশি গরমে নারীদের পুরুষের চেয়ে কষ্ট হয়। কারণ তারা ঘামে কম।[১৪৬]

এবং বেশি ঠাণ্ডায়ও নারীদের কষ্ট হয়, বেশি শীত শীত লাগে। [১৪৭]

এখন ঝামেলা আরেকটা আছে। দুইজন পুরুষ সাহাবিকে কিন্তু নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিল্ক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন চর্মরোগের কারণে। চর্মরোগ মানে চুলকানি।

> আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকায় রেশমী জামা পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।'[১৪৮]

সিল্ক হলো প্রাকৃতিক প্রোটিন, ফলে এর হাইপো-এলার্জিক বৈশিষ্ট্য আছে। যাদের স্কিন এলার্জি আছে (atopic dermatitis/eczema), তাদের ত্বক খুব সেন্সিটিভ হয়। ত্বকের মাস্ট কোষ সামান্যতেই প্রদাহ তৈরি করে চুলকিয়ে ফুলিয়ে ফেলে। তাদের জন্য সিল্ক বেশ ভালো। এর ঘন সন্নিবেশিত বুনন ধুলো এবং মাইট (অ্যালার্জেন) প্রবেশে বাধা দেয়। ফলে পরিধানকারীকে বায়ুবাহিত অ্যালার্জেন থেকে রক্ষা করে। [১৪৯] দারুণ না!

---

[১৪৬] যখন বেশি ঘামার প্রয়োজন, যেমন গরম আবহাওয়া নারীর জন্য খানিকটা অস্বস্তিকরই বটে। জাপানের Osaka International University এবং Kobe University-র যৌথ গবেষণায় এমনটিই উঠে এসেছে। গবেষণার প্রধান সমন্বয়ক Yoshimitsu Inoue জানাচ্ছেন, মেয়েদের শরীরের পানির পরিমাণ এমনিতেই পুরুষের চেয়ে কম। ফলে দ্রুত পানিশূন্যতা হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই হতে পারে এই কম ঘামাটা নারীদের জন্য গরমে একটা সারভাইভাল কৌশল বা অভিযোজন। আর পুরুষের এই বেশি ঘামাটা কাজে দক্ষতা বজায় রাখার একটা কৌশল। গরমে মেয়েদের বেশি যত্ন নিতে সুপারিশ করেছেন গবেষকবৃন্দ। [Experimental Physiology]

[১৪৭] নারীদেহে ক্রিয়াবিক্রিয়ার হার (metabolic rate) কম। তাপ উৎপাদন হয় কম। Warwick Medical School -এর Professor Paul Thornalley বলেছেন BBC-কে।

[১৪৮] বুখারি, ৫৮৩৯, ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮৩৯; মুসলিম, ২০৭৬।

[১৪৯] Nele Köstler, 5 Health Benefits Of Wearing Silk [https://radicesleep.com/blogs/magazine/5-health-benefits-of-wearing-silk]

কিন্তু সমস্যা হলো, এই দু'জনার ২০-৩০ জন করে সন্তান ছিল। যৌনক্ষমতায় তো সমস্যা হয়নি। একজিমাযুক্ত ত্বক হয় খুব ড্রাই ও পানিশূন্য। [১৫০] শুষ্ক ত্বকে ঘর্ষণ কম হয়, আর্দ্র ত্বকের তুলনায়। [১৫১] সুতরাং হতে পারে সিল্ক পড়লেও তাদের সমস্যা হয়নি।

আচ্ছা, এবার একটা প্রশ্ন। আচ্ছা, ধরে নিলাম, আমাদের সব ধারণা যা আমাদের এখানে নিয়ে এল, সব ভুল। তাহলে কি হাদীসের ওপর থেকে আমাদের বিশ্বাস উঠে যাবে? না। কারণ, যৌনশক্তি কমে যাবে, এজন্য নবিজি সিল্ক পরাকে পুরুষের জন্য হারাম করেছেন, তা নয়। সিল্ক পরাকে হারাম করার ১ম কারণ হলো বিলাসিতা—

> উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা (পুরুষরা) রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে।" (অর্থাৎ সে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।) [বুখারি, ৫৮২৮, ৫৮৩৫; মুসলিম, ২০৬৯।]

> আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দুনিয়াতে যে রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে সে তা পরতে পাবে না।" [বুখারি, ৫৮৩২।]

ইসলাম কেবল বস্তুগত বিজ্ঞান শেখাতে আসেনি। ইসলাম এসেছে একটা জীবন-পদ্ধতি শেখাতে, একটা জীবন-ব্যবস্থাপনা শেখাতে। কীভাবে চললে দুনিয়ার বস্তুগত জীবনে সুখে থাকা যায়, পরকালের জীবনেও সুখে থাকা যায়। মানুষের বায়োলজির সাথে যায়, সাইকোলজির সাথে যায়, সোশিওবায়োলজি ও সোশ্যাল সাইকোলজির সাথে যায়, ইকোলজির সাথে যায়; এমন একটা জীবন দিতে এসেছে। যেটা ১০ম শতাব্দীর লোকেও মেনে চলবে, আবার ২৫০০ সালের লোকেও মেনে চলবে, তাদের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, পরকাল হবে সুন্দর, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। এই জীবন শেখাতে গিয়েই সে ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞানীর জন্য নিদর্শন রেখে দিয়েছে, অর্থনীতিবিদের জন্য, ডাক্তার মরিস বুকাইলির জন্য, নিজ নিজ ফিল্ডে এক্সপার্টদের জন্য চমক রেখে দিয়েছে। যেমন, রেশমের হাদীসে বিলাসিতাহীন সাদাসিধা মিনিমালিস্ট জীবন শেখাতে গিয়েই এভাবে লুকোনো মু'জিযা রয়ে গেছে পরতে পরতে। যাতে একজন এক্সপার্ট বুঝে নেয়, এই জীবন-ব্যবস্থাপনা মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজের বানানো হতে পারে না। সে হয়তো প্রমাণ করতে পারবে না, কেননা প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞান আগেই হাত ধুয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে অন্তরে উপলব্ধি করবে- 'مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ' (এটা কোনো মানুষের কথা নয়)।

---

[১৫০] A Visual Guide to Eczema, WebMD

[১৫১] Dry skin exhibits lower friction than moist skin. [Bharat Bhushan ; Biophysics of Skin and Its Treatments: Structural, Nanotribological, and Nanomechanical Studies, Page 2]

খৎনা

০-২৮ দিনের বাচ্চাকে Neonate বলে। American Academy of Pediatrics জানাচ্ছে ০-২৮ দিনের বাচ্চাদের খৎনা করিয়ে দিলে পরবর্তী বয়সে লিঙ্গ ও প্রস্রাবের নানান অসুখ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়, যেমন—

— প্রস্রাবে ইনফেকশন
— chronic renal disease
— meatitis
— balanitis
— balanoposthitis
— paraphimosis
— phimosis[১৫২] ইত্যাদি।

এই ছোট্ট অপারেশনটার জটিলতাও নগণ্য, মাত্র ০.২-০.৬% মাত্র।

এছাড়াও পুরুষের খৎনা সরাসরি লাইফলং সুরক্ষা দেয় লিঙ্গের ক্যান্সার থেকে (Klausner 2012, Morris 2011)। সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের molecular medicine-এর প্রোফেসর এমিরেটাস Brian J.Morris ১৯৪টা রিসার্চ পেপার রিভিউ করেছেন। তাঁর রিভিউ আর্টিকেলে রয়েছে—

- আগেই খৎনা করে নেওয়াটা (prophylactic circumcision) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বেশ সফল (Micali 2006, American Academy of Dermatology)
- নবজাত অবস্থায় খৎনা করে ফেলা তো আসলে ক্যান্সারের রিস্ক মোচনই করে দেয় (Schoen 1996 BMJ)
- ১৯৩০-১৯৯০ সাল অব্দি ৫০ হাজার লিঙ্গ-ক্যান্সারের রোগীর ডেটা দেখা হলো। এদের ১০ হাজার জন ক্যান্সারে মারা গেছে। মাত্র ১০ জনের খৎনা করা ছিল, যারা সবাই আবার খৎনা করেছিল শিশুকালে না, পরের জীবনে গিয়ে। (Schoen 1991)
- শিশুকালে খৎনা করা কারও লিঙ্গে ক্যান্সার হয়েছে, ব্যাপারটা এতটাই বিরল যে,

[১৫২] Circumcision policy statement. American Academy of Pediatrics. Task Force on Circumcision.Pediatrics. 1999 Mar; 103(3):686-93.

এমন কেস পেলে তা পাবলিকেশনের বিষয় (Kanik 1997, American Academy of Dermatology)

- ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় এসেছে, খৎনাবিহীন লোকের মারাত্মক (invasive) **ক্যান্সারের রিস্ক ২২ গুণ বেশি**, কম মারাত্মকটার রিস্ক ৭.৩ গুণ বেশি।
- নানান দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে, **আমেরিকায় ৬০০ জনে ১ জনের, ডেনমার্কে ৯০০ জনে একজনের লিঙ্গে ক্যান্সার। আর ইসরাইলে প্রতি ১ লক্ষে ০.১ জনের!** উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদিদের খৎনা বাধ্যতামূলক। [১৫৩]
- ক্যান্সার সৃষ্টিকারী প্যাপিলোমা ভাইরাসের (HPV) ২৪% থাকে অগ্রভাগের চামড়াটুকুতে (যেটুকু ফেলে দেওয়া হয়)। তিনটা স্টাডিতে এসেছে, foreskin ছাড়া শুকনো জায়গার চেয়ে খৎনাহীন স্যাঁতসেঁতে জায়গা ভাইরাসের জন্য উপযোগী। খৎনাওয়ালা লোকের লিঙ্গ থেকে HPV ইনফেকশন সারতে থাকে ৬ গুণ দ্রুত।
- **অগ্রত্বক**/প্রিপিউসের ভেতরের দিকটা (inner foreskin) **আমাদের বাইরের ত্বকের মত নয়**, বরং গালের ভেতরের **সার্ফেসের মত** গোলাপী! উত্থিত লিঙ্গে **এই ভেতরের ত্বকটিও** চলে আসে **বাইরে**, যা **জীবাণু** সংক্রমণের রাস্তা **হয়ে দাঁড়ায়।**
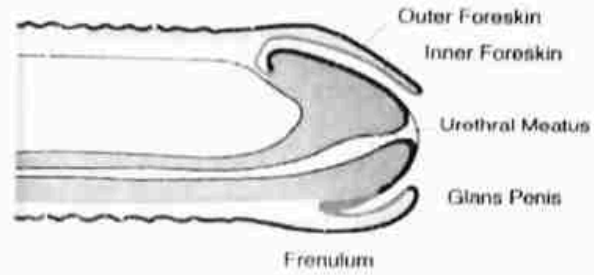
- ৪৫-৮৫% লিঙ্গ ক্যান্সারের রোগীর phimosis অসুখের ইতিহাস আছে। শৈশবের শুরুতেই খৎনা করে phimosis সারিয়ে দিলে ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব।
- খৎনাহীন লোকের অগ্রত্বকের নিচে সাদা স্তর দেখা যায়, একে Smegma বলে। ৯ বছর বয়সি এক ছেলের খৎনা করাতে গিয়ে আমি নিজেই পেয়েছি প্রচুর স্মেগমা। সাধারণ ময়লার মতো ধুলে চলে যায় না, কিছুটা মুখে যেমন sebum জমে (চালের
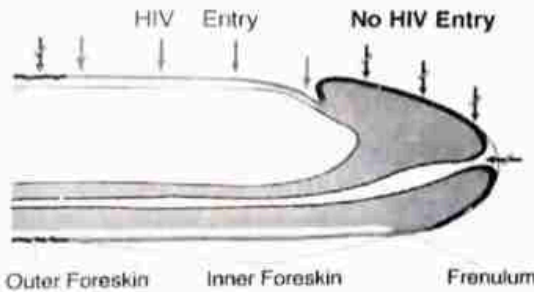
---

[১৫৩] (আদিপুস্তক ১৭:৯-১৪)
শিশু পুত্রের বয়স আট দিন হলে এই সুন্নত সম্পন্ন করবে। তোমার পরিবারে যত ছেলের এবং তোমার দাসদের মধ্যে যত ছেলের জন্ম হবে, তোমার বংশধর নয় এমন বিদেশিদের কাছ থেকে তোমার অর্থ দিয়ে তুমি যে দাসদের কিনেছিলে তাদের যে ছেলেরা জন্মাবে, সকলের অবশ্যই সুন্নত করা হবে।
সুতরাং তোমার জাতির প্রত্যেক শিশু পুত্রকে সুন্নত করা হবে। তোমার পরিবারের অথবা ক্রীতদাসের সব পুত্রদের এভাবে সুন্নত করা হবে।

মতো), ওরকমই কিন্তু বড় এলাকা নিয়ে। Smegma-কে ক্যান্সারপূর্ব লক্ষণ মনে করা হয়।

আর ভবিষ্যৎ **নারীসঙ্গীকে পরোক্ষ সুরক্ষা দেয় জরায়ুমুখ ক্যান্সার থেকে। শিশু বয়সে খৎনাকৃত পুরুষের নারীসঙ্গী এই দীর্ঘমেয়াদি সুফল পেতে থাকেন** (Gray, 2000)। John Hopkins University-র School of Medicine-এর গবেষক Aaron A R Tobian দারুণ একটা প্রশ্ন ছুঁড়েছেন:

> 'যদি এমন কোনো ভ্যাক্সিন বের হতো, যা এইডসের রিস্ক কমাবে ৬০%, যৌন-হার্পিসের রিস্ক কমাবে ৩০% আর প্যাপিলোমা ভাইরাসের রিস্ক কমাবে ৩৫%, তাহলে তো চিকিৎসাব্যবস্থা এর পিছনে মিছিল দিত, জনস্বাস্থ্যে এক বিপ্লব হিসেবে একে প্রচার করা হতো। তাহলে কেন 'খৎনা'-কে প্রোমোট করা হচ্ছে না?' (Tobian, 2011)

কেন হচ্ছে না, শুনবেন? সাম্প্রতিক নানা রিভিউয়ে এসেছে, **নবজাতকের খৎনা করানো US-এ শুধু সাশ্রয়ী-ই নয়, বরং খরচ বাঁচায়** (not only cost-effective but cost-saving) (Sansom, 2010) পুঁজিবাদী স্বাস্থ্যব্যবস্থায় তাই খৎনা একটা লোকসান, অসুখ হলেই বরং লাভ। প্রতিটি অসুখের ক্ষেত্রেই হিসেব এক। পুরো দুনিয়ায় এইডসের ওষুধের মার্কেট ৩৫০০ কোটি ডলার, বছরে ৩.৪০% হারে বাড়ছে। ব্যবসার ক্রমবৃদ্ধির পিছনে ইন্ধন দিচ্ছে এইডস রোগী বাড়া, বেশি রোগীকে ওষুধের আওতায় আনা, এইডস হবার আগেই থেরাপি দেওয়া[১২৪] (PrEP, এই মার্কেটটা পুরোই সমকামী-নির্ভর। সুতরাং মার্কেট বাড়াতে সমকামী বাড়াতে হবে)। এইডস কমিয়ে আনে—এমন সবকিছুকে রুখতে হবে, অপ্রয়োজনীয়-অমানবিক-সেকেলে সাব্যস্ত করতে হবে, আর রোগী বাড়ে এমন লাইফস্টাইল প্রোমোট করতে হবে, যদি ব্যবসা বাড়াতে চান। হিসেব খুব সোজা।

এ তো গেল অসুখবিসুখ থেকে সুরক্ষা। এবার আসেন যৌনমিলনে এর কী প্রভাব? অনেকে বলেন, এতে লিঙ্গের সেনসিটিভিটি কমে, মিলনসুখ হ্রাস পায়। প্রথমটুকু ঠিক আছে, কমে। কিন্তু পরের টুকু ঠিক নাই—**মিলনে সুখ তো কমেই না** (Cox, 2015), **বরং বাড়ে** (Brito 2017, Nordstrom 2017)। সিডনী ইউনিভার্সিটির মলিকুলার বায়োলজির প্রোফেসর এমিরেটাস Brian J Morris সাহেব এবং ওয়াশিংটন ইউনির ইউরোলজিস্ট প্রোফেসর এমিরেটাস John N. Krieger খৎনা সম্পর্কিত ৫৯টা রিসার্চ রিভিউ করে বলেন:

> সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন রিসার্চগুলো জানাচ্ছে, যৌনকর্ম, যৌন অনুভূতি, যৌন কাতরতা এবং যৌনতৃপ্তির ওপর মেডিকেল খৎনার কোনো বিরূপ প্রভাব নেই। (Morris, 2013)

[১২৪] ResearchAndMarkets.com

তবে হ্যাঁ, লিঙ্গের স্পর্শকাতরতা কমে। এবং এই কমাটা দরকারি। লিঙ্গ প্রবেশনের পর থেকে বীর্যপাত পর্যন্ত সময়কে বলে পুরুষের ক্ষেত্রে Intravaginal Ejaculation Latency Time. মানে সেক্স-এ আপনি কতটুকু টিকলেন। নারীর ক্ষেত্রে orgasm latency মানে, লিঙ্গ প্রবেশের পর কতক্ষণ লাগে নারীর অর্গাজম আসতে।

	Orgasm/ Ejaculation latency Time
পুরুষের	গড়ে ৫.৪ মিনিট (Marcel, 2005)
নারীর	গড়ে ১৪ মিনিট (Rowland, 2018)
আদর্শ সেক্স	প্রবেশনের পর ৭-১৩ মিনিট (Corty, 2008)

অবশ্যই লিঙ্গের অতিকাতরতা না কমলে মিলনে নারীর সুখ নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। লিঙ্গের সবচেয়ে কাতর অংশ হলো লিঙ্গের অগ্রভাগ (Glans)। খৎনাকৃত পুরুষে এই অংশটুকু কিছুটা কাতরতা হারায়—

➡ দীর্ঘদিন কাপড়ের ঘষায় ঘষায় অনুভূতি কমে। অল্প স্পর্শেই উত্তেজনা কমায় (higher fine-touch pressure threshold) (Sorrells, 2007)

➡ এই এলাকায় খৎনার ক্ষত একটা পুনর্বিন্যাস ঘটায় মস্তিষ্কের সার্কিটে, ফলে কাতরতা (excitability) কমে।

➡ গ্লান্সের (অগ্রভাগে) কোষে কেরাটিন নামক পদার্থ জমা হয়ে (চামড়ায় যেটা থাকে) কাতরতা কমায়।

➡ পিচ্ছিল নড়াচড়া (gliding under prepuce) কমায়। পিচ্ছিলতার ফলে অহেতুক যৌন উত্তেজনা কমায় (Immerman, 1997)

ফলে লাভ যেটা হয়—

- স্ত্রীমিলনে গিয়ে অধিক সময় টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে, দ্রুতপতনের রিস্ক কমে। পুরুষের গড় Ejaculation latency Time তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে বেড়েছে (Senkul, 2004)
- বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষে সহজেই উত্তেজিত হওয়া কমায়, মনোবিচ্ছিন্নতা (distractibility) কমায়।
- লিঙ্গ উত্থান নেমে যাবার সম্ভাবনা কমে। ১০ হাজার পুরুষের ওপর এক রিসার্চে এসেছে, খৎনাকৃতদের লিঙ্গ মাঝপথে নরম হয়ে যাবার রিস্ক কমে। (Richters, 2006)
- মিলনকালে যাদের লিঙ্গে ব্যথা হতো, তাও কমেছে।

কিছুটা কাতরতা হারায়, ঠিক আছে, এটুকু হারানো দরকার। কিন্তু যৌনসুখ নষ্ট হয় না; একাধিক ট্রায়ালে এসেছে, খৎনার পর যৌনতৃপ্তি বেড়ে গেছে, বা নিদেনপক্ষে অপরিবর্তিত আছে (Tobian, 2012)।

নারীর খৎনা

Female genital mutilation (FGM) নিয়ে সারা দুনিয়ায়ই কথাবার্তা চলছে। এই বীভৎস, অমানবিক, ভয়াবহ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বেশ ব্যতিব্যস্ত। যথারীতি সমালোচনার তীর প্রাচ্যের মুসলিম সম্প্রদায় এবং বর্বর আফ্রিকার দিকে; এদেরকে সভ্যতা শেখানোর দায় তো ইউরোপের আছেই। নারীর যৌনাঙ্গ কর্তন বা FGM বলা হয় ৪টা জিনিসকে—

টাইপ		কোন অংশ কর্তন করা হয়
Type 1	1a	ক্লাইটোরিসের ওপরের ঘোমটার মত ত্বক (clitoral hood/prepuce) কর্তন
	1b	ক্লাইটোরিস সম্পূর্ণ বা আংশিক কর্তন (clitoridectomy) ± 1a
Type 2	2a	ভেতরের যোনিদ্বার কর্তন (inner labia)
	2b	ভেতরের যোনিদ্বার ও ক্লাইটোরিসের মাথা দুটোই কর্তন [1b+2a ± 1a]
	2c	একইসাথে বাইরের বড় যোনিদ্বারও কর্তন [outer labia + 2b]
Type 3 (infibulation)		যৌনাঙ্গের বাইরের পুরোটা কেটে সেলাই করে দেওয়া [2b± 2a ±1b]। একে ফেরাউনী খৎনা-ও (pharaonic circumcision) বলা হয়। ২০% কেসে এরকম করা হয়[১৫৫]।
Type 4		কর্তন ছাড়া আর যতকিছু যোনির ওপর করা হয়, সবগুলোকে এই ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়েছে। খোঁচা, ফুড়ানো, পোঁচ দেওয়া, ছ্যাঁকা দেওয়া, টাইট করার বা লুজ করার চেষ্টা ইত্যাদি। (pricking, piercing, incising, scraping and cauterization, tightening, stretching)

গত শতকেও অত্যধিক স্বমেহন, পাগলামি, মৃগী আর হিস্টিরিয়া রোগের কারণ মনে করা হতো নারীর যৌনকামনাকে। ১৯ শতকের বড় বড় মনোচিকিৎসক, গাইনোকলজিস্টরা ভাবতেন বড় বড় সব অসুখবিসুখের কারণ নারীর যৌনকামনা—এখান থেকেই Hysteria অসুখের নাম এসেছে, যার অর্থ 'জরায়ু'। ১৮৬০ সাল থেকে ব্রিটিশ গাইনী সার্জন Isaac Baker Brown-এর সমর্থনে শুরু হয়েছিল ভগাঙ্কুর

[১৫৫] "Frequently Asked Questions on Female Genital Mutilation/Cutting", United Nations Population Fund, April 2010.

অপসারণ (clitoridectomy, 1b) অপারেশন, যা চলেছে ১৯৪০-এর দশক অব্দি (Sheehan, 1981)। আজও ৬ লাখ ইউরোপীয় নারী এর ফল ভোগ করে চলেছে, ইউরোপের ১,২৮,০০০ মেয়ে এর ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে End FGM European Network.

ইসলাম ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখে। আফ্রিকার ২৭টা দেশে মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে এই প্র্যাক্টিস আছে। আছে ইয়েমেন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়। মিসরে মুসলিম-খ্রিষ্টান দু'দলই মেয়েদের খৎনা করায়। মুসলিমরা ইসলামের বরাতেই কাজটা করে আসছে। জি, ইসলামে খৎনার বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য।

শাফিয়ি ও হাম্বালি একটা মতে, উভয়ের জন্য ওয়াজিব।

হানাফি ও মালিকি মতে, উভয়ের জন্য সুন্নাত।

ইমাম আহমাদের আরেক মত হলো, পুরুষের জন্য ওয়াজিব, নারীর জন্য মুস্তাহাব।

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার এক খনাকারিণীকে বলেছিলেন:

> “তুমি গভীর করে কাটবে না। কারণ তা মেয়েলোকের জন্য অধিকতর আরামদায়ক এবং স্বামীর জন্য অতি পছন্দনীয়।”[১৫৬]

> উম্মু আলকামা (রহিমাহাল্লাহ) থেকে বর্ণিত, আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ভাইয়ের মেয়েদের খৎনা করানো হলো... [১৫৭]

> “যখন দুই খৎনা-করা অঙ্গ একত্র হয়, তখন উভয়ের ওপর গোসল ওয়াজিব হবে।”[১৫৮] (অর্থাৎ নারীরও খৎনা রয়েছে)

কিন্তু ইসলাম কোন খৎনার কথা বলছে? ওপরের হাদীসটা লক্ষ্য করুন—বেশি কাটবে না, অল্প কাটবে। সেটা কতটুকু? ইবনু নকীব মিসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

> 'পুরুষদের জন্যে খৎনা হবে পুং জননেন্দ্রিয়ের আবরক ত্বক (prepuce) কর্তন করা। মহিলাদের খৎনা হবে ভগাঙ্কুরের আবরক ত্বক (prepuce) ছেদন দ্বারা। এর মানে নয় যে, সম্পূর্ণ ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা, যেটা অনেকেই ভুলবশত বলে থাকেন।'[১৫৯]

কুয়েতের সরকারি ফতোয়া বিভাগ Al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah জানাচ্ছে:

> 'নারীর খৎনা হলো, মূত্রনালীর ওপরের দিকে সামান্য ত্বক কেটে দেওয়া, যা দেখতে

---

[১৫৬] ذٰلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৫২৭১, আলবানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে সহীহ।

[১৫৭] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২৫৯, হাসান।

[১৫৮] মুসলিম, ৩৪৯।

[১৫৯] আহমাদ ইবনু নকীব মিসরি (মৃ. ১৩৬৮ খ্রি:) উমদাতুস সালিক, অধ্যায় ৫: তাহারাত, অনুচ্ছেদ ৪.৩।

মোরগের ঝুঁটির মতো (ঝুলন্ত)। সম্পূর্ণ কেটে দেওয়া সুন্নাহ না, বরং এর কিছু অংশ।'[১৬০]

সুতরাং ইসলামে নারীর এই খৎনা ইউরোপের 'ক্লাইটোরিস কর্তন' (clitoridectomy) নয়। ইসলামের খৎনা হলো, ক্লাইটোরিসের ওপরে একটা চামড়ার ঘোমটা থাকে (Clitoral hood)। কেবল সেটা কেটে ক্লাইটোরিস বের করে দেওয়া (1a)। পুরুষের খৎনার মতো। অর্থাৎ পুরুষের খৎনায় যেটুকু কেটে দেওয়া হয় (লিঙ্গের মাথা তো আর কাটা হয় না), নারীর খৎনায়ও সেটুকুই কাটা হবে। মজার ব্যাপার হলো, নারীর খৎনা শুনলে যেমন কারও কারও গায়ে জ্বালা ধরে। clitoral hood reduction surgery বললে আবার ভালো শোনা যায় কিন্তু। যুক্তরাষ্ট্রে নারীর কামশীতলতার (frigidity) চিকিৎসা হিসেবে সার্জনরা এই খৎনা গত শতকেও করেছেন (Wollman, 1973)। এই শতকেও সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও যৌনতৃপ্তি বর্ধনের উদ্দেশ্যে clitoral hood reduction surgery নামে প্রচলিত রয়েছে।
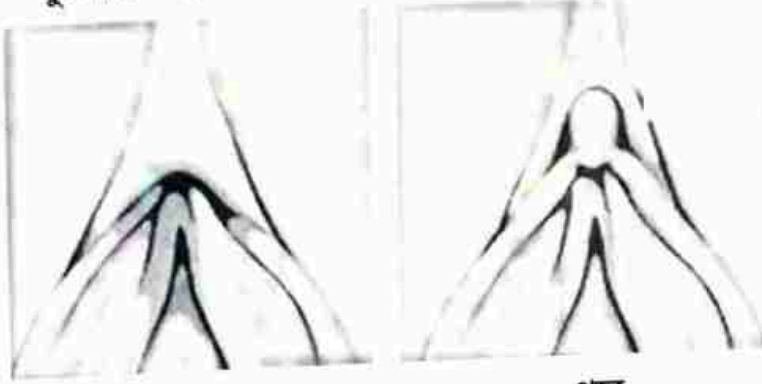
আগে পরে

যেহেতু পুরুষের লিঙ্গ আর নারীর ক্লাইটোরিস সমতুল্য অঙ্গ (homologus)। সুতরাং খৎনা করার যেসব বেনিফিট পুরুষ পায়, নারীও একই বেনিফিট পাবার কথা। বিশেষত কামশীতলতা, অনাগ্রহ, অর্গাজমহীনতা ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তির সুসংবাদ এনে দিতে পারে খৎনা।

[১৬০] Al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah (19/28)

হিজামা

হিজামা বা কাপিং থেরাপি মূলত একটি প্রাচীন চীনা চিকিৎসা পদ্ধতি। খ্রি:পূ: ২০০০ সালে চীনে ও খ্রি:পূ: ১৫৫০ সালে মিশরে এর প্রচলন পাওয়া যায়। মধ্যপ্রাচ্যেও এর রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। শরীরের বিভিন্ন পয়েন্টে কাপ-জাতীয় বস্তু দিয়ে নেগেটিভ প্রেসার তৈরি করা হয়। চোষণ প্রক্রিয়া (sucking action) দ্বারা কাপ বসানো এলাকায় টিস্যু তরল জমে, রক্তনালী ফেটে গিয়ে লাল হয়ে যায়, রক্ত জমে যায় (dry cupping)। কখনও স্কালপেল দিয়ে সামান্য কাটা হয়, ফলে কাপের ভেতর নেগেটিভ প্রেসারে রক্ত এসে জমে। সর্বোচ্চ ১০০ মি.লি.-৫০০ মি.লি. পর্যন্ত রক্ত বের করা হয়ে থাকে (wet cupping)।

১৯৫০ সালে চীনা ও রাশিয়ান গবেষকদের যৌথ রিসার্চে কাপিং-এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় এরপর পুরো চীনে এটা অফিসিয়াল চিকিৎসা পদ্ধতি (formal modality/ official therapeutic practice) হিসেবে গৃহীত হয়। [১৬১] মানে চীনে এটা মেইনস্ট্রীম চিকিৎসা। ফলে পরবর্তীতে চীনে এর ওপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই বহু রিসার্চ হয়েছে, আরও ডেভলপ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা মেডিকেল সায়েন্স কাপিং-কে এতকাল অপবিজ্ঞান, অপচিকিৎসা বলে এসেছে। পশ্চিমা মেডিসিনের অন্ধ অনুসারী হিসেবে ৩য় বিশ্বের ডাক্তাররাও একে পাত্তা দেয়নি, এরপরও ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে কাপিং থেরাপি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পশ্চিমা একাডেমিয়া একে কীভাবে দেখছে একটু আলোচনা করা যাক।

বিখ্যাত জার্নাল *PLoS One*-এ একটি রিভিউ প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে (Cao, 2012)। ৬টা ডেটাবেস থেকে ১৯৫৮-২০০৮ সালে করা ৫৫০ রিসার্চ পেপার পাওয়া যায়। যার অধিকাংশ জানাচ্ছে, যেকোনো ব্যথা, হার্পিস ভাইরাসঘটিত নার্ভ ব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্টে কাপিং-এর সম্ভাব্য উপকারিতা রয়েছে। এই সবগুলোর ওপর ৫টা সিস্টেমেটিক রিভিউ হয়েছে, যেই ৫টা আবার রিভিউ করে Lee et al. জানিয়েছেন, এটা শুধু ব্যথা জাতীয় রোগে কার্যকর। তবে রিসার্চগুলো Cochrane risk of bias tool মোতাবেক (যা দিয়ে রিসার্চের নিরপেক্ষতা যাচাই করা হয়) দুর্বল। ১ম পর্বের 'সমস্যা-

---

[১৬১] Chirali IZ. In: Traditional Chinese Medicine Cupping Therapy. Chirali IZ, editor. London: Churchill Livingstone; 1999. Benefits of cupping therapy; p. 8.

৪' এর আলোচনাগুলো মনে করার চেষ্টা করুন না।

এনারা কেবল ১৯৯২-২০১০ সালের মাঝে হওয়া ১৩৫টা রিসার্চ রিভিউ করলেন, **যার ১৩৫-টাই চীনা ভাষায়। মানে পশ্চিমা বিশ্ব এটা নিয়ে গবেষণাই করে নাই, যা করেছে সব চীনারা।** দেখা গেল ৫৬টা অসুখকে কাপিং দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছে পেপারগুলোতে। ৬টা অসুখ প্রধান—হার্পিস জোস্টার, মুখের প্যারালাইসিস (Bell palsy), কাশি-শ্বাসকষ্ট, ব্রন, কোমরে ডিস্ক প্রোল্যাপ্স, ঘাড়ের ব্যথা (spondylosis)। তাঁরা বলছেন, ১৩৫টার অধিকাংশই নিরপেক্ষতা যাচাইয়ে High risk of bias ক্যাটাগরির, বাকিগুলো unclear ক্যাটাগরির। একটাও Low risk ক্যাটাগরিতে পড়ে না। শেষে ওনারা বললেন, আমাদের রিভিউ অনুযায়ী তো কাপিং ওপরের অসুখগুলোয় কার্যকর, তবে স্পষ্ট তথ্যের জন্য আরও বেশি সাবজেক্টের ওপর আরও হাই-কোয়ালিটির গবেষণা দরকার। কেননা যেগুলোর ওপর আমরা রিভিউ করলাম, সেগুলো নিরপেক্ষ নয়।

Harvard Health Blog-এ রিউম্যাটোলজিস্ট Robert H. Shmerling, MD এর লেখাটা বেশ যুক্তিসংগত।[১৬২] *PLoS One*-এ প্রকাশিত ২০১৫ সালের একটা রিভিউয়ের (Yuan, 2015) বরাতে তিনি বলেন, কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঘাড়ব্যথা ও কোমরব্যথাতে কাপিং দ্বারা উপকার পাওয়া গেছে, কিছু প্রমাণগুলো ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসার জন্য খুব সীমিত। কারণ হিসেবে তিনি জানান, কাপিং নিয়ে হাই-কোয়ালিটি রিসার্চ সম্ভব হয়নি।

- মেডিকেল সায়েন্সে হাই-কোয়ালিটি রিসার্চ হলো 'double-blinded placebo-controlled trials', যেখানে রোগী ও গবেষক কেউ-ই জানবে না যে, কাকে কী দেওয়া হলো—কোন রোগীকে আসল ওষুধ দেওয়া হয়েছে, আর কাকে ওষুধের মতো একটা 'কিছুই না' (placebo) দেওয়া হয়েছে। ওষুধ নিয়ে পরীক্ষায় একটা 'কিছুই-না' বানানো সম্ভব, কিন্তু কাপিং এর সমতুল্য একটা 'কিছুই-না' কীভাবে পাওয়া যাবে?
- ব্যথা জিনিসটা পরিমাপ করা কঠিন। আগে ব্যথা বেশি ছিল, এখন ব্যথা কম—এই মাপজোক কীভাবে হবে?
- কখনও কখনও placebo effect (ব্যথা কমার আশার কারণে ব্যথা কমে যাওয়া) খুব শক্তিশালী হয়। ব্যথা কাপিং-এর কারণে কমলো, নাকি মানসিক কারণে কমলো—সেটা বোঝাও কঠিন।

---

[১৬২] Robert H. Shmerling, MD (JUNE 22, 2020).What exactly is cupping? [www.health.harvard.edu]

- তবে, Shmerling সাহেব বলেন, আকুপাংচার যেমন ফেইক করে স্টাডি করা গেছে, কাপিং-এরও একটা ফেইক বের করা যাবে। আর যদি কাপিং আসলেই উপকারী হয়, তাহলে সেটা placebo effect-এর দরুন হয়েছে, নাকি কাপিং-এর নিজের কারণে হয়েছে, সেটা নগণ্য। উপকারী মানে উপকারী, ব্যস।
- কাপিং-বিশেষজ্ঞরা নানান অসুখে এই থেরাপি দিয়ে থাকেন। যেমন—
  - ➡ ঘাড়-কোমর ব্যথা
  - ➡ চর্মরোগ
  - ➡ কোলেস্টেরল কমানো
  - ➡ মাইগ্রেন (আধকপালি ব্যথা)
  - ➡ হাঁটু আর্থ্রাইটিস
  - ➡ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

কোনো রিস্ক আছে কি না, জবাবে Shmerling সাহেব বলেন:

> ‘অধিকাংশ এক্সপার্ট একমত যে, কাপিং নিরাপদ। যদি আপনি একেবারে টায়টায় প্রমাণ চান চিকিৎসাটির ব্যাপারে, তাহলে আপনার কাপিং করানোর দরকার নেই। আর যদি মনে করেন, আপনি একটা ট্রাই নিবেন, একটা চিকিৎসা নিয়ে দেখবেন যেটা নিরাপদ এবং ব্যথাজাতীয় ব্যারামে সম্ভাব্য আরাম প্রদান করবে, তাহলে আপনি করাতে পারেন।’

এইবার খুব প্লেইন হিসেবে আসেন। রক্ত তো অনেকেই দিয়েছেন। জেনেও থাকবেন যে, রক্তদাতার শরীরের জন্য মাঝে মাঝে রক্তদান (blood donation) দারুণ উপকারী। এখন অব্দি রক্তদানের যে যে কল্যাণ জানা গেছে—

হৃদরোগ থেকে সুরক্ষা

২০১৯ সালের এক গবেষণায় ১,৬০,০০০ নারীর ডেটা দেখা হয়, যারা কমপক্ষে ১০ বছর ধরে রক্ত দিয়ে এসেছেন। রিসার্চে উপসংহার টানা হয়, দীর্ঘদিন বার বার রক্ত দিলে হার্ট-এট্যাক ও স্ট্রোক জাতীয় অসুখবিসুখ থেকে সুরক্ষিত থাকা যায় (Peffer, 2019)। ফিনল্যান্ডের গবেষকদের মতে, রক্তদাতার হার্ট-এট্যাক হবার আশঙ্কা ৮৮% কম, যারা দেয় না তাদের চেয়ে (Salonen, 1998)। রক্তদাতা ৩ ভাবে উপকৃত হন—

- দেহে আয়রনের মাত্রা বেশি থাকা-টা হার্ট-এট্যাকের (acute myocardial infarction) একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, রক্ত দিলে তাত্ত্বিকভাবে এই আয়রনের মাত্রা কমে।
- কিছু রিসার্চ জানাচ্ছে, রক্ত দিলে রক্তের প্রেসারও কমতে পারে। ২০১৫ সালে বিজ্ঞানীরা ২৯২ জন ডোনারের ব্লাডপ্রেসার পর্যবেক্ষণ করেন, যারা বছরে ১-৪

বার রক্ত দিয়ে থাকে। এদের অর্ধেকেরই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা ছিল। প্রেসারের সমস্যা যাদের ছিল, তারা বেশ উন্নতি লক্ষ করল। যত বার রক্ত দিয়েছে, উন্নতি ততই স্পষ্ট হয়েছে (Kamhieh-Milz, 2016)।

- Dr. Gregory Sloop জানিয়েছেন, রক্ত দিলে রক্তের সান্দ্রতা (গাঢ়ত্ব) কমে। গাঢ় রক্ত হার্ট-এট্যাক, স্ট্রোক ইত্যাদির (cardiovascular disease) রিস্ক বাড়ায়। তিনি বছরে কমপক্ষে একবার রক্ত দেবার পরামর্শ দিয়েছেন।

ক্যান্সার থেকে সুরক্ষা

নিয়মিত রক্তদান দেহ থেকে যে অতিরিক্ত আয়রন বের করে ফেলে, সেটাকে ক্যান্সারেরও বিরাট ঝুঁকির জিনিস মনে করা হয়। অধিক আয়রন অধিক ফ্রী-র‍্যাডিকেল বা অক্সিডেন্ট তৈরি করে, যা ক্যান্সার সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা রাখে (iron catalyzed free radical mediated oxidative stress) (Zacharski, 2008)। রক্তদাতা লিভার, ফুসফুস, কোলন ও পাকস্থলীর ক্যান্সার থেকে তুলনামূলক নিরাপদ থাকেন (Gustaf, 2008)।

সার্বিক সুস্বাস্থ্য

২০০৭ সালে গবেষকেরা ১ মিলিয়ন রক্তদাতার ডেটা দেখেন। দেখা গেল, অসুখবিসুখে তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা ৩০% কম, ক্যান্সারের আশঙ্কা ৪% কম। সিদ্ধান্তে এলেন, রক্তদাতারা গড় হারের চেয়ে বেশি সুস্বাস্থ্য উপভোগ করেন (Edgren, 2007)। ২০১৫ সালের এক স্টাডিতে একই ডেটা নতুন করে চেক করা হলো। অন্যান্য প্রভাবকগুলো সমন্বয় করে গবেষকগণ জানালেন, বছরে একবার রক্ত দিলে শারীরিক অসুস্থতাজনিত মৃত্যুর রিস্ক গড়ে ৭.৫% কমে যায়। রক্ত দেবার দরুন রক্তদাতা যে যে উপকার পাবেন, কাপিং থেরাপিতেও রোগীর ঠিক সেই সেই উপকারই পাবার কথা। রক্ত দেবার সময় এক ব্যাগ মানে ৪০০ মি.লি. রক্ত দিই আমরা, আর ওয়েট কাপিং-এও ১০০-৫০০ মি.লি. রক্ত টেনে নেওয়া হয়। দুটোই শিরার রক্ত (venous blood)। একই বেনিফিটগুলো কাপিং (হিজামা)-এ না পাবার কোনো কারণই নেই।

এবার এপাশের গবেষণাগুলো দেখি কী বলতে চাচ্ছে। বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই, স্রেফ রিসার্চের সিদ্ধান্তগুলো বলে যাচ্ছি—

- নর্মাল শিরার রক্তের চেয়ে কাপিং-এ আসা রক্তে অক্সিডেন্টদের পরিমাণ অনেক বেশি (Suleyman, 2014)। অর্থাৎ কাপিং দেহ থেকে ক্ষতিকর অক্সিডেন্ট সরিয়ে

ফেলে, যারা ক্যান্সার থেকে নিয়ে যত কঠিন কঠিন রোগের মূল কারণ।

- কাপিং এর ৩০ দিন পর শিরার রক্তে ভারী ধাতুর (Al, Zn, and Cad) মাত্রা ব্যাপক কমে গেছে (Nafisa, 2018)। ভারী ধাতু বেশি হারে অক্সিডেন্ট তৈরি করে অসুখ বানায়।
- beta thalassemia major, hemochromatosis, sideroblastic anemia— রোগের কারণে দেহে iron overload হয়, কাপিং এই অতিরিক্ত আয়রন সরিয়ে নেয়। (Salah, 2014) [১৬৩]
- রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলটা (LDL) কমিয়ে আনে (Majid, 2004)। ফলে রক্তনালীতে চর্বি জমে (atherosclerosis) হার্ট-এট্যাক ও স্ট্রোকজাতীয় অসুখ থেকে সুরক্ষা দেয়। total cholesterol ৭% কমে যাওয়া এবং HDL cholesterol (ভালোটা) ৩% বেড়ে যাওয়া যদিও খুব বেশি না, তারপরও বিবেচনার দাবি রাখে।
- নিদ্রাহীনতা দূর করে ঘুমের কোয়ালিটি বাড়ায় (Selma, 2015)। ব্যথা-যন্ত্রণাঘটিত অসুখের উপশম করে। নিচের অসুখগুলোতে কাপিং-এর কার্যকারিতা রিসার্চে পাওয়া গেছে:
  - lumbar disc herniation,
  - cervical spondylosis,
  - brachialgia paraesthetica nocturna,
  - persistent non-specific low back pain,
  - fibrositis,
  - fibromyalgia,
  - chronic non-specific neck pain,
  - chronic knee osteoarthritis,
  - pain of dysmenorrhea
  - pain of acute gouty arthritis,
  - neurological conditions as headache and migraine,
  - acute trigeminal neuralgia,
  - carpal tunnel syndrome.

হিজামার সুন্নাহ পয়েন্ট

- নাইজেরিয়ার একটা কেস স্টাডি, রিসার্চ না। বাকি সবকিছু নর্মাল একজন ৩২ বছরের পুরুষ ৭ বছর প্রটেকশন ছাড়া মিলন করেও সন্তান হচ্ছে
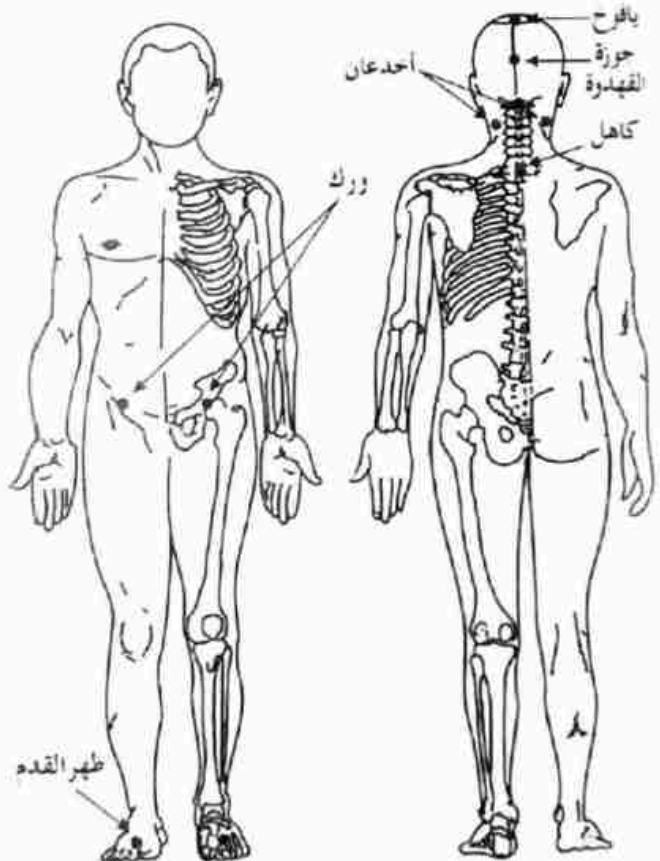
[১৬৩] Salah Mohamed El Sayed et.al. (2014) [Department of Medical Biochemistry, Pediatrics & Molecular Medicine, Egypt & KSA] Therapeutic Benefits of Al-hijamah: in Light of Modern Medicine and Prophetic Medicine. [খুব ইম্পর্টেন্ট, পিয়ার রিভিউড। আগ্রহীরা দেখতে পারেন]

না। হাসপাতালে তাকে বন্ধ্যা হিসেবে শনাক্তও করে দেওয়া হয়েছে। গবেষকরাও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবার করিয়ে অন্য কোনো অসুখ পাওয়া গেল না, মানে লোকটি primary infertility-র রোগী। তার বীর্য পরীক্ষা করে সবগুলো মানই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কম পাওয়া গেল। এবার তাকে মাসে ২ বার হিজামা করানো হলো, তার স্ত্রীকে মাসে একবার—এভাবে দুই মাস। দুইমাস পর বীর্যের সবগুলো প্যারামিটার স্বাভাবিক হয়ে গেল। দ্রুতপতনের সমস্যা ছিল, ঠিক হয়ে গেল। তার স্ত্রীর hCG লেভেল স্বামীর হিজামার আগে ছিল নেগেটিভ, থেরাপির পর হলো পজেটিভ (৪৯.৫৭ mlU/ml), মানে তিনি মা হতে চললেন।

- হার্টের ফাংশন যেমন দেখা যায় ECG-তে, ব্রেইনের ফাংশন দেখা হয় EEG-তে (Electro-encephalogram)। এর একটা অংশ Beta wave, যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ানোর কন্ট্রোল (cognitive processing and motor control) কেমন তা নির্দেশ করে। আর Gamma waves নির্দেশ করে বোঝা ও অনুভবের ক্ষমতা (perceptual and cognitive processes)। যদি beta ও gamma ওয়েভ বেশি পাওয়া যায়, তা ব্রেইনের সূক্ষ্ম উচ্চতর ক্ষমতা (higher mental functions) বেশি বোঝায়। ৪৯ জন পুরুষের ওপর নাইজেরিয়ার ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট গবেষণা করে জানিয়েছে, কাপিং-এর ফলে beta ও gamma ওয়েভের স্পন্দন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তাঁরা উপসংহার টেনেছেন, ব্রেইনের সামনের দিককে কাপিং সক্রিয় করে তুলেছে, যা সম্ভবত বিভিন্ন নিউরোকেমিক্যাল বৃদ্ধি করার মাধ্যমে। বিভিন্ন মানসিক ও মস্তিষ্কের অসুখে এর কার্যকারিতা থাকতে পারে (Faruk, 2019)।
- ব্যথা পরিমাপের একটা পদ্ধতি আছে, নাম Visual Analogue Scale. আর মাইগ্রেনের (আধকপালি) ব্যথা কতটা তীব্র এবং জীবনকে ব্যাহত করছে, তা পরিমাপ করা হয় Migraine Disability Assessment (MIDAS) Test দিয়ে। তুর্কী ডাক্তারদের এক গবেষণায় এসেছে, ৩ মাসে ৩ বার যাদের কাপিং দেওয়া হয়েছে তাদের চেয়ে ১২ মাসে ১২ বার যাদের দেওয়া হয়েছে, তাদের এই দুই স্কোর উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (Suleyman, 2019)। সৌদি আরবের ডাক্তারদের এক রিসার্চেও একই ফল এসেছে (Abdullah Kaki, 2019)। মনে রাখা দরকার, এসব ডাক্তাররা হোমিওপ্যাথি-ইউনানী বা অলটারনেটিভ মেডিসিনের ডাক্তার না, পশ্চিমা মেডিকেল সায়েন্সেরই ডাক্তার।
- ইরাকে ডাক্তারেরা ৫০ জন পুরুষ ও ৫০ জন নারীর ওপর গবেষণা চালিয়েছেন, যারা সবাই ডায়বেটিস ও উচ্চরক্তচাপের রোগী ছিল। হিজামার আগে আগে এবং হিজামার ৭২ ঘণ্টা পর তাদের ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে প্যারামিটারগুলো দেখা হলো

(Heshu, 2020)। নিচের রিডিংগুলো স্পষ্টত কমে গেছে—

- cholesterol
- triglyceride
- low-density lipoprotein
- fasting blood sugar
- ferritin
- urea
- creatinine
- blood pressure

আমেরিকাতে ১৮শ ও ১৯শ শতকে এই থেরাপির প্রচলন ছিল ব্যাপক। পশ্চিমা মেডিসিনে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কাপিং থেরাপির অস্তিত্ব ছিল (Griffith, 1938)। এমনকি ডক্টর উইলিয়াম ওসলার ১৯৩১ সালে তাঁর বিখ্যাত মেডিসিন টেক্সটবুক *The Principles and Practices of Medicine*-এ ও pneumonia ও acute myelitis-এর চিকিৎসা হিসেবে কাপিং রিকমেন্ড করেছেন।[১৬৪] এরপর কী এমন হলো যে, পশ্চিমা মেডিসিন একে কুসংস্কার বলে পরিত্যাগ করল, বিপরীতে চীন একে ১৯৫০ থেকে অফিসিয়ালি গ্রহণ করে নিল, সেটা ভিন্ন আলাপ। অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছু সামনে নিয়ে সে আলাপে আসতে হবে। 'কেউ' সর্প হয়ে দংশন করে, নিজেই আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ার জন্য কার্বলিক এসিডকে কুসংস্কার বলে দিল কি না, সে গল্প অন্য কোনোদিনের জন্য তোলা থাক। আজকে এটুকু জেনে রাখি, হিজামা আমাদের নবিজির সুন্নাহ।

> ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 'নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আধকপালি ব্যথার দরুন ইহরাম অবস্থায় শিঙা লাগান। আরেকবার ব্যথার কারণে পায়ের পাতায় শিঙা লাগান।'[১৬৫]

> আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও, শিঙা তার মধ্যে অধিক ফলদায়ক।"[১৬৬]

> আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁধের দু'পার্শ্বে এবং কাঁধের মাঝে শিঙা লাগাতেন। এবং তিনি তা লাগাতেন মাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখে।'[১৬৭]

---

[১৬৪] Osler W. The Principles and Practice of Medicine. New York: Appleton, 1931: 112.

[১৬৫] আবূ দাউদ, ১৮৩৭; ইবনু হিব্বান, ৩৯৫২; মিশকাত, ২৬৯৪, সহীহ

[১৬৬] মুসলিম, ৩৯৩০।

[১৬৭] তিরমিযি, আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যা, ২৮০, শরহুস সুন্নাহ, ৩২৩৪, সহীহ।

নবিযুগে কাপের বদলে পশুর শিঙ ব্যবহার করা হতো। মধু, কালোজিরা, শিঙা—এগুলো নবিজিই প্রথম ব্যবহার করতে বলেছেন, তা নয়। নবিজিরও আগে হাজার বছর ধরে এগুলো চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার হয়ে এসেছে। এগুলো অলৌকিক কিছু নয়। অলৌকিক হলো, চলে আসা অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে দেওয়া। সেসময়কার প্রচলিত অনেক প্রথা, অনেক ইতিহাস, অনেক পদ্ধতিকে তিনি বাতিল করেছেন। যা আজকের বস্তুবাদী বিজ্ঞানে, বস্তুবাদী ইতিহাসের ফিল্টারে আসলেই ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন—

> ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "রোগমুক্তি আছে ৩ জিনিসে। শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে দাগ দেওয়াতে। আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি।"[১৬৮]

এভাবে সেসময় প্রচলিত আরবীয় সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাসের বহু বিষয়কে তিনি সংশোধন করেছেন, বাদ দিয়েছেন; যা আজকে এসে সঠিক প্রমাণ হচ্ছে। এভাবে তৎকালীন স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আইন, ইতিহাসের নানান বিষয়কে তিনি বাতিল করেছেন, যা আজ মানুষের সূক্ষ্ম 'অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান' দ্বারা সমর্থিত, ১৪০০ বছর আগে যে জ্ঞান থাকার কোনো সুযোগই মানবসভ্যতার ছিল না। বস্তুবাদী ব্যাখ্যাদাতারা নানান ব্যাখ্যা দিতে পারেন—'হতে পারে মুহাম্মাদ কারও কাছে জেনেছিলেন', 'হতে পারে সেসময়কার বিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর ওঠা-বসা ছিল', 'হতে পারে তাঁর যুগের তুলনায় তিনি অগ্রসর ছিলেন', 'হতে পারে এই', 'হতে পারে সেই'। মুসলিম কখনও বস্তুবাদী হতে পারে না। মুসলিমের কোনো 'হতে পারে হ্যান-ত্যান' নেই। মুসলিম নিশ্চিত জানে, তিনি কোত্থেকে জেনেছিলেন। জানে বলেই সে সাক্ষ্য দেয়—'যে সত্তা নিজে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, নিজ সৃষ্টির খুঁটিনাটি যিনি জানেন, সৃষ্টি কীভাবে পরিচালিত হবে সেই Law of Nature যিনি বানিয়ে দিয়েছেন' তিনি নিজেই নবিজিকে জানিয়েছেন কোনটা সঠিক, কোনটা রাখতে হবে আর কোনটা বাদ দিতে হবে। কেননা নবিজিকে একটা ফরম্যাট দিয়ে যেতে হবে, যা কিয়ামাত তক ভ্যালিড। যে ফরম্যাট মোতাবেক চললে সেই স্রষ্টার প্রতিনিধিরা (মানবজাতি) দুনিয়ায় সুখে থাকবে, পরকালে সুখে থাকবে।

সেই ফরম্যাটের নানান ধারা-উপধারা চোখে দেখে প্রমাণের অপেক্ষা মুমিনেরা করে না। **হাঁড়ির সব ভাত কবে টিপে দেখা শেষ হবে, তখন খাবো—এত মাথামোটা মুমিন না।** পশ্চিমা গবেষণায় কবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে, কবে প্রতিটি হাদীস বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেবে, তখন মেনে নেবো—মুমিন এত হাইস্যাকর না।

---

[১৬৮] বুখারি, ৫৬৮১। (ihadis)

এখন করণীয় কী?

বিজ্ঞানের সমস্যা একটাই। সমস্যা হলো, মুসলিমদের হাতে মেইনস্ট্রীম 'পর্যবেক্ষণলব্ধ (বি) জ্ঞান' নেই। মানে এটা করলে পশ্চিমা বিজ্ঞানের অধীনে করতে হবে। 'জাগতিক ব্যাখ্যার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকার পণ' করে। এনলাইটেনমেন্টীয় সেক্যুলারায়নের সুবাদে বর্তমান বিজ্ঞানও সেক্যুলার। পশ্চিমা বিজ্ঞান প্রতিটি প্রশ্নের জাগতিক উত্তর দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মহাবিশ্ব সৃষ্টি, জীবনের উৎপত্তিসহ সকল ঘটনার একটা বস্তুগত ব্যাখ্যা সে দেবে, তা যতই হাস্যকর হোক। মুসলিমরাও নিজেদের পর্যবেক্ষণে চেতনে-অবচেতনে পশ্চিমা একাডেমিয়ায় গৃহীত হবার জন্য একই নিয়মে মাঠে নামে। এটা জ্ঞানের সেক্যুলারায়নের ফল।

১.

এখন যদি কোনো মুসলিম বিজ্ঞানী এভাবে মাঠে নামে যে, আমি জাগতিক ব্যাখ্যার ঠুলি চোখ থেকে খুলে ফেলব। আগেই এক পা বেঁধে দৌড়ে কেন নামব? পা খোলা থাকবে, দেখি কতদূর দৌড়োতে পারি। আমার গবেষণার ফল যদি ওহির সত্যতা স্বীকার করে, সেটা আমি বলব। আমার গবেষণা যদি ইঙ্গিত করে একজন স্রষ্টা আছেন, সেটাই আমি সাহস করে বলব, বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতে আমি বাধ্য না। বিশ্বাস করেন আবার সেই মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব (উম্মাহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকার শর্ত প্রযোজ্য)। এমন একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব আসা খুব দরকার। জ্ঞানের কেবলা পশ্চিমা একাডেমিয়া থেকে সরিয়ে নিজস্ব 'মুক্ত বিজ্ঞান', নিজস্ব একাডেমিয়া, নিজস্ব জার্নালের দিকে নিতে হবে। ফান্ডিং অবশ্যই বড় ইস্যু। কীভাবে করা হবে সেটা আমার আলোচ্য না। আলিমদের অনুমতি সাপেক্ষে দান-সদাকা আসতে পারে এই খাতে। আমি বলতে চাই, কিছু মুসলিম রিসার্চার পশ্চিমা একাডেমিয়ার পাশাপাশি বিকল্প বিজ্ঞানচর্চার দিকে আস্তে আস্তে এগোনো প্রয়োজন। এতক্ষণের আলাপে দেখেছি যে, ইরাক-মালয়েশিয়া-ইরান-নাইজেরিয়া-সৌদি-পাকিস্তানের বিজ্ঞানীরা ওহির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, নিজস্ব জার্নালে ছাপছেন। বাংলাদেশেও বিজ্ঞানের মুসলিম ছাত্রদের মাঝে রিসার্চমুখিতা আসা দরকার।

২.

আপনারা যারা বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ছেন সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে, ভার্সিটিতে; গভীরভাবে পড়ুন। দ্বীনকে সামনে নিয়ে পড়ুন। দ্বীনকে আরও বোঝার জন্য, আল্লাহর আহকামের পারফেকশন বোঝার জন্য পড়ুন। এই পড়াটাও দ্বীন হবে, ইবাদাত হবে। আর যতটুকু সম্ভব গবেষণা করুন, যাদের সামর্থ্য আছে। ছোট ছোট গবেষণা করুন। পশ্চিমা রিসার্চ মেথডোলজি ভালো করে জেনে, সেটা অনুসরণ করে করুন। এটা বেশ পোক্ত। তবে ফলাফলে গিয়ে ওহির কথা বলুন। বলুন, যে ফলাফল পেলাম, তা ১৪০০ বছর আগের ওহিকে সত্যায়ন করে। কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হবার দরকার নেই, আপনি দ্বীনি ইলমের ভাণ্ডারে, ফিকহের ভাণ্ডারে একেকটা empirical knowledge যুক্ত করুন। এটাই অনেকের ঈমানকে ইয়াকীনে রূপ দিবে ইন শা আল্লাহ, পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মতো। বিশ্বাস করুন এগুলো ইলম-ই হবে। কোনো তাফসীরে কোনো হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে হয়তো হাদীস-আছার-সালাফ মুফাসসিরদের মতের শেষে গিয়ে থাকবে, 'বাস্তবে বিজ্ঞানীগণও এমনই পেয়েছেন'। আপনার এই গবেষণা তাফসীর-শরাহের অংশ হয়ে যাবে বিইযনিল্লাহ।

৩.

তবে এজন্য শর্ত আছে। দ্বীনের মোটা মোটা বিষয় জানা থাকতে হবে। দ্বীন-আকীদা-উসূল-তাফসীর সম্পর্কে মিনিমাম ধারণা থাকতে হবে। যেটা মধ্যযুগে সবাই পার হতো। কেননা সেটাই ছিল মেইনস্ট্রীম শিক্ষা। রিলিজিয়াস স্টাডির পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই তাঁরা বিজ্ঞান করতেন। একই কাজ আমাদেরকেও করতে হবে। মাদরাসায় বিজ্ঞান পড়ানো হবে না, যেমন মেডিকেল কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় না। মাদরাসায় ধর্মতাত্ত্বিক (Theologian) তৈরি হবে। আমরা যারা অন্যান্য বিষয় পড়ি, আমাদেরকেই বেসিক লেভেলের ইলম শিখে জ্ঞান উৎপাদনে নামতে হবে।

আর সম্মানিত আলিমগণের কাছে আবেদন 'নূরানী' কোর্সের মতো ব্যাপকভাবে জেনারেলদের জন্য একটা কারিকুলাম তৈরির, যেখানে দাঈ তৈরি হবে, তাদেরকে নূরানীর মতো ইজাযত দেওয়া হবে। যাতে তারাও অন্যদের এই সাবজেক্টগুলো শেখাতে পারে। ফলে ব্যাপকভাবে জেনারেল শিক্ষিতদের মধ্যে একটা ইলমি যোগ্যতা তৈরি হবে। যেটা তারা দাওয়াতের ফিল্ডে বা রিসার্চের ফিল্ডে কাজে লাগাবে।

৪.

যেসব দ্বীনি ভাইয়েরা অলরেডি রিসার্চের কাজে আছেন তাদের কাছে দরখাস্ত—আপনারা একটা গ্রুপ করুন ফেসবুকে। সব সাবজেক্টের ভাই-বোনদের রিসার্চ মেথডোলজি শেখান ছোট ছোট পোস্ট দিয়ে। মেডিকেলে আমরা পড়েছিলাম এটা ৩য় বর্ষে। এত পরে না, ভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারেই 'রিসার্চ ডিজাইন' করা শিখিয়ে দিতে হবে। হাইপোথিসিস বানানো, কোয়েশ্চেনেয়ার বানানো, পি-ভ্যালু/ অড-রেশিও, রিস্ক রেশিও, বিভিন্ন সাবজেক্টের বিভিন্ন সূত্র বা মেথড শেখানো। যাতে ভার্সিটি ১ম বর্ষে নিজে ছোট ছোট স্যাম্পলের ওপর ছোট ছোট অনলাইন সার্ভে চালাতে পারে। হাত পাকুক। একদিন এটাও আলাদা একটা একাডেমিয়া হয়ে যেতে পারে। আমার যোগ্যতা থাকলে আমি করতাম। এটা কিছুই না, হয়তো একটা ইতিহাসের অট্টালিকা হবার আগে সে জায়গায় এক পথশিশুর আঁকিবুঁকির মতো। কিন্তু আমার মন বলছে, কিছু একটা হতে পারে। তবে তার আগে...

বিজ্ঞানী তৈরি করাই কি সমাধান?

ইসলাম ও মুসলিমরা অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে গত প্রায় ৩০০ বছর। নানান মনীষী নানান সমস্যা বাতলাচ্ছেন, নানান উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। একটা মুখরোচক কারণ দাঁড়িয়েছে, মুসলিমরা বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ার কারণে হেরে গেছে সভ্যতার লড়াইয়ে। আবার বিজ্ঞান করা শুরু করে দিলে, মাদরাসায় বিজ্ঞান পড়ানো শুরু করে দিলে সমাধান হয়ে যাবে।

পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ও সামরিক উন্নতির ছটায় চোখ ধাঁধানোই স্বাভাবিক। তাদের তুলনায় মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে আসলেই এটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। পশ্চিমের নজিরবিহীন বস্তুগত উন্নতি আর ইসলামি দুনিয়ার অধোগতি এতটাই প্রকট। কিন্তু আসলেই কি ইউরোপ কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে উন্নত হয়েছে, কেবলই জ্ঞান? আর কিছুই নেই এই গল্পটার শুরুতে? গল্পের শুরুটা না জানলে শেষটায় উপনীত হওয়া যাবে না। যে যবনিকাই টানবেন, সেটাই ভুল হবে।

যাই চলুন শুরুতে। বিজ্ঞানী আমাদের জন্য বস্তু তৈরি করেন, কিন্তু নিজের জন্য তৈরি করেন শিল্প। আর শিল্প খালিপেটে হয় না। গাঁটের পয়সা খরচ না করে শিল্প আসে না। বছরের পর বছর বিনিদ্র রাত কাটিয়ে, শত শত ব্যর্থতার গ্লানি পেরিয়ে একেকটা গবেষণা সফলতার মুখ দেখে। বিজ্ঞানীদের পালতে হয়। যদি আপনি বিজ্ঞানীদের

পালতে না পারেন, তাদের মেধার মূল্য দিতে না পারেন, তারা যেখানে মূল্য পাবে চলে যাবে। প্রতি বছর মুসলিম দেশগুলো থেকে বহু শিক্ষিত মেধাবী সন্তান ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে। 'মেধা পাচার' নিয়ে হায়হুতাশ করলে হবে না। মেধাগুলোকে রাখার মত সঙ্গতি থাকতে হবে।

➡ এই বিজ্ঞানীদের দেশে রাখতে হয়, পুষতে হয়

➡ দেশবিদেশ থেকে পড়িয়ে পোক্ত করে ফিরিয়ে আনতে হয়

➡ এজন্য দরকার হয় অবিরত ফান্ডিং। স্রোতের মতো টাকা ঢালতে হয় এক্সপেরিমেন্টে।

➡ অধিকাংশ গবেষণা হবে ব্যর্থ। মানে পুরো ফান্ডিং-টাই জলে গেল। এরকম বহু পয়সা জলে দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতিও থাকতে হয়।

ইউরোপকেও এগুলো করতে হয়েছে। ১৬শ শতক থেকে বিজ্ঞানের সেই চারাগাছকে ওরাও এভাবেই টাকা ঢেলে ঢেলে আজকের এই পর্যায়ে এনেছে। ইউরোপ কীভাবে পেরেছে? বিজ্ঞানের এই মহাযাত্রা ইউরোপে শুরু হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে আপনারা জানেন। যে সময়টাকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বলছেন, সেই সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের পকেটের কী হালত, তা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক James Mill বলছেন:

> ❝ 'ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল। এতটাই যে, বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষার জন্য পুঁজিই ছিল না তাদের। ওলন্দাজদের সাথে চলত এক অসম প্রতিযোগিতা।'[১৬৯]

হালত বদলে গেল কীভাবে? ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলা জয়, ১৭৬৫ সালে বাংলার দিওয়ানি (ট্যাক্স কালেকশনের ক্ষমতা) লাভ করল ইংরেজ। ১৭৬০-এর দশকেই ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে গেল শিল্প বিপ্লব। কীভাবে হলো শুনুন William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদের ভাষায়:

> ❝ 'পলাশির যুদ্ধের পর বাঙলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।' [১৭০]

কী পরিমাণ সম্পদ? সেটা শুনবেন P. Spear সাহেবের *The Indian Nabobs*-বই থেকে:

বাবদ	হিসাবটা টাকায় নয়, পাউন্ডে
মুর্শিদাবাদের কোষাগার লুট	১৫ লক্ষ

[১৬৯] James Mill এর বরাতে Unhappy India, Lala Lajpat Rai, 1928 : p.322

[১৭০] Prosperous' British India, Sir William Digby, ১৯০১

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে	৪ লক্ষ
কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি	৯ লক্ষ
কোম্পানির কাউন্সিল মেম্বাররা প্রত্যেকে	৫০-৮০ হাজার করে
ক্লাইভ নিজে	২ লক্ষ ৩৪ হাজার। সাথে বছরে ৩০ হাজার করে পাবে।
জামাই মীর কাশিম দিল	২ লক্ষ
নজম-উদ্দৌলা দিল	১ লক্ষ ৪৯ হাজার
সাধারণ ব্রিটিশ সেনাদের লুটপাট	বেহিসেব

লর্ড ক্লাইভ নিজেই স্বীকার খেয়েছেন: *এমন অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা-ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাটের পাশবিক চিত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথায় পাওয়া যায়নি।* (Malcom, Life of Clive)

লর্ড মেকলে [১৭১] লিখেছেন:

> 'ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যান্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ।...শিল্পবিপ্লব, যার ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল (লুট)। তা নাহলে স্টীম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান—এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যেকোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।'

ব্রিটেনের সকল যুদ্ধব্যয় (১৯১৩ সাল অব্দি ৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড), সকল বিজ্ঞানের ফান্ডিং, সকল প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণের পুঁজি সরবরাহ করেছে ভারত। ভারতকে নিংড়ে ব্রিটেন আজ বিজ্ঞান-দর্পী। Sir William Digby লিখেছেন: ***১৯০০ পর্যন্ত** ভারত থেকে আইনগতভাবেই (আইন বানিয়ে) আমরা নিয়েছি **৬,০৮০ মিলিয়ন পাউন্ড** (৬০৮০,০০০,০০০ পাউন্ড)।*[১৭২]

Mr. A.J.Wilson মার্চ ১৮৮৪ এর *Fortnightly Review* ম্যাগাজিনে লিখেন: *ভারতীয়দের বছরে মাথাপিছু আয়ই সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড। সেখানে **প্রতিবছর** আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে **৩ কোটি পাউন্ড** নিয়ে যাচ্ছি।*

---

[১৭১] Unhappy India, Lala Lajpat Rai, 1928

[১৭২] 'Prosperous' British India, Sir William Digby, 1901

১৮০১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১টা মন্বন্তরে মরেছে ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ—'না খেয়ে'।[১৭৩] ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞান এই ৪ কোটি মানুষের জীবনের ফসল। ওভার অ্যান্ড আউট। বিজ্ঞানচর্চার এই পুরো প্রক্রিয়াটা মনে রাখতে হবে, ভুললে চলবে না। এভাবেই গোড়ায় পানি ঢেলে বিজ্ঞানের গাছ টিকিয়ে রাখতে হয়।

অন্যদেশের কথা বললে চলে আসে ফ্রান্সের নাম। উপনিবেশ আমলে যা করেছে, করেছে। ১৯৬০ সালের দিকে নিজের উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়েছিল ফ্রান্স একটি লিখিত চুক্তির বিনিময়ে। চুক্তিটি ছিল এই যে, আফ্রিকার মোট বৈদেশিক রিজার্ভের ৮৫% ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। আর বাকি ১৫% দিয়ে আফ্রিকা চলবে। যদি আফ্রিকার ১৫% দিয়ে চলতে অসুবিধা হয়, তবে ফ্রান্স আফ্রিকাকে সুদে ১০% লোন দিবে। চিন্তা করেন, আফ্রিকার টাকা আফ্রিকাকে ঋণ দিবে, সুদে। আফ্রিকান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত Dr. Arikana Chihombori-Quao জানাচ্ছেন: প্রতি বছর ফরাসি সেন্ট্রাল ব্যাংকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার জমা দেয় ১৪টা আফ্রিকান দেশ, যা ফ্রান্স খাটায়। লাভ কেন, আসলও ফেরত আসেনি কোনোদিন আফ্রিকায়।

আমরা ভাবছি খালিপেটে শুধু বিজ্ঞান করলেই বুঝি আবার সোনালী যুগ ফিরে আসবে। মাদরাসায় বিজ্ঞান পড়ালেই ইবনু সিনা, ইমাম রাযিরা গজিয়ে উঠবে; আর আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। না ভাই, চোখ খুলুন। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বাইকে আসা আততায়ীরা গুলি করে চলে যায়। কিংবা কোনো ট্রাক এসে চাপা দিয়ে চলে যাবে, তার আর কোনোদিন হদিস হবে না। কিংবা সুস্থ মানুষ নিজ ফ্ল্যাটে মরে পড়ে থাকবে। কিংবা গুম হয়ে যাবে চিরকালের মতো। মোটকথা স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু এদের কপালে নেই, রহস্যজনক মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বিজ্ঞান করে মুসলিম বিজ্ঞানীরা। নিচের তালিকাটা দীর্ঘ, সামান্য অনুসন্ধানে এটুকু পেলাম—

- তিউনিসিয়ার aviation engineer মুহাম্মাদ আল-জাওয়ারি (২০১৭)
- মিশরের nuclear scientist সামির নাজিব (১৯৬৭)
- মিশরের nuclear scientist ইয়াহ্ইয়া আল-মাশাদ (১৯৮০)
- লেবাননের condensed matter physicist রাম্মাল হাসান রাম্মাল (১৯৯১)
- ইরাকের nuclear scientist ইব্রাহীম আল-যাহিরি (২০০৪)
- ইরানী quantum field theorist and elementary-particle physicist মাসুদ আলি মুহাম্মাদি (২০১০)

---

[১৭৩] *ibid*

- ইরানি nuclear engineer মাজিদ শাহরিয়ারি (২০১০)
- ফিলিস্তিনি rocket scientist ফাদি মুহাম্মাদ আল-বাতশ (এপ্রিল ২১, ২০১৮)
- লেবাননের PhD student হাসান আলি খাইরুদ্দীন (কানাডায়)
- লেবাননের nuclear Physics স্টুডেন্ট হিশাম সালিম মুরাদ (ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৮)
- ফিলিস্তিনি Chemist হোসাম আল-রোজা
- মিশরের nuclear scientist ড. সামিরা মূসা (১৯৫২)
- মিশরীয় scientist সাঈদ বুদাইর (১৯৮৯)
- মিশরি পদার্থবিদ নাবিল কালিনি (১৯৭৫)
- লেবাননের ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হাসান কামিল সাব্বাহ (১৯৩৫) এমআইটি ফারেগ, ৫০টা পেটেন্ট।
- মিশরের আলি মুস্তফা মোশরেফা (১৯৫০)। তাকে বলা হতো 'আরবদের আইনস্টাইন।
- সৌদি আরবের প্রথম মহিলা নিউরোসার্জন সামিয়া আবদুর রহীম মাইমানি।
- সিরিয়ান rocket scientist আযীয আসবার (২০১৮)
- ইরানি nuclear scientist মোস্তফা আহমাদি রোশান

নিজের বিজ্ঞানীদের জীবনই রক্ষা করতে পারি না আমরা। কীভাবে বিজ্ঞানচর্চা আমাদের মুক্তি দেবে, বলেন? সিরিয়ান বংশোদ্ভূত সুইডিশ লেখক Hatem al-Zoabi বলেন Anadolu Agency-কে:

> 'মোসাদ কর্তৃক মুসলিম বিজ্ঞানীদের গুপ্তহত্যার উদ্দেশ্য মুসলিম দেশগুলোর রিসার্চ কার্যক্রমকে বাধা দেওয়া। নিজের ফিল্ডে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে এমন যেকোনো মুসলিমকে ইসরাইল টার্গেট করে ফেলে।'[১৭৪]

১৯৮১ সালে ইসরাইলি বিমান বাগদাদে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে ইরাকের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট।[১৭৫] কী বিজ্ঞান করব বলেন? ইরাক ছিল আরববিশ্বে আধুনিক যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানে সবচেয়ে প্রাগ্রসর। সেই ইরাকে, শুধুমাত্র ইরাকে US occupation এরপর থেকে ২০১৩ সাল অব্দি ৩২৪ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, একাডেমিককে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। [১৭৬] আর থাকে কী?

---

[১৭৪] Mustapha Dalaa (18 FEB 2017). Death of Muslim scientists puts spotlight on Israel's Mossad. Anadolu Agency

[১৭৫] *ibid*

[১৭৬] http://www.iraqsolidaridad.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/List-of-Iraqi-academics-assassinated-November-2013.pdf

সুতরাং বিজ্ঞানচর্চা কোনো সমাধান না। ওটা তৃতীয় ধাপ। বিজ্ঞানের জন্য চাই অর্থ। আর অর্থে স্বাবলম্বী হতে হলে চাই, নিজস্ব বিরাট বাজার। জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতদের সবারই নিজের আছে বিরাট বাজার, রপ্তানি না হলেও নিজের দেশেই যথেষ্ট ভোক্তা। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। সুতরাং এই ছোট্ট ছোট্ট মুসলিম দেশে বিজ্ঞান করে কোনো লাভ নেই। যেমন সিরিয়ার বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (Scientific Studies and Research Center) এর ফান্ডিং দেয় আমেরিকা আর ফ্রান্স।[১৭৭] এই বিজ্ঞান করে কী লাভ। মুসলিমদের প্রয়োজন একক বিশাল দেশ, কিংবা নিদেনপক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অবাধ বাজার। আর দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব। আমার দেশ আমি চালাই, এটাকে সার্বভৌমত্ব বলে না। দেশ কার মনমতো চালাই, সেটা হলো সার্বভৌমত্ব। তুরস্ককে কিছুটা মনে হলেও, আর একটা মুসলিমদেশও সার্বভৌম না। সবাই 'আমেরিকা দেখতেসে', 'ভারত দেখতেসে' পার্টি। তুরস্কও ন্যাটোর কথামতো আফগানে সৈন্য দিয়ে রেখেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও আসবে না। একটা গাড়ির প্লান্ট করতে হলে পাশের বন্ধুদেশ বাধা দেয় যে দেশে, সে দেশে কীসের বিজ্ঞানের স্বপ্ন দেখাচ্ছি আমরা।

এবার বিজ্ঞানে উন্নত হবার প্রক্রিয়াটা রিভার্স করুন। ব্রিটিশের মতো লুটপাট করতে বলছি না। প্রকৃত অর্থে, ব্রিটিশ ও ব্রিটিশের প্রেতাত্মা থেকে স্বাধীন হবার কথা বলছি। যতদিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমা নব্য-উপনিবেশী শক্তি থেকে বেরোতে না পারছেন, ততদিন বিজ্ঞানের কুতকুত খেলে কোনো লাভ নেই। প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হলে হকি খেলতে হয়, কুতকুত-বৌছি এগুলো খেলে হয় না। **সভ্যতার সংঘাতের ফর্মুলা এটাই ভূ-রাজনৈতিক স্বাধীনতা> অর্থনীতির স্বাধীনতা> জ্ঞানতাত্ত্বিক স্বাধীনতা। নইলে অঙ্ক মিলবে না। ইতিহাসে কোথাও মেলে নাই।**

[১৭৭] David M. Halbfinger and Ronen Bergman (Aug. 6, 2018, A Top Syrian Scientist Is Killed, and Fingers Point at Israel. The New York Times

সব নবিকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য 'মু'জিযা' দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা। কোনো ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা সত্যায়িত করে দেন যে, এটা অরিজিনালটারই ফটোকপি, আমি স্বাক্ষরকারী অরিজিনালটা দেখেছি। তেমনি নবিদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, পাবলিকের সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য দেওয়া হতো মু'জিযা, যে ইনিই আল্লাহর সত্যায়িত বার্তাবাহক। সত্যসন্ধানীরা আল্লাহর তাওফীকে চট করে বুঝে যেত, যে ইনিই নবি। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর আজদাহা সাপটা যখন জাদুকরদের ভাঁওতাবাজিগুলোকে গিলে নিল, জাদুকররা সাথে সাথে বুঝে নিল ঘটনা কী। আর হতভাগারা তা বুঝেও হঠকারিতা করত। মু'জিযা দেখার পরও সেই মু'জিযার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতো; নবিকে বলত কবি-জাদুকর-পাগল-জিনে পাওয়া।

নবিরা বলতেন, এই দেখো, এই আমার মু'জিযা, এই অলৌকিক ক্ষমতা আমার নিজের না; আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবি।

আর মানুষের কথা ছিল, আপনি নবি ছাড়া আর সবকিছু, প্লিজ বইলেন না আপনি নবি। আপনি নবি–কেবল এইটুকু আমরা শুনতে চাই না, জানতেও চাই না। নবি মেনে নিলেই আপনার আল্লাহকে মেনে নিতে হবে, আইন-কানুন মানতে হবে, আপনার বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে, জুলুম-অত্যাচারের যে ব্যবস্থাপনা আমরা সাজিয়েছি, সেটা ত্যাগ করে আয়েশ-খ্যাতি-ভোগের জীবন বিসর্জন দিতে হবে। সুতরাং 'আপনি নবি', এইটুকু ছাড়া আর যা বলবেন মেনে নেবো।